স্বর্গাদপি গরীয়সী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য চার টাকা

* *
*

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৭

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের,
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস -১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

১

গিরিবালার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাঁতরার গঙ্গারঘাট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ননদ মনোমোহিনী দেবী স্নান করিতে লইয়া গেলেন, সঙ্গে গিরিবালার দেবর চণ্ডীচরণ। সবচেয়ে নিকটতম ঘাটটি, এদিককার লোকেরা যেটা বেশি সরে, সেটা পাকা নয়; একদিকে কতকগুলা গাছপালা, একদিকে ছিদাম ময়রার দোকান। ঘোমটার মধ্যে থেকে দেখার চেয়ে যেন বেশিভাগ অনুভব করিতে করিতেই সঙ্গিনীর সঙ্গে নামিয়া গেলেন গিরিবালা। জলের ধারে আসিয়া মনোমোহিনী বলিলেন—"পারবি নাইতে, না, জোয়ারের ফুলের মতন আমাদের কাছে যেমন কোত্থেকে ভেসে এসেছিস, তেমনি আবার ভেসে চলে যাবি?"

ঘোমটার মধ্যে থেকেই গিরিবালা ঘাড়টা নাড়িয়া অস্পষ্ট উচ্চারণে জানাইলেন—পারিবেন।

বোধ হয় গৌণত জোয়ারের ফুল কথাটা মানিয়া লওয়ার জন্যই মনোমোহিনী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"চল্, না পারিস, যাবি ভেসে, জোয়ার থেকে আর একটা ফুল তুলে নেওয়া শক্ত হবে না। আয়, হাত ধরে নেমে আয়।"

গিরিবালা অবগুণ্ঠিত হইয়াই ডুব দিলেন।

যখন উঠিলেন তখন স্রোতে অবগুণ্ঠনটি সরিয়া গিয়াছে, চক্ষু উন্মীলন করিয়া যেন সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে উত্তীর্ণ হইলেন। ডুব দিবার কথা ভুলিয়াই, এমন কি অবগুণ্ঠন টানিবার কথা ভুলিয়াও অপরিসীম

বিস্ময়ে চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় আলোয় ঝলমল আর ছোটবড় ঢেউয়ে চঞ্চল ধূসর জলের রাশি; ওপারে স্রোতের পর থেকে আকাশ পর্যন্ত সবুজে সবুজে ভরা, মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে বোধ হয় এক একটা রাধাচূড়ার গাছ, রাঙা রাঙা ফুলের স্তবকে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর এই সবুজের কোলে কোলে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত শত শত বাড়ি, মন্দির, ঘাট,—শাদা, কত রকমের রং করা, কত রকমের গড়ন সব! দূরে কাছে কত নৌকা; কত রকমের, কত দিকে গতি!....আর ওটা কি?—পিছনে চরকিবাজির ন্যায় প্রকাণ্ড চাকার মতো কি একটা দিয়া গঙ্গার জলে যেন ধূলি উড়াইয়া আগাইয়া চলিয়াছে,—ওই জাহাজ নাকি?—সম্ভব।

মনোমোহিনী বলিলেন—"হাঁ ক'রে দেখছিস কি?···ওমা, তাও তো বটে, বুনী এ-সব দেখেনি যে কখনও!···ওটা লাটসাহেবের বাগান, মাঝখানে ঐটে বাড়ি, ঐ যে লম্বা লম্বা থামের মতন।....আজ শীগ্‌গির নেয়ে ওঠ, জোয়ারের নোতুন জল এসেছে, অন্য দিন চিনিয়ে দোবখ'ন সব।"

গিরিবালা ডুব দেন, কিন্তু এই নূতন জগতের আলোর ডাকেই যেন তখনই উঠিয়া পড়েন। একটুখানি ঝাপসা, তাহার পর চোখের উপরকার জলটা ঝরিয়া গিয়া আবার সব পরিষ্কার হইয়া ওঠে। আশ্চর্য, অদ্ভুত!—গিরিবালার মনেও কোথা থেকে একটা জোয়ার ঠেলিয়া আসে। এ ধরণের অনুভূতি তাঁহার প্রথম হইয়াছিল প্রথম বোধ উন্মেষ হইবার পর, প্রায় আট বৎসর বয়সে তিনি প্রথম যখন সিমুরে মামারবাড়ি যান। ক্ষুদ্রতর থেকে একটা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়ার জন্য একটা অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ! যা আর সব রকম আনন্দ থেকে

আলাদা। গিরিবালা অবশ্য অত বুঝিলেন না, তবে অনুভূতির সমতার জন্য বোধ হয় সিমুরটা মনে পড়িয়া গেল।—এ এক অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি—হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া আর বড় করিয়া যেন পাওয়া যায়। মনে হয় যেন অনেকখানি জায়গা পাইয়া অনেকখানি বড় হইয়া গেছি—শরীরে, মনে, সব দিকেই। তবুও সিমুরের সঙ্গে সাঁতরার তুলনা হয় না, এ যেন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বেলে-তেজপুরের সামনে সিমুর যেমন বোধ হইয়াছিল, সিমুরের কাছে সাঁতরা তাহার চেয়েও অপরূপ। একবার সাঁতরার সামনে আসিয়াই সিমুর যেন সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

নদীও যে এমন হইতে পারে,—এত প্রসার, এত মুক্তি, এ ধারণা ছিল না গিরিবালার। মনে পড়িয়া গেল মামারবাড়ির পথে বড়-নদীর কথা; প্রথম দেখিয়া কি এই ধরণের কিছু মনে হইয়াছিল গিরিবালার? —একটা আবছায়া বিস্ময়ের স্মৃতি যেন ভাসিয়া আসে মনে। কিন্তু বড়-নদী কেমন যেন একলা, চুপচাপ,—এপারের খেয়াঘাটে একটি অশথ গাছ, ঘেটেলের একটি কুঁড়ে, একখানি নৌকা ওপারে যায়, এপারে আসে; নদীর মাঝে চড়া, তাহার পর মাঠের পর মাঠ।... একবার মাত্র দুইটা কি পাখির হাঁকা-হাকিতে বড়-নদীর মধ্যে কেমন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল,—এখনও যেন কানে লাগিয়া আছে গিরিবালার।

আর সাঁতরার গঙ্গা যেন ভরাট,—জলেও ভরাট, আবার দু'ধারের ডেঙাতেও ভরাট; গতিতেও ভরাট, শব্দেও ভরাট। একটা যেন বড় সংসার। গিরিবালার যেমন অদ্ভুতভাবে কোথাকার কথা কি করিয়া মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়, সেইভাবে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিমুরের চৌধুরী-গিন্নির কথা,—কয়েকবার দেখিয়াছিলেন। বড় ভালো লাগিত

দেখিতে।—অত ছেলেপুলে, নাতি-নাতকুড়, কর্‌-কুটুম, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী ; অত কাজ, অত ব্যাপার ; তাঁহাকে ঘিরিয়াই সব, অথচ তাঁহার এমন একটা হাসি-হাসি নিশ্চিন্ত ভাব—যেন আরো অনেক জায়গা আছে তাঁহার চারিদিকে, আরও অনেক আসিতে পারে, মোটেই ভিড় হইবে না, তাঁহার মুখের নিশ্চিন্ত হাসি এমনই অটুট থাকিবে।

এর পরেও এই রকম আকস্মিক ভাবেই গিরিবালার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,—সম্পূর্ণ অন্য কথা।...শিবপূজার কথা হইতেছে, কাত্যায়নী দেবী গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া বলিতেছেন—"চাইবি বুড়োর কাছে, দিতে হবে তাকে ; তোর মতন মেয়েকে যদি না দেয় তো কার জন্যে রেখেছে সব ?"

মনোমোহিনী দেবী জপ করিতেছিলেন, সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"তুই এখনও দাঁড়িয়েই আছিস তো ? নাঃ, একে হাঁদা তায় অবাধ্য,—তোকে নিয়ে বেগ পেতে হবে দেখছি। নে, ওঠ, একটা ডুব দিয়ে নে।"

এঁরা উঠিতে ছেলের দলের মধ্যে থেকে দেওরটিও উঠিয়া আসিল। বছর দশ এগার বয়স, গৌরকান্তি, বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি। বৌদিদি আসিয়াছে পর্যন্ত সর্বদাই ঘিরিয়া আছে। স্কুলে পড়ে ; যত রকম বই পড়ে, আরও অনেক রকম যা পড়ে না, সব একত্র করিয়া ক্রমাগতই বৌদিদিকে তাক লাগাইয়া দেওয়া এই ছেলেটী ব্রত করিয়া লইয়াছে। এর উপর স্কুলের গল্প আছে—সত্য যা ঘটে তাহার সঙ্গে এমনও অনেককিছু যাহা ঘটা অসম্ভব।...খুব ভাব হইয়া গেছে গিরিবালার সঙ্গে। ছেলেবেলাকার বিকাশদাদার মতো, শুধু তফাৎ এই যে গিরিবালার চেয়ে বয়সে ছোট। কতকটা এর মধ্যে বিকাশদাদাকে পান বলিয়া আর কতকটা সম্বন্ধের মাধুর্যে গিরিবালার সব স্নেহ এই

ছেলেটির উপর গিয়া জড়ো হইয়াছে। একটি স্নেহের পাত্র না থাকিলে নিজেকে বড় বলিয়া অনুভব করা যায় না, দেওরটিই এখানে একমাত্র মানুষ যে সেই অভাবটি পূরণ করিয়া আছে। সাতু, হরিচরণ, খোকা বেলে-তেজপুরে যা, চণ্ডীচরণ সাঁতরায় তাই, বরং গিরিবালার যেন মনে হয় এই অভিনব সম্বন্ধের মাধুর্যে এ-ছেলেটি আরও মিষ্ট। সিমুরে বিকাশদাদার গল্প শুনিয়া যে-গিরিবালা মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া পড়িত সে-গিরিবালা আর নাই; তবুও চণ্ডীচরণ ই থেকে এবং কল্পনা থেকে যখন নব নব রোমাঞ্চকর কাহিনীর অবতারণা করে, গিরিবালা প্রশ্রয়ই দেন, বলেন—"সত্যি নাকি ঠাকুরপো? এমনটা তো শুনিনি কখনও!"

এই সম্ভাবনাটিও তাঁহার নিজের রসনায় বড় মিষ্ট লাগে, নূতন জীবনের অনেকখানিই যেন এই সম্বন্ধটুকুর মধ্যে জড়াইয়া আছে।

খুব বেশি করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চণ্ডীচরণ উঠিয়া আসিল। দিদি তখন তামার বড় ঘটিটা মাজিয়া জল ভরিয়া লইবার জন্য আবার জলে নামিয়াছেন, চণ্ডীচরণ কাছে সরিয়া আসিয়া, হাঁপানিটা আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—"দেখলে বৌদি?"

অপূর্ব যাহা দেখিয়াছেন আজ সেটার সম্বন্ধে অভিমতটা ব্যক্ত করিবার জন্য গিরিবালার একটা ব্যাকুলতা ছিলই মনে, উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া বলিলেন—"সত্যি, কি আশ্চয্যি ভাই-ঠাকুরপো!"

চণ্ডীচরণ বুকের ওঠা-নামাটা থামাইয়া বুকটা বেশ ভালো করিয়া ফুলাইয়া লইয়া বলিল—"এইতেই তুমি আশ্চয্যি হয়ে গেলে?"

হারজিতের রেষারেষিটা দেওর-ভাজের সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি-আপনিই আসিয়া পড়ে, গিরিবালা সামলাইয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া বলিলেন—"না, তেমন আশ্চয্যি কি?—আমাদের বড়-নদীও কম চওড়া নয় এর চেয়ে, তবে বলছিলাম মা-গঙ্গা যেন ..."

একটু ধাঁধায় পড়িয়া গিয়া চুপ করিয়া চণ্ডীচরণ কথাটা বুঝিল, বলিল—আমি সে কথা বলছি না। আমি এতক্ষণ কী ভয়ানক সাঁতার কাটছিলাম দেখনি ?"

গিরিবালা দেখেন নাই, দেখিলেও বুঝিতে পারিতেন—'ভয়ানক সাঁতার কাটা'টা কিনারার কাছে একটা উবুড় করা নৌকার কোন ধরিয়া পা-ছোঁড়ার অতিরিক্ত কিছু নয়। মুখে, খুব বিস্মিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"তাই নাকি ? তুমিই অত সাঁতার কাটছিলে ? আমি মনে করি...."

চণ্ডীচরণের মুখটা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; মাথাটা উপরে নিচে অল্প দুলাইয়া বলিল—"আমিই তো। গঙ্গার আদ্দেক পর্যন্ত সাঁতার মেরে দিতে পারি ; দিদি বকবে যে, নৈলে..."

মনোমোহিনী ঘটি হাতে উঠিয়া আসিলেন। বীরত্বের কাহিনীটা চণ্ডীচরণ কণ্ঠকে একটু মুক্তি দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিল, বলিলেন—"ভাজের কাছে বুঝি মদ্দাত্তি হচ্ছে ? বেশ, সাঁতরে মেরে দিতে পারো তো পোরো'খন, এখন চলো, বেলা হয়ে গেছে।"

অগ্রসর হইতেই একটি বর্ষীয়সী সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাজা মাজা রং কাঁচা-পাকা চুলের বেশির ভাগই পাকা, সিঁথিতে বেশ চওড়া করিয়া সিঁদুর, কাঁধে রাঙা গামছা, বাঁ-হাতে খানিকটা ঘুঁটের ছাই, তাই দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে নামিতেছেন।—

"ইটি কে লো মোনু ? বৌ বৌ ঠেকছে যেন !"

মনোমোহিনী দাঁড়াইয়া পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন—"না, বৌ বৌ ঠেকবে কেন ?—ঠানদিদির মতন একেবারে পাকা গিন্নি হয়ে আসবে ?...এটি যে তোমার নাতবৌ হোল।"

"তাই নাকি ?—একদিন কার মুখে শুনলাম যেন মধু ঠিক করতেই এসেছে, তা এত শীগ্‌গির…"

"শীগ্‌গির ব'লে শীগ্‌গির ?—রাতারাতি একেবারে! একদিন সকালে মেয়ের বাপ এলেন—মেয়ের কুষ্ঠি দেখে বাবা মুচ্ছো যাবার উপক্রম হলেন। নাকি ভাল লক্ষণ; দেনা-পাওনা, গয়না-গাঁটির কথা শিকেয় তোলা রইল—তখুনি আশীর্ব্বাদ, তক্ষুনি গায়ে হলুদ, তক্ষুনি বিয়ে—লোকে একটু শাঁকে ফু দিয়েও আহ্লাদ করবে তার ফুরসৎটুকু পেলে না।…রাজবাড়ির ডাকসাইটে পুরুত তোমাদের ছেলে—তার উপর আর কে কথা কইবে ? মুখটি বুঝে সব দেখে গেলাম।"

গিরিবালা ভয়ে যেন কাঁটা হইয়া গেলেন। বিবাহের এই হঠকারিতা লইয়া একটু-আধটু ফিস্‌ফিসানি উঠিয়াছে শ্বশুরবাড়িতে। অবশ্য ভগবতীচরণের সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করে এমন মানুষ সংসারটায় নাই কেহ, তবুও মেয়েমহলে এই লইয়া একটু মৃদুগুঞ্জন উঠিয়াছে।—এতে দেনাপাওনা, গয়নাগাঁটির দিকটা একরকম বাদ পড়িয়াছে কিন্তু তাহার চেয়েও মেয়েদের যাহা লইয়া দুঃখ, একটা হাঁক-ডাক করিবার সুবিধা হয় নাই, মাসখানেক ধরিয়া রোদে পিট দিয়া বিবাহের আলোচনার সঙ্গে বড়ি-পাতা হয় নাই, তেমন করিয়া রাত জাগিয়া আনন্দনাড়ুর ঘটা হয় নাই। বাড়ির বড় ছেলে লইয়া সবার বহুদিনের জল্পনা-কল্পনায় পরিপুষ্ট একটা সাধ ছিল, নিরাশ হইয়াছে।

বর্ষীয়সী একটু হাসিলেন, বলিলেন—"মেজুর আমাদের রাগ—লাখ কথার কমে কেন বিয়ে হোল ?…দেখি দিদি মুখখানি তোল তো।…এই তো প্রতিমের মতন দিব্যি মুখের ছাঁদ। পয়মন্ত বৈকি, ভগবতীচরণ সারা তল্লাটটায় বিধান দিচ্ছেন, আর নিজের ভাইপোর বেলায়ই কি ভুল করেন ?"

"পয়মন্ত বলতে, তোমার মতন পাকাচুলে সিঁদুর পরতে পারেন তবেই বুঝি পয়মন্ত, আর সব ভুয়ো ঠানদিদি, দেখলাম তো এই বয়সে অনেক..."

আরও তিন চার জন জুটিল। গিরিবালাকে লইয়া আলোচনা, নাইয়া উঠিয়াও গিরিবালা যেন ঘামিয়া উঠিতেছেন। আলোচনা অনুকূলই—ঠানদিদির অভিমতের মতো ঐ একই ছন্দে রচা, তবু একটা ধুকপুকুনি লাগিয়া থাকে, ছেলেবেলায় সে কাত্যায়নী দেবীর পরিচিত করিয়া বেড়ানোর চেয়ে অনেকটা আলাদা ব্যাপার, যদিও একই ধরণের। আলাদা এই হিসাবে যে এখনকার সবার একটি অভিমতের এদিক-ওদিকের উপর শ্বশুরবাড়ির আদর-অনাদর অনেক পরিমাণে যেন নির্ভর করিতেছে। মুখ দেখাইয়া, হাতের আঙুল দেখাইয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অভিমতের অপেক্ষা করিতে হয়।

একটু ছন্দপতন ঘটিলও।—খুব মোটা থলথলে গোছের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধবধবে ফরসা, কপালটা অতিরিক্ত চাপা, নাকটা খাঁদা' ঠোঁট দুইটা খুব পুরু এবং ঝোলা', দাঁতগুলি একটু উঁচু। মুক্তা পান্নায় বোঝাই টানা-দেওয়া একটা বেশ ফাঁদাল নথ এই নাক, ঠোঁট এবং দন্তপংক্তিকে বেড়িয়া আছে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তামাকের গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে এইদিকেই পা বাড়াইলেন।

কে একজন অস্ফুটস্বরে বলিল—"ঐ আসছেন।"

একটু তফাৎ থেকেই গুললিপ্ত তর্জনীটা একটু বাহির করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তোমাদের কিসের মিটিন্ গো?....এই যে আমাদের মোমুও রয়েছে; হ্যাঁলা শুনলাম নাকি সাক্ষাৎ দুগ্‌গোপ্রিতিমের মতন ভাজ করেছিস, সমস্ত সাঁতরাটায় নাকি তেমন ..."

আসিয়া পড়িলেন।

"ইটি কে?"

সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল একটু, একজন বলিল—"এইটিই মোনুর ভাজ হয়েছে।"

নবাগতার অতখানি ঠোঁট একদিকে একটি কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া যেন গুটাইয়া গেল। সেইভাবেই গিরিবালার মুখের পানে একটু চাহিয়া মুখটা ফিরাইয়া রহিলেন। বলিলেন—"রাগ করিসনে মোনু, বড় সুখ্যেত নাকি শুনলাম—সবার মুখেই এক কথা তাই একটু ধোকা লেগে গেছল।....অবিশ্যি এমন কিছু নিন্দের নয়, তবে···থাক্, ছেলেমানুষ, কষ্ট হবে। খাসা হয়েছে, দিব্যি হয়েছে···তবে ওই একটু আর কি—রংটা আরও অন্ততপক্ষে দু-পোঁচ মাজা হ'লে মানিয়ে যেত···"

মনোমোহিনীর মুখটা কঠিন হইয়াই গিয়াছিল, একেবারে যেন পাথরের মতো স্পন্দনহীন হইয়া গেল। ক্ষণমাত্র; তাহার পর বলিলেন—"কটা রঙের তো আমি শুধু এইটুকুই বাহার দেখি রাঙাখুড়ি, যে মুখে গুল থাকলে খোলে চমৎকার।"

সমস্ত দলটা যেন কাষ্ঠপুত্তলিবৎ একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল। মনোমোহিনী দেবী সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার হাতটায় খপ্ করিয়া একটা হেঁচকা দিলেন, বলিলেন—"চল্! দেখা নেই, শোনা নেই, একটা কালো কুচ্ছিৎ কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলেন সব; অপ্সরাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে করছিস কি?"

২

সমস্ত পথটা গিরিবালার যে কি করিয়া কাটিল বলা যায় না। গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিয়া মনে যে এক অপরূপ আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেটা কখন কি করিয়া যে মিলাইয়া গেল বুঝিতে পারিলেন না। ননদ লইয়া সব মেয়েরই সংস্কারগত ভয় থাকে, এই দুইটা দিন গিরিবালা তাহার কিছুই নিদর্শন পান নাই, বরং কোন একটি নিগূঢ় টানে এই বিবাহ বাড়ীর ভিড়ের মধ্যে মনোমোহিনী দেবীকেই বেশি জড়াইয়া লেপ্টাইয়া বেড়াইয়াছেন। এই তা'হলে আসল রূপ নাকি ননদের ?...গিরিবালা ইংরাজী জানেন না। একেবারেই এ-বি-সি পর্যন্ত নয়, তবে একটা অদ্ভুতগোছের আঁটোসাঁটো ইংরাজী কথা তাঁহার—অদ্ভুতভাবেই মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, মনে মনে সভয়ে আওড়ান মাঝে মাঝে।—অন্নদাচরণেরও ভাইঝির ভাবী ননদ আর শ্বাশুড়ি লইয়া একটা অন্ধভীতি ছিল। বিকাশ যখন কলেজের ছাত্র, একবার বেলে-তেজপুরে আসিয়াছেন, অন্নদা বোধ হয় গিরিবালার ভবিষ্যৎ লইয়াই আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় কি একটা কাজ হাতে করিয়া গিরিবালার ঘরে প্রবেশ করিলেন।... বিকাশদাদা বলিতেছেন—"হ্যাঁ, ননদ নিয়ে আমাদের মেয়ে-বোনের জন্যে একটু দুশ্চিন্তায়ই থাকতে হয় বৈকি! অবশ্য ভালো ননদও যে না আছে এমন নয়—পিসিমাকেও তো দেখছি, তবে স্ট্যাণ্ডার্ড ননদ যা...।"

তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা একরকম অসম্পূর্ণ রাখিয়াই গিরিবালা বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সভয়ে যখন তখন মনের মধ্যে আওড়াইতে আওড়াইতে কথাটা মুখস্থ হইয়া গেছে।...এই সেই স্ট্যাণ্ডার্ড ননদ নাকি? বিবাহটা হঠাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাটা যে ভাবে

তুলিলেন তাহাতে একটা চাপা আক্রোশের গন্ধ আছে, আর এই-কালো, কুচ্ছিৎ কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসার কথা!....ননদ সম্বন্ধে যত গল্প শুনিয়াছেন সে সবের সহিত যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে; চলিতে গিরিবালার পা উঠিতেছে না।

অথচ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলিতে হইতেছে,—তাঁহার বয়সের পক্ষেও, আবার তাঁহার এই বধূত্বের পক্ষেও; কারণ মনোমোহিনী দেবী চলিয়াছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে।

পথে এক আধজন কি প্রশ্ন করিল, যেন শুনিতে পাইলেন না, চণ্ডীচরণ এবং গিরিবালা তাল রাখিয়া আসিতে পারিতেছেন কিনা একবার ফিরিয়া দেখিলেন না। নিঃশব্দে এবং ঋজুগতিতে পথ বাহিয়া চলিলেন।

চলিতে চলিতে চণ্ডীচরণ একবার ঘোমটার কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"ভয়ানক চটেছেন দিদি, বৌদি।"

গিরিবালা কোন উত্তর দিলেন না, তবে সমস্ত শরীরটা যেন আরও অবসন্ন হইয়া আসিল; মনে শুধু এক চিন্তা—এই তা'হলে বিকাশদাদার স্ট্যাণ্ডার্ড ননদ নাকি?

সমস্ত ব্যাপারটি বৈকালের দিকে স্বরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

মনের কোন নিগূঢ় নির্দেশে—হয়তো লক্ষ্মণের ভূমিকাটা একটু বেশি বলিয়াই, তাহার সঙ্গে বইটা বেশ শক্ত বলিয়াও'—চণ্ডীচরণ ভ্রাতৃজায়াকে দুই দিন হইতে বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" পড়িয়া শুনাইতেছে। সুবিধা হয় এই বিকালবেলার দিকটায়; আর সবাই সামান্য একটু জিরাইয়া লইয়া যখন এক একটা কাজ হাতে করিয়া বৌ-ভাতের আয়োজনে বসিয়া যায়, দেওর ভাজে গিয়া ভগবতীচরণের গৃহে প্রবেশ করেন। ঘরটি নিরিবিলি।

গিরিবালার সঙ্গে সাতকড়ি আর হারাণের বউ আসিয়াছে। হারাণের বউ-ও কাজে লাগিয়া যায়। সাতকড়ি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, নূতন জায়গা দেখিয়া বেড়ায়। তাহা ভিন্ন, বৌদিদির সামনে পৌরুষ দেখাইবার সময় চণ্ডীচরণ তাহাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়াই চলে। পুরুষের সামনে পৌরুষ তেমন খোলে না।

চণ্ডীচরণ পড়িতেছে।

"সীতা চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্বতরুশাখায়—মদমত্ত ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুত্র তরুমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্যে! ঐ পর্বতের নাম মাল্যবান্; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধরসংযোগে শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে! এইস্থানে..."

এক, লক্ষ্মণ পড়িতেছেন আর সীতা শুনিতেছেন এর বেশি বোধ হয় একবর্ণও বুঝিতেছেন না গিরিবালা; কিন্তু লাগিতেছে বড় মিষ্ট। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বললেন লক্ষ্মণ ঐখানটায় ঠাকুরপো—"

চণ্ডীচরণ পড়িল "লক্ষ্মণ কহিলেন আর্যে, ঐ পর্বতের নাম..."

গিরিবালা দেয়ালে পিঠ দিয়া শুনিতেছিলেন, একটু যেন লজ্জিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"আর্যে মানে কি?"

যতটুকু জানে সেটা প্রকাশ করিবার জন্য চণ্ডীচরণ ব্যাকুলই থাকে, বলিল—"আর্যে বৌদিকেও বলে আবার মাকেও বলে; বৌদিদিও একরকম মা কিনা। বড় ভাই যে পিতৃতুল্য।"

গিরিবালা আর একটু যেন সংকুচিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—

সে জানি, তাইতো ওখানটা 'বৎস' বললেন সীতা। 'বৎস' ছেলেকে বলে,—যাত্রায় শুনেছি; ছেলেকে কিংবা যে ছেলের মতন তাকে, পড়ো।"

চণ্ডীচরণ পড়িয়া চলিল—"এইস্থানে আর্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। রাম, শুনিয়া পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস, বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না, শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্যবেগে উথলিয়া উঠিতেছে, জানকীবিরহ পুনর্বার নবীনভাব অবলম্বন করিতেছে…"

গিরিবালা শুনিয়া যাইতেছেন, বুঝিবার বালাই নাই বলিয়া মনোযোগেরও তাগিদ নাই; গম্ভীর রচনার মন্ত্রের সঙ্গে ঐ 'আর্যে' কথাটুকুকে লইয়া মনে যে এক সম্পূর্ণ অন্যধরণের ভাব উঠিয়াছে—এই প্রায় সমবয়সী চণ্ডীচরণকে ঘিরিয়া সেইটিতে লীন হইয়া গেছেন। নিজের মাকে, ভগ্নীকে, আর বধূকে যেন একসঙ্গে অনুভব করিতেছেন।….বাবা জেঠাইমাকে প্রায়ই বলিতেন—"বৌদিদি, তুমি মায়ের তুল্য গুরুজন, তোমার সামনে মিছে কথা বলছি না…." অথচ এই ভণিতাটুকু দিয়া মিছা কথাই বলিতেন। ছেলেমানুষ হইলেও গিরিবালা বুঝিতেন—ঐ প্রবঞ্চনাটুকুর মধ্যেই ছিল যত মাধুর্য, কেননা ঐটুকু ছিল রহস্য, ঐখানে মায়ের পাশে যেন বধূটি আসিয়া দাঁড়াইত, মা আর বৌদিদির তফাৎটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত।…এই অদ্ভুত সম্বন্ধটি সব মেয়েই গোড়া থেকে বুঝিতে পারে—কামনা করে শ্বশুর বাড়িতে গিয়া দেবর যেন অবশ্যই পায়; ব্রতে, পূজায় প্রার্থনা জানায়—'লক্ষ্মণের মতন দেওর হোক।'

দেবর থাকিলে নববধূ মাতৃত্বের খানিকটা সঙ্গে করিয়াই সংসারে

প্রবেশ করে। চণ্ডীচরণকে গিরিবালার বড় ভালো লাগিয়াছে। ওর মুখের পানে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছেন। প্রীতি আর স্নেহের দুইটি ধারা এক সঙ্গে নামিয়া যেন চণ্ডীচরণের সারাদেহে ধীর-সঞ্চারে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আর চণ্ডীচরণের সঙ্গটুকু আরও বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছে,—তাহার কারণ, আজ ওদিকে প্রায় সমস্তক্ষণই গিরিবালার বড় দুশ্চিন্তা আর অশান্তিতে কাটিয়াছে,—ঘাটের সেই ব্যাপারটুকুর পর থেকে। —মনোমোহিনী সেই যে চুপ করিয়াছেন, প্রায় সেই ভাবেই এখন পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ভগবতীচরণের পূজার জো করিলেন, অন্য সব কাজও করিতেছেন, কিন্তু কথার ভাগ সাংঘাতিক রকম অল্প। গিরিবালা—এড়াইয়া চলিতেছেন, সর্বদাই সশঙ্ক। এক একবার মনে হইয়াছে হারাণের বউকে কথাটা বলেন, কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহার সুযোগ একেবারে নাই। তাহা ভিন্ন হারাণের বউ কাজে এমন ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাকে একটু আড়ালে পাওয়াই অসম্ভব। গিরিবালা ব্যাকুল-সংশয়ে নিজেকে যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বেড়াইয়াছেন, সর্বদাই মনে হইয়াছে এইবার যেন কিছু একটা হইয়া পড়িল…

অবশেষে 'সীতার বনবাস' শুনিতে শুনিতে নিজের মনের রসে যখন ডুবিয়া গেছেন একেবারে, সেই সময়টিতে সেই-'কিছু-একটা' ঘটিয়া বসিল।—

কণ্ঠস্বর শুনিয়া গিরিবালা চিনিতে পারিলেন না, বোধ হইল যেন বাহিরেরই কে একজন বারান্দায় প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—"হ্যালা মোনু, লাহিড়ি গিন্নিকে কী বলেছিস সকালে আজ গঙ্গার ঘাটে?—সমস্ত পাড়া মাথায় ক'রে বেড়াচ্ছে…"

বই শোনার মাঝে গিরিবালা চকিত হইয়া বলিলেন—"চুপ কর

তো ঠাকুরপো একটু।” মুখটা একটু ঘুরাইয়া কান পাতিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনোমোহিনী দেবী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—“বেশ করেছি বলেছি একশোবার বলব। নতুন বৌটা সঙ্গে ছিল, নইলে ওর কটা রঙের গুমর আজ এমনি করে ভেঙে দিতুম যে ঐ উঁচু উঁচু দাঁতের সারি বের করে আর ব্যাখ্যানা করে বেড়াতে হতো না এজন্মে। মুখে আগুন, হিংসেতেই গেলেন। যার পায়ের কড়ে আঙুলের কাছে দাঁড়াবার মুরোদ নেই, রং নিয়ে তার ব্যাখ্যানা করতে এলেন! বুড়ো বয়সে লজ্জাও তো করল না একটু, একটা কচি কনে-বৌয়ের হিংসে করতে।....নেই সাঁতরায় এরকম বৌ, আসেনি বৌ এরকম,—এই আমি গলা ধরলাম, এগুক কে এগুবে। এতবড় সাঁতরার কথা ছেড়েও নিজের বৌয়ের গায়ে হাত দিয়ে বলে না কেন? এককাঁড়ি টাকার লোভে যে একটা কালপেঁচি এনে অমন ব্যাটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, তার কি? ওর কটা রঙের আলোয় বুঝি সেও সুন্দর হয়ে গেল? মুখে আগুন, খেঁদানাকী, পুকুরকপালী আবার একমুখ গুল নিয়ে গদাই-নস্করী চালে হেলতে দুলতে এসে—‘রংটা আরও দুপোঁচ সাদা হলে মানানসই হতো।’....তোর মাজা রঙের নিকুচি করেছে! আবার কাঁদুনি গেয়ে বেড়াচ্ছেন—‘মোনু আমায় বললে—’....মোনুর বলতে যে এখনও সবই বাকি. বৌভাতের কাজটা একবার চুকে যাক, তারপর....’

এমন সময়ে গলিতে একটা গলার উগ্র ঝাঁজ শোনা গেল। ভগবতীচরণ বাড়ি ফিরিতেছেন, কোথায় পরিচ্ছন্নতার কি ত্রুটি বোধ হয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, গর্জাইতে গর্জাইতে আসিতেছেন—“এ-অনাচার ইতর পল্লীতে—ব্রাহ্মণের পল্লীতে সইবে না—একেবারে পথ চলবার যো নেই। লক্ষ্মীও তাই চঞ্চলা হ’য়ে উঠেছেন পাড়ার মধ্যে।

হবেন না? ব্রাহ্মণপল্লীকে লোকে ব্রাহ্মণপল্লী বলে চিনতে পারে না, এমনি অবস্থা করে তুলেছে....”

বাড়ির মধ্যে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—“ওরে দেখ সব ঠিক আছে কিনা।....বৌমা কোথায় গেল, উঠে দেখ বাছা, তোমার শ্বশুর আসছেন, চেঁচাতে চেঁচাতে আসছেন,—অনথের উপর আবার অনথ বাধবে....চুপ কর মোনু, একটা লোক তেতে-পুড়ে আসছে....”

গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—“এখন থাক্ ঠাকুরপো, অন্য সময় শুনব'খন। কি চমৎকার গল্প ভাই, না?”

মনোমোহিনী দেবী মায়ের কথায় গলা আরও একটু বাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন—“করব না তো চুপ, এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, আমি যে পথে বেরুতেই আবাগিদের ট্যাঁশটেঁশে কথা শুনব তা পারব না....”

কাজের বাড়িতে—সে-বাড়ি স্বয়ং ভগবতীচরণের হইলেও—অগোছ-অপরিচ্ছন্নতার জন্য বেশী খোঁজাখুজি করিতে হয় না, তবু দরজায় প্রবেশ করামাত্রই ভগবতীচরণ একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। গিরিবালা গাড়ু, গামছা, লইয়া প্রস্তুতই ছিলেন, ভগবতীচরণ রকে উঠিয়া হাত পা ধুইয়া খড়ম পরিয়া নীরবে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন, গিরিবালা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

মনোমোহিনী দেবী ওদিকে বিনাইয়া বিনাইয়া বকিয়া যাইতেছেন, গলা এতটুকুও খাদে নামে নাই।

ভগবতীচরণ একবার প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে মা, মেনু এত রাগলো কার উপর?

নিজের সম্পর্কেই বলিয়া—গিরিবালা একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করিলেন "কি জানি জেঠামশাই!"

ভগবতীচরণ ব্যাপারটা যে আন্দাজ করিতে পারেন নাই এমন নয়, ডাকিলেন—"হ্যাঁরে, কি হয়েছে? অ মনু, শোন তো।"

মনোমোহিনী দেবী একটু আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন,—'হয়নি কিছু, তোমরা দেখবে না শুনবে না, কালোকুচ্ছিৎ, খাঁদাবোঁচা সব ধরে ধরে নিয়ে এসে ছেলের বিয়ে দিবে; বলবে না লোকে? একশোবার বলবে; কিন্তু আমায় কেন?—যারা করেছে তাদের বলুক....'

গিরিবালা যে অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন ভগবতীচরণের সেটা চক্ষু এড়াইল না। বলিলেন—"এই কথা? আচ্ছা তুই একবার পাখাটা নে দিকিনি, বৌমা ছেলেমানুষ, হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি এসো তো মা, আমার কাছে বসো।"

গিরিবালা পাশে আসিয়া বসিলে তাহার মাথাটি কাঁধে চাপিয়া ধীরকণ্ঠে কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন—"সত্যিই কি কালোকুচ্ছিৎ খাঁদা-বোঁচা এনেছি? তুই-ই বল। এই বছর খানেকের ভিতর এতগুলো বিয়ে হ'ল সাঁতরায়—কোন্ ক'নেটা...."

মনোমোহিনীর গলাটা একটু নরম হইয়াছে, কিন্তু ঝাঁজ যায় নাই, বলিলেন—"তুমি ন্যাকা সেজনা বাবা, ঐটি আমার অসহি, কেন সাতপুরুষ ধরে বাস কচ্ছ সাতরায়, এখানকার মানুষ চেন না? যত ভালো নিয়ে আসবে, তত বেশি যে এখানকার লোকের বুক কর্‌কর্‌ করবে। যদি দেবকন্যে নিয়ে আসতে...."

বুকের কাছে গিরিবালা যে আর নিজেকে সামলাইতে পারিতে-ছিলেন না সেটা ভগবতীচরণ খুব ভালোরকমই টের পাইতেছিলেন, সান্ত্বনাচ্ছলে মাথায় দক্ষিণ হাতটা বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"দেব

কন্যাই তো নিয়ে এসেছি, এর মধ্যে আর 'যদি' কি আছে? দেবকন্যা না হলে…"

কিন্তু ফল হইল উল্টা। গঙ্গার ঘাটে উদ্বেগ-আকাঙ্ক্ষা-অভিমানে যে-অশ্রু ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, সংসারে ছোট বড় কাজে, সেবায়, আদরে যে-অশ্রু ব্যাহত হইয়া ভিতরে ভিতরে বোধ হয় আরও বেশি করিয়াই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাকে আর রুখিয়া রাখা গেল না। শ্বশুরের কাঁধে মুখ লুকাইয়া গিরিবালা অসংবৃতভাবেই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেম।

ভগবতীচরণের মুখের শান্তভাবটা একেবারে বদলাইয়া গেল। অবশ্য চুপ করিয়া রহিলেন, তবে মুখ চোখ যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। খানিকটা সেই ভাবেই একদৃষ্টে সামনে চাহিয়া থাকিয়া নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইলেন, গিরিবালার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"চুপ করো মা, চুপ করো ; ছোট মন সব…."

একটু পরে কন্যাকে একটু বিরক্তির সহিতই কহিলেন—"মেয়েরা কে কি বলে আমায় শোনাস কেন মা? পুরুষ হ'লে ঘাড় ধরে মাটি চাটাতাম ; স্ত্রীলোকের সঙ্গে তো আর‥ যত সব নীচ প্রবৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ…."

—বলিতে বলিতেই আবার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল।

বাড়িতে বাপ আর মেয়ের এক প্রকৃতি,—কোপনস্বভাব অসহনশীল। বাঁচোয়া এইখানে যে একজনকে বেশী রাগিতে দেখিলে অপর জনের রাগ পড়িয়া যায় ; সামলাইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন।

মনোমোহিনী তাড়াতাড়ি বলিলেন—"শোনাতে যাব কেন? তুমি এসেছ কি জানি? তাহলে চুপ করেই যেতাম। লাহিড়ি' গিন্নির কথায় নাকি আবার মানুষে কান দেয়!…বৌ, বাবার মিছরির পানাটা

একটু নেবু দিয়ে নিয়ে আয়; বাড়ির বড় বৌ হয়ে এসেছেন, তাঁর নাকি বসে বসে কাঁদলে চলে!"

হাতটা ধরিয়া ধীরে ধীরে অন্য ঘরে লইয়া গেলেন।

৩

অশ্রু যে এই রকম একটু-আধটু না আছে এমন নয়—অভিমান, দুশ্চিন্তা, তাহার উপর একটা মুক্ত জীবন থেকে এই বন্ধন, শুধু দৃষ্টির উপরই নয়। সমস্ত জীবনটার উপরই এই অবগুণ্ঠন,—অশ্রু আছে বৈকি; কখন মনেই জমিয়া থাকে, কখনও আবার নয়ন-পল্লবকেও করিয়া তোলে সিক্ত। তবুও কিন্তু গিরিবালার চৈতন্য যে একটি নূতন ভাবের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জীবনের দিক্‌বলয় যে বিস্তীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে এটুকু তিনি বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করিতে পারেন। বৌভাতের আয়োজন হইতেছে, এতবড় একটা ব্যাপার যে তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই অনুভূতিটা এক এক সময় মনের কোথায় যেন পুলকরোমাঞ্চ জাগায়। অবশ্য বেলে-তেজপুরের ব্যাপারটার মাঝখানেও তিনি ছিলেন, কিন্তু তার আকস্মিকতায় অভিভূত হইয়া, অনুভব করিবার অবসর পান নাই। তা' ভিন্ন মা বাপের কাছে থাকিলে বোধ হয় নিজেকে বড় আলাদা করিয়া অনুভব করা যায়ও না।

আয়োজনের ব্যস্ততায়, ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বকাবকিতে বাড়িটা গমগম করিতেছে, দেখিতে দেখিতে ঘর দুয়ার হইয়া উঠিতেছে পূর্ণ,

আর এতসব দ্রব্যসামগ্রীর উপর একটি অধিকারবোধ জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে বোধ হইতেছে বড়, সমৃদ্ধ।

শুধু উৎসবের মধ্যেই নয় তো, মনে যে একটি নূতন স্পন্দন জাগিয়াছে, সাঁতরা সব দিক দিয়াই সেটাকে পুষ্ট করিতেছে,—গঙ্গার ঘাটের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা—একটা যে নূতন জগতেরই খানিকটা হঠাৎ দেখিয়া ফেলা; শুধু কি তাই—এখানে আসিয়া প্রকাণ্ড দেয়াল আরশিতে নিজের যে প্রতিচ্ছবিটা দেখিলেন প্রথম—সেটা পর্যন্ত এই নবমহিমান্বিত জীবনের সঙ্গে একসুরে বাঁধা—সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর, দেহে একগা গহনা,—নিজের সম্বন্ধে ওকথা ভাবিতে নাই, কিন্তু প্রতিবিম্বটা আচমকা দেখিয়া মনে হইল একটি যেন দেবীমূর্তি আসিয়া পিছনটিতে দাঁড়াইল, বিস্ময়ে একবার পিছনে দৃষ্টিক্ষেপও করিতে হইয়াছিল।

সাঁতরা যেন বন্ধন হইয়াও মুক্তি। বেলে-তেজপুরের মুক্তির মধ্যে শুধু বেলে-তেজপুরকেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া পাওয়া যাইত; সাঁতরার বন্ধনের মধ্যেও গিরিবালা ক্রমেই একটা বড় জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছেন।

এসবের সঙ্গে ঠিক একই সুরে বাঁধা সাঁতরার বাড়ির পূজাটি, প্রতিদিন ধূপ, ধুনা, সাজিভরা নানারকম ফুল, প্রচুর নৈবেদ্য আর রাঁধা ভোগ দিয়া নারায়ণের পূজা হয়, আরতির সময়ে বাড়ীর যে যেখানে থাকে আসিয়া সম্ভ্রমের সহিত ঘিরিয়া দাঁড়ায়, শেষ হইলে প্রণাম করিয়া মনের মধ্যে কি যেন খানিকটা বহন করিয়া স্থির মৌনতায় নিজের নিজের কাজে চলিয়া যায়। বড় আশ্চর্য এবং [illegible] লাগে গিরিবালার। পূজা করেন ভগবতীচরণ। নিজে সংস্কৃত[illegible] খুব বড় পুরোহিত; শুদ্ধ উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণে, ভক্তির একটি

অপার্থিব জ্যোতিতে এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন যে দেবতাকে যেন নামাইয়া আনিয়াছেন। পূজার সমস্ত আয়োজনটি করেন মনোমোহিনী দেবী, খুব সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া। এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে গিরিবালার মনে একটা প্রবল আকুতি জাগে। সঙ্কোচ কাটাইয়া কাহাকেও মনের কথাটা বলিতে পারেন না, শুধু পূজা আরম্ভ হইয়া গেলে ধূপদানির সামনে বসিয়া অভঙ্গনিষ্ঠায় ধুনার যোগান দিয়া যান।

বেলে-তেজপুর থেকে আসিবার দিনপাঁচেক পরের কথা। পূর্বরাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়া, বাছা, গোছান লইয়া কাটিয়াছিল; মনোমোহিনী দেবীর মাথাটা ধরিয়াছে, উঠিতে পারিলেন না। গিরিবালাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৌ। তুই চট করে নেয়ে নে ভাই; বাবার পূজোর জোগাড়টা তুই-ই কর আজ; পারবি তো? আমার মাথাটা ধরেছে একটু।"

গিরিবালা খুব বড় করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, এতবড় সৌভাগ্য যে নিজেই পথ করিয়া আসিবে এ তাঁহার ধারণারও বাহিরে।

মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"তুই ঠাঁই করে ফুল-নৈবিদ্যিগুলো সাজিয়ে দিব; ভোগের দিকে তোকে দেখতে হবে না; সে মা-ই ঠিক সময়ে দিয়ে যাবেন। দেখ, পারিস তো বল।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"পারব না কেন ঠাকুরঝি? খুব পারব।"

এ দায়িত্বপূর্ণ অভীপ্সিত কাজটুকু পাইয়া তাঁহার মনটা যেন নিজের মধ্যে আঁটিয়া উঠিতেছে না। সংসারের প্রয়োজনীয়তায় একেবারে যেন কয়েক স্তর উঠিয়া গেছেন। বলিলেন তুমি একটু ভালো করে ঘুমোও ততক্ষণ। জেঠামশাইয়ের পূজোটা হয়ে গেলেই আমি এসে তোমার মাথাটা টিপে দিচ্ছি।"

যাইতে যাইতে দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া' বলিলেন—"আচ্ছা ঠাকুরঝি, তুই বগে একটু আপিন টিপে রাখলে কেমন হয়? ছোট্ট গোল করে কাগজ কেটে, তাতে আপনি লাগিয়ে…"

—মুখখানি উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মনোমোহিনী বলিলেন—"আঃ, এ ঠানদিদিকে নিয়ে কি করি বলো দিকিন! তোকে যা বললাম তাই করগে যা তো। আপিন রগে টিপবো কি আমার গুলে খেতে ইচ্ছে কচ্ছে তোর গিন্নিত্বের জ্বালায়…."

গিরিবালা অল্প একটু হাসি মুখে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। স্নান করিয়া একখানি লালপেড়ে গরদ পরিয়া চন্দন ঘষিতেছেন, ফুল বিল্বপত্র আসিল। এ ভারটা চণ্ডীচরণের উপর; আজকাল সাতু তাহার সঙ্গী জুটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, গাছে চড়ায় দক্ষ, তাই আপোস ব্যবস্থায় বিল্বপত্র চয়নের ভারটা পড়িয়াছে তাহারই উপর। কোঁচড় ভর্তি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, গিরিবালাকে একলা পূজার চার্জে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল. জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি তুই আজ পুজোর জো করছিস?"

গিরিবালা বাঁ হাতটি চন্দনকাঠের উপর রাখিয়া সেটি আবার ডান হাতে টিপিয়া ধরিয়া যথাপদ্ধতি চন্দন ঘষিতেছিলেন, হাত থামাইয়া, যেন এমন কিছুই আশ্চর্য হইবার ব্যাপার হয় নাই এই ভাবে বলিলেন—"শুনছ কথা সাতুর ঠাকুরপো?—ঠাকুরঝির শরীর খারাপ, আর কে করবে শুনি?"

বড় হইলেও সাতুর কথার টো'টা বদলায় নাই, বোধ হয় অত বড় আর অত রাগী মনোমোহিনীর দেবীর পরেই দিদির আসন হইয়াছে দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"উরে ব্বাসরে!"

সাতুর এই উচ্ছ্বাসগুলি প্রায়ই অসঙ্গত হয় বলিয়া চণ্ডীচরণের বড়

কৌতুক বোধ হয়, মুখ ঘুরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"আবার সেই—উরে ব্বাস্‌রে!"

কোঁচড় উজাড় করিয়া দুইজনে হাসিতে হাসিতে কার্যান্তরে চলিয়া গেল;

গিরিবালা অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢালিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। অন্যদিনের চেয়ে আরও বেশি করিয়া, বোধ হয় আরও ঘন করিয়া দুই-রকম চন্দন ঘসিয়া চন্দনপাত্র ভরিয়া দিলেন, নিখুঁৎভাবে ধুইয়া ফুল, বিল্বপত্র, দুটা আলোচাল আলাদা আলাদা করিয়া পুষ্পপাত্রে সাজাইয়া রাখিলেন। পরাতে খুব নিখুঁৎ করিয়া আলোচালের চূড়া রচনা করিয়া নৈবেদ্য সাজাইলেন।...বাহিরে কে একজন প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁগা, মোস্থ প'ড়ে, পূজোর জোগাড় কে করছে?"

উত্তর হইল "বৌমা।"

"পারবে তো. ছেলেমানুষ?"

কি অভিমতটা হয় জানিবার জন্য গিরিবালা হাত থামাইলেন। উত্তর হইল—"তা সেয়ানা আছেন, সব কাজই তো করছেন টুকটাক করে।"

গিরিবালা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেলেন। সাজান উপচারগুলি আরও নরম আঙুলে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন, আলোচালের চূড়া আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিলেন; আরও কি করিবেন, প্রতিদিনের আয়োজনের উপর কি করিয়া একটু বিশিষ্টতা ফুটাইবেন; ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন।...ইচ্ছাটা জেঠ্‌শ্বশুর আসিয়া তাঁহাকে আয়োজননিরতা দেখেন, তাহা হইলে পূজা করিতে বসিয়া বিস্মিত প্রশ্ন করিতে হইবে না—আজ এমন চমৎকার আয়োজন কে করলে মা?"....সে যে আবার ভীষণ লজ্জায় পড়িয়া যাইবেন গিরিবালা!

শ্বশুরের যেন আজ বেশি বিলম্ব হইতেছে, দিন বুঝিয়া। গিরিবালা

ওদিককার কাজটুকু আর কোন মতেই টানিয়া বাড়াইতে না পারিয়া উঠিয়া আসিয়া প্রদীপ আর ধূনার ব্যবস্থা লইয়া বসিলেন। ধুনুচিতে ঘুটের আগুন সাজাইয়া পাখা উঠাইয়াছেন, গলিতে ভগবতীচরণের গলার স্বর শুনা গেল, অশুচিতার জন্য অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন। বাড়িতে একটু সাড়া পড়িয়া গেল—"ঐ আসছেন....গাড়ু গামছা ঠিক আছে তো ?...গৈলের দিকে কে আছে ?....বিন্দি, ঝাঁটাটা সামনে থেকে সরিয়ে রাখ....বঁটিটা কে দাঁড় করিয়ে গেছে গা, আঃ...."

কাজের বাড়িতে অল্প একটু অপরিচ্ছন্নতার কথা বোধ হয় ধরিয়া লইয়াই ভগবতীচরণ দুইদিন থেকেই আর কোন দিকে না চাহিয়া পা ধুইয়া একেবারে সোজা পুজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

গিরিবালা বলিলেন—"আজ আপনার একটু দেরি হয়ে গেল জেঠামশাই ?"

"হ্যাঁ মা, হয়ে গেল একটু দেরি, আর বল কেন ? যা সব কাণ্ড, এক পা পথ চলবার জো আছে ?...

আসন গ্রহণ করিলেন। গিরিবালা ধুনুচিতে ধুনা ছাড়িয়া দিলেন। আচমনের জন্য গণ্ডুষ তুলিয়াই কিন্তু ভগবতীচরণ হাতটা ধীরে ধীরে নামাইয়া লইলেন; সমস্ত শরীরটা যেন শুষ্ক হইয়া কাঠের মত কঠিন হইয়া উঠিল, রুক্ষস্বরে ডাকিলেন—"কোথায় গেলে ? শোনো একবার।"

গিরিবালা বিস্মিতভাবে মুখের পানে একবার চাহিয়া আতঙ্কে দৃষ্টি নত করিলেন।

গৃহিনী হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাড়াতড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন, বাড়ির সমস্ত শব্দ একেবারে থামিয়া গেল, সকলে সব কাজ ছাড়িয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতর বারান্দা এখানে-ওখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভগবতীচরণ হাতের জলটা ফেলিয়া দিলেন, দুয়ারের পানে ঘাড়টা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"মোনু আজ পূজোর জো করে নি?

গৃহিণী বলিলেন—"না, তার মাথাটা ধরেছে, তাই.."

ভগবতীচরণ একেবারে ঝাঁজিয়া উঠিলেন—"মাথা ধরেছে তো এতবড় সংসারটায় পূজোর আয়োজন করতে কেউ জানে না? যেমন পাড়ার অবস্থা তেমনি কি বাড়ির অবস্থাও হয়ে উঠেছে?...."

গিরিবালা গুটাইয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন; মাত্র একটি বোধ আছে, সমস্ত শরীরটা যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

গৃহিণী শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কি হয়েছে যে...?"

"কিচ্ছু হয়নি, তোমাদের নজরে কিচ্ছু হয়নি, কিন্তু ভগবতী ভট্চায্যির বাড়ির লোকের জানা উচিত যে এ-বিল্বিপত্রেও পূজো হয় না, এ দুর্বোতেও পূজো হয় না।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে এক খাবলা বিল্বপত্র গোটাকতক দূর্বা সামনে ফেলিয়া দিলেন। গৃহিণী সামনে আসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিলেন—"তা ছেলেমানুষ, অত জ্ঞান হয়নি যে দ্বিপত্রী বিল্বিপত্র আর তিনপাতের বেশি দূর্বো পূজায় চলে না। দিচ্ছি বেছে, আসন ছেড়ে উঠোনা..."

"ছেলেমানুষ! আর কাউকে বুঝি পেলে না যে শেষে চণ্ডেকে দিয়ে..."

বলিতে বলিতেই গিরিবালার উপর নজর পড়িয়া গেল, বোধ হয় পত্নীর ইসারা লক্ষ্য করিয়াই। মুখটা রাঙা হইয়া বুকের উপর লুটাইয়া গেছে, পাখা হাতে ডান হাতটা আস্তে আস্তে কাঁপিতেছে, শরীরে যেন নিঃশ্বাস লওয়ার স্পন্দনটুকুও নাই। কাঁদিতেছেন না,—সেটা নিশ্চয়, অবস্থাটা কান্নার অতীত বলিয়া।

ভগবতীচরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ লক্ষ্য করিলে

দেখিত তাঁহার মুখের উপর এক একবার একটা' ছায়া পড়িতেছে—যেন একটা মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। গিরিবালাকে একটিও আশ্বাসের কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া আসনটিতে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল, যন্ত্রণার রেখাগুলি মিলাইয়া গিয়া সমস্ত মুখটা শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু বড় অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল, আরও কতক্ষণ কাটিত বলা যায় না, গৃহিণী আসিয়া দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"দাও কুষি করে একটু গঙ্গার জল, হাতটা ধুয়ে ফেলি।"

—কুয়ার জলেই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া গরদের কাপড় পরিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

ভগবতীচরণ যেন একটা ঘোর থেকে উঠিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

"ডুব্বো বিল্বিপত্রগুলো ঠিক করে দিই।"

"ও!....নাঃ, ঠিক করবার আর কি আছে? যাও তুমি।"

আচমনের জন্য জল তুলিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"প্রদীপটা জ্বেলে দাও তো মা।"

তাহার পর আচমন করিয়া পূজা শুরু করিয়া দিলেন। সেদিন একটা ভয় লাগিয়া ছিল বলিয়া গিরিবালা অনেকবারই চোখ তুলিয়া শ্বশুরের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন,—যতবারই দেখিলেন মনে হইল মুখটা যেন আরও বেশি করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বড় আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল।

গিরিবালা ছেলেদের বলিতেন—"আরও আশ্চর্যি যে অমন রাগী, অমন খুঁৎখুঁতে তো?—সে সব যেন একদিনেই কোথায় চলে'গেল। অবিশ্যি তখন বাড়িতে কাজের ভিড়, অতটা কেউ লক্ষ্য করেনি, আমি

পাণ্ডুল যাবার মুখে আবার যখন সাঁতরায় এলাম, ঠাকুরঝির আমায় নিয়ে কি টানাটানি।”

‘—বল্, কি মন্ত্র জানিস? আমি অত খিটখিট ক’রে যাঁর স্বভাব বদলাতে পারিনি, পাড়ার লোকে অত সাবধান হয়েও যাঁকে একদিনের তরেও ঠাণ্ডা রাখতে পারলে না, তুই নিজে দাবড়ানি খেয়ে তাঁর ওপর কী মন্তর ঝাড়লি যে একেবারে সে মানুষই নেই।”…সে টানাটানি ঝুলোঝুলি যদি দেখতিস। গিরিবালা হাসিতে হাসিতে ছেলেদের বলেন—“হ্যাঁরে, আমি মন্তর কি দোব বল্ দিকিন? ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন আমায়, দেখলেন ছেলেমানুষ ভয়ে আঁৎকে গেছি, মনে বোধ হয় খুব লাগল, সেই থেকে বকা ঝকা ছেড়ে দিলেন। মানুষ তো অমন হয় না, যেমন পণ্ডিত, তেমনি তেজী, তেমনি পরের উপকার করতে; ঐটুকু বোধ হয় একটু খুঁৎ ছিল—তাও খুঁৎই বা কি?—নিজের জন্যে কেউ একটা কথা কখন মুখে আনতে শোনে নি—তা সেটুকুও ছেড়ে দিলেন। অমন হঠাৎ কি পারে না ছাড়তে লোকে? তোর কাকা কি ক’রে তামাক খাওয়া ছাড়লেন একদিনে?…”

সে-স্মৃতিতে গিরিবালা একেবারে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, বলিতেন—“পাণ্ডুলের কথা, তোর সেজপিসীর বিয়ের সময়। একে ঠাকুরপো এমনই ভয়ানক অন্যমনস্ক স্বভাবের লোক, তায় বিয়ের গোলমালে কোনদিকেই খেয়াল নেই—একেবারে হুঁকো টানতে টানতে আমাদের ঘরে উপস্থিত। আমি তো একেবারে থ হয়ে গেছি, একি কাণ্ড।—বড় ভাইয়ের সামনে একেবারে হুকো টানতে টানতে—তাও —ঠাকুরপোর মত মানুষ। উনিও কি রকম হয়ে গিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছেন—ঠাকুরপো, বরযাত্রীদের সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে তাই শুনিয়ে আস্ফালন ক’রে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কে একজন নাকি

ভয়ঙ্কর লম্বা আর বদমাইস—বরের কোন বন্ধু—সেইটে দেখাতে যেমন হাত তুলবেন মশারির দড়িতে কলকেটা লেগে ছিট্‌কে একেবারে ওঁর দাদার পায়ের কাছে···ঠাকুরপো চমক ভাঙতেই তো পড়ি-তো-মরি করে ঘর থেকে ছুট, আমরা আগুন সামলাব কি হাসব—উফ্‌!···”

গিরিবালা আবার হাসিতে ভাঙিয়া পড়েন। একটু পরে নিরস্ত হইয়া আবার সাঁতরার স্মৃতিতে যান ডুবিয়া। বলেন—“ঠাকুরপোর এটা যেন হাসির কথা, তোদের বড় দাদু কিন্তু আমায় বড্ড ভালোবাসতেন বলেই দিলেন ছেড়ে অব্যেসটা—বোধ হয় মনে হ'ল আহা, ছেলেমানুষ, চেষ্টার তো কসুর করে নি, বড্ড লেগেছে মনে; বকাঝকার ওপরই কেমন একটা ঘেন্না ধ'রে গেল···”

৪

কাল বৌভাত, কাজটা খুব বড় হইবে বলিয়াই কয়েকদিন বিলম্ব হইল। একে একে সবাই কর্মের আবর্তের মধ্যে টানা পড়িতেছে, গিরিবালা পড়িয়া গেছেন একা। চণ্ডীচরণের পর্যন্ত “সীতার বনবাস” পড়িবার অবসর নাই। সাতু কখন কখন তেমন অসাধারণ কিছু ব্যাপার হইলে দিদির কাছে তাহার নিজের পদ্ধতিতে রিপোর্ট দিতে আসিতেছে, দিয়া তখনই আবার নূতন বিস্ময় সংগ্রহে ছুটিয়া যাইতেছে।····“এই এত বড় বড় সাতাশটা রুই!—রাঙা টকটকে—উরে ব্বাসরে!···এগার'শ লোক হবে,—হ্যাঁ, আমি নিজের কানে শুনলাম; তোর শ্বশুরবাড়ি কি বড়লোক দিদি!” দিদি হয়তো বলেন—“চুপ কর সাতু, খুঁড়তে আছে অমন করে?” সাতু একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়ে।

তখনই কিন্তু হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, বলে—"ব্বাসরে! দিদির গায়ে লাগে!"

বৈকালের দিকে সাতুর আসাও বন্ধ হইয়া গেল। এই নিঃসঙ্গতাকে আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলিল আকাশের অবস্থা। একটু একটু করিয়া বেশ মেঘ জমিয়া আসিল; বাড়ীর মধ্যে ত্রস্ত ভাবটা একটু বাড়িয়া গেল, চারিদিকে জিনিসপত্র ছত্রাকার হইয়া রহিয়াছে। গিরিবালা একটু বাহিরে আসিয়া সাধ্যমত গুছাইয়া তুলিতে লাগিলেন। হারাণের বৌ একবার কাজের ছুতা করিয়া একটু ঘেঁসিয়া আসিল; চাপা গলায় বলিল—"নিজের কাজে অত খাটতে আছে নাকি? বোস গে; নিন্দে হবে যে।"

গিরিবালা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। মনটা যেন আরও নিজের মধ্যে গুটাইয়া গেল। উপরে উঠিয়া ছাতের কাছাকাছি সিঁড়ির একটা ধাপে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। ছড়্-ছড় করিয়া তফাতে তফাতে খুব বড় বড় ফোঁটায় এক আছড়া বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর একটু বিরাম দিয়াই বেশ সজোরে নামিল।

এই কয়টা দিন যেন একটা প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে কাটিয়াছে,—অপরিচয়ের আশঙ্কার সঙ্গে নব পরিচয়ের আনন্দ, নিত্য-প্রশংসার পাশে পাশে নিন্দার সম্ভাবনার জন্য উদ্বেগ; সম্মুখে প্রসারিত নূতন জীবন লইয়া আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময়, সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানিত ভয়...আদরে-অশ্রুতে একটা ঘনীভূত চেতনার যুগ। মন থেকে দৃষ্টি সরাইলে বাহিরের কর্মকোলাহল, সেখান থেকে দৃষ্টি সরাইলে এই অনুভূতি-ঘন চেতনা; একটি যেন নূতন সত্ত্বা।

আজ এই প্রথম একটি প্রশস্ত অবসরের মধ্যে গিরিবালা নিজেকে লইয়া বসিতে পাইলেন। চারিদিকে বর্ষা দিয়ে ঘেরা সিঁড়ির এই

জায়গাটুকুতে নিজেকে যেন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাওয়া গেল। বড় অসহায় বলিয়া বোধ হইল গিরিবালার, কয়টা দিনে যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া গেছেন, নির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকিলেও মনটা হু-হু করিতে লাগিল—কিছু বুঝিতে পারেন না, শুধু একটা অবোধ ব্যাকুলতা, মনে একটা কান্না ঘনাইয়া উঠিতেছে; এই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় যেন একটা অবলম্বন না হইলেই নয়। অথচ কিসের খোঁজ, কী-সে অবলম্বন বোঝা যায় না।

হঠাৎ এই বৃষ্টির ওপারে একটা আলোর আভাস ফুটিয়া উঠিল,—মায়ের হাতে প্রদীপ, আঁচলে আড়াল দিয়া মা রান্নাঘর থেকে পাশেই ভাড়ার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। দরজার মুখে দাঁড়াইয়া ও-দাওয়া থেকে বলিতেছেন—গিরি, দোলাইটা গায়ে দিযে নে, আজ একটু গা'টা তেতেছিল তোর।”

—বেলে-তেজপুরের কবেকার একটি অর্ধ-বিস্মৃতসন্ধ্যা,—বর্ষাসিক্ত পথে মায়ের বুকের বেদনা উদ্বেগ বহন করিয়া আচমকা আসিয়া পড়িয়াছে। ঝর্ ঝর্ করিয়া গিরিবালার চক্ষে বন্যা নামিল। মনটাকে অশ্রুর পথেই উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিরিবালা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুধু কাঁদিলেন—বেশ অনেকক্ষণ; তাহার পর অঞ্চলের খানিকটা দিয়া মুখটা ঢাকিয়া ঝাপসা আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

বেলে-তেজপুর আবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পুরাতন ঘটনার অসংলগ্ন অংশ সব লইয়াও, আবার প্রশ্নের মধ্যেও: এই বর্ষায় বাবা কি করিতেছেন?…ঘরটাতে আর সবাই আছে, শুধু গিরিবালাকে দেখা যায় না,—কে তামাক দিয়া গেল বাবাকে?—হরিচরণ?….জেঠাইমা কি আজকাল আরও কম বাড়িতে থাকেন? ঠিক এখন, এই সময়টিতে কোথায়?…আসিবার সময় বলিলেন—“ও গিরি কি করে টেঁকব

বাড়িতে মা ?"...কিন্তু তবুও তো গিরিবালাকে সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বিদায় করিয়া দিলেনই....

আবার চক্ষে ধারা নামিল গিরিবালার ; ফুলের চারিদিকে মৌমাছির মতো ঐ একটি কথা যেন মনে গুন্ গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—'সাত-তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিলেনই তো ?—সাত-তাড়াতাড়ি বিদেয় করে ?'

অশ্রু মুছিয়া আবার মুখে আঁচল দিয়া বসিয়া রহিলেন।

জেঠামশাই...কোথা থেকে ঘুরিয়া আসিয়া এইমাত্র বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। কানে কণ্ঠস্বর আসিয়া লাগিতেছে—"গিরি-মা কোথায় গো ?"—তাহার পরই ভুলটা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া গেলেন। গিরিবালা দেখিতে পাইতেছেন—তিনি নাই অথচ তাঁহাকে ডাকিয়া ফেলায় জেঠামশাইয়ের মুখটা যেন কেমন হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া আবার ভুলিয়া ডাকিলেন—"গিরি !"

সমস্ত বেলে-তেজপুরটার জন্যে মন কেমন করিতেছে। সাঁতরার মতো এত বড় নয়, এত সমৃদ্ধ নয়, সেইজন্য যেন আরও বেশি করিয়া মায়া হয়, মনটা যেন সেই ছায়াঘন মেটো বাড়ির ছোট গ্রামটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। গিরিবালা অনুভব করেন বেলে-তেজপুর তাঁহার জীবন থেকে সরিয়া যাইতেছে ; আরও সেইজন্যই যেন দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিতে চান।

নীচে খোঁজ পড়িল—"হ্যাঁগা, বৌমা কোথায় ?"...."তাইতো, কনে'বৌ কোথায় ?" গিরিবালা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া, আরও কয়েকটা ধাপ নীচে নামিয়া বসিলেন। হাওয়াটা উল্টা দিকে হইলেও বৃষ্টির কণা ভাসিয়া আসিয়া অল্প অল্প সিক্ত করিয়া দিতেছিল। বেলে-তেজপুর ভুলিয়া নীচের দিকে কান পাতিয়া

উৎকণ্ঠিতভাবে বসিয়া রহিলেন, এখনই কেহ উপরে আসিয়া পড়িবে।

উপরে ওঠার পদশব্দ শোনা গেল, হারাণের বৌ আসিয়া বাঁ-গালে তর্জনী স্পর্শ করিয়া বলিল—"ওমা দিদিমণি হেতাকে? একা বসে বসে করছ কি?"

"কি আর করব? বেশ ঠাণ্ডা, তাই একটু বসে…"

শেষ করিতে না পারিয়া খানিকটা কাপড় মুখে চাপিয়া গিরিবালা চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিলেন। হারাণের বৌ উঠিয়া আসিয়া পাশে বসিল, বলিল—"কাঁদ যে দিদিমণি। মায়ের জন্মে মন কেমন করচে।… হ্যাঁগা, তা করবে নি? অতদিনের ঘর ছেড়ে আসা। ··ওবা সব বলাবলি করছেন—'বেশ ভুলে আছে শ্বশুর বাড়িতে এসে, বড় হয়েচে তো মেয়ে?' ….আমি মনে মনেই বন্নু—থামো বাপু, উনি আবার যখন কান্না ধরবে, থামান দায় হবে; মা জেঠাই ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারত নি যে মেয়ে …"

মনোমোহিনী দেবী উঠিয়া আসিলেন, সিড়ির মোড়টায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন—"বৌ এখানে? আর আমরা ছিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি।…কাঁদছে যে!…

গিরিবালা কাঁদিয়া বাড়ির মান বাড়াইয়াছেন. হারাণের বৌ মোটেই ক্ষুন্ন নয়…খানিকটা স্বীয় কল্পনাশক্তির সাহায্য লইয়াই বলিল—"কাঁদবেই তো; বড্ড চাপা মেয়ে, সুবিধে পেলেই এইরকম লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ায়—কবার তো আমিই দেখনু। জেঠাইয়ের, মায়ের কত অনুগত, মন কেমন করবে নি?…"

মনোমোহিনী একটু রাগিয়াই উঠিয়া আসিলেন, বলিলেন—"তুমি সরো তো বাছা, খুঁজেপেতে ভ্যালা মানুষ সঙ্গে দিয়েছেন ওঁরা,—ও কাঁদবে আর তুমি আরও উসকে দেবে—ব্যবস্থা মন্দ নয়।…সরো।"

লোকটি তত ভাল নয়, হারাণের বৌ উঠিয়া একটু অপ্রতিভভাবে দেয়াল ঘেষিয়া দাঁড়াইল। মনোমোহিনী গিরিবালার পাশে বসিয়া তাঁহাকে দুই হাতে আলগাভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, হারাণের বৌকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—"কাঁদবেটা কেন শুনি? জেঠাইয়ের, মায়ের অনুগত হলেই নিজের বাড়িতে এসে কাঁদবে? আর মা-জেঠাই যেন কতই না দূরে পড়ে রয়েছে! সাঁতরা থেকে হাওড়া, তারপরেই ডুমজুড়, নেমে বেলে-তেজপুর। লোকে দুবেলা যাওয়া আসা করছে। এই তো বোয়ের মামাতো ভাই না কে নেমন্তন্ন রক্ষে করতে এসেছে; দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছে আর এই,—কটাই বা হবে এখন?"

হারাণের বৌ বেকাদায় পড়িয়া গিয়াছিল, সুবিধাটুকু আর হাতছাড়া হইতে দিল না; "ওমা, বিকাশঠাকুর এয়েচেন?—যাই তো, দেখিগে" —বলিয়া তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

হারাণের বৌ চলিয়া গেলে কিন্তু মনোমোহিনী আর ওরকম ছেলে ভোলান গোছের করিয়া বানাইয়া বানাইয়া কিছু বলিলেন না বড়। ভাজকে বুকের কাছটিতে লইয়া একরকম চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলেন; মাঝে মাঝে দু'একবার শুধু বলিলেন—"চুপ কর্ বৌ, চুপ কর্।"

বৃষ্টির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজের চক্ষু শুধু সিক্ত হইয়া আসিল। যেন কয়েকবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"যে-স্বর্গ অনেক তপস্যার জোরে পেলি তারই উপর মন বসা বৌ। আমার বড় অলুক্ষণে বাই ছিল— নিত্যি বাপেরবাড়ি বাপেরবাড়ি, তাই...."

রুদ্ধকণ্ঠ সামলাইয়া লইয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে যখন বেশ ভালো করিয়া সামলাইয়া লইয়াছেন, বলিলেন—"ওঠ তোর দাদার সঙ্গে দেখা করবি চল। তোর বাপের বাড়ি থেকে পাঁচটা বড় মিরগেল পাঠিয়েছে, অমন মিরগেল

এদিকে দেখাই যায় না বড় একটা ; দু হাঁড়ি জনাই-এর মনোহরা, আরও কি কি সব।...একটা কথা বলি শুনে রাখ বৌ।" শেষের কথাটুকু একটু দাঁড়াইয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত নিচু গলাতেই বলিলেন, গিরিবালা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"ঝিটাকে শিকিয়ে দিবি দেওয়া-থোওয়া নিয়ে যদি তোর বাপেরবাড়ির নিন্দে করে কেউ তো যেন মিষ্টি করে শুনিয়ে দেয়। মায়ের আমার খুঁৎখুঁতুনি রোগ আছে, নিজের মা বলেই ন্যায্য কথাটা বলতে ছাড়ব নাকি ?—তার ওপর আবার ওবাড়ির পিসীর ফোড়ন দেওয়া আছে।.... তোমরা সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবে ছেলের, তারা পেরে উঠবে কোথা থেকে ?—গেরস্ত লোক।...কেপ্পন নয় তো, এই তো তত্ত্ব পাঠিয়েছে—একটা ছোটখাটো যজ্ঞি হয়ে যায়।...চল্।"

দুই ধাপ নামিয়া বলিলেন—"থাক্, তোর আর কিছু বলে কাজ নেই ঝিকে, নিন্দে হবে। আমিই মুখ বন্ধ করে দোব'খন। দেখিস্ ন— এই যা এসেছে সেই নিয়ে কেমন মিষ্টি মিষ্টি করে বলব, ও-বাড়ির পিসীকে শুনিয়ে শুনিয়ে ;—ওঁর ছেলের বিয়ে এই সেই দিন হয়ে গেল কি না...."

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ মনোমোহিনী দেবীর ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া মুখের উপর কাতর দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—"থাক্‌গে ঠাকুরঝি, লক্ষ্মীটি, আমার মাথা খাও।"

তাঁহার এই ভাব পরিবর্তনে, বিশেষ করিয়া এই আকুলভাবে 'লক্ষ্মীটি' বলিবার ভঙ্গীতে মনোমোহিনী দেবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"দেখো কাণ্ড, কা'কে যেন এতক্ষণ ধরে বললাম !.... তা শোন বসে বসে বাপের বাড়ির খোঁটা,—আমারই যেন যত মাথাব্যথা।"

হাসিতে হাসিতেই ভাজকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বিকাশদাদা অনেকগুলি বই আনিয়াছেন, বলিলেন "তোর বিয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কি না,—পিসেমশাই গিয়ে বাবাকে, বড পিসীকে বললেন—'গিরির বিয়ে, একটা বোধ হয় হাঙ্গামা বাধবে, তোমরা শীগ্‌গির চলো।'....এরকম কখনও বিয়ের নেমন্তন্ন হয়? যেন ডাকাত পড়েছে. পুলিস ডাকতে এসেছেন।...এই সেদিন গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে কলকাতা থেকে বইগুলো কিনে নিয়ে এলাম। পড়বি, পড়বি তো?—যত সব মায়েদের কথা আছে এগুলোতে।"

একটু চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন—"কেমন লোক এরা রে?"

গিরিবালা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—"খু—ব ভালো, বিকাশদা, এমন দেখি নি।"

"খুব ভালো, অমন দেখা যায় না।"

বিকাশের মুখে কি জন্য অল্প একটু হাসি ফুটিল, সেটা ঠোঁটে মিলাইয়া লইয়া বলিলেন—"খুব বড বংশ, না?"

গিরিবালা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, মুখটা গম্ভীর করিয়া একটু দুলাইয়া লইয়া বলিলেন—"খু-ব বড! জেঠশ্বশুর যে মস্তবড পণ্ডিত। আর শ্বশুর—মানে বাবার সেখানে খুব নাম, সায়েব পর্যন্ত খাতির ক'রে 'সরকার' বলে ডাকে, ওদেশে সরকার মানে মনিব—এত ভালবাসে সায়েব।....খুব বড় বংশ বিকাশদাদা।"

ভগ্নীর উচ্ছ্বাস দেখিয়া, বিশেষ করিয়া কথার মধ্যে 'খু-ব বড়'-র ছুট্ দেখিয়া বিকাশ কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন; বলিলেন—"আমিও তাই দেখছি।.. আমাদের জন্যে তোর মন কেমন করে না, নারে গিরে?"

গিরিবালা ছেলেমানুষের মতো বলিয়া ফেলিলেন—"না করে না

আবার!—এই তো এতক্ষণ কাঁদছিলাম বসে বসে; ঠাকুরঝি গিয়ে…"

হঠাৎ লজ্জিত হইয়া একটু জড়সড় হইয়া গেলেন। চণ্ডীচরণ আসিল, সাতুর নকল করিতে করিতে—"উরে ব্বাস্‌রে! বৌদিদির বাড়ি থেকে কি বড়্‌কা বড়্‌কা মাছ এসেছে!…"

৫

পরের দিন সকালবেলার কথা।

কাজের ব্যস্ততায় ভিতর-বাড়ি, বাহির-বাড়ি গম গম করিতেছে। ভিতরে পাড়ার যত পাকা পাকা রাঁধিয়েরা একত্র হইয়াছে; চড়ানো, নামানো, খুন্তিনাড়া, সাতলানোর সঙ্গে নানা আলোচনা চলিয়াছে, পান দোক্তা গুল দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইতেছে। বাহিরের একদিকে ভিয়ান বসিয়াছে, সেখানে তামাকের জমাট আসর, থেলো হুকার গলায় বাঁধা কড়িগুলা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আনা, রাখা, ঘোরাঘুরি—সমস্ত জায়গাটাতে ব্যস্ততা যেন আঁটিয়া উঠিতেছে না; বাড়ির মধ্যে তিল ছড়াইলে মাটিতে পড়ে না। ঘর বারান্দা আত্মীয়-কুটুম-অভ্যাগতে থই থই করিতেছে। বাহির হোক, ভিতর হোক যেখানেই একটু অবকাশ, ছেলেমেয়েরা ভরাট করিয়া ফেলিতেছে। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের মিশ্র কলতানে, কাজের সঙ্গে অকাজের চঞ্চলতায়,—উৎসবটা যেন সর্বাঙ্গে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল।—

বিপিন উৎসবের মধ্যে ছিলেন না। দুইদিন পরে চলিয়া যাইতেছেন, বোধ হয় বরাবরের জন্যই, তাই এই কয়দিন ধরিয়া সাঁতরাকে নেষ

নিবিড়ভাবে উপভোগ করিয়া লইতেছেন। ওঁর পশ্চিমে-গড়া দেহ-মন শক্তির মধ্যে দিয়াই আত্মপ্রকাশ খোঁজে, তাই ওঁর জীবনটাই বহির্মুখী। ওঁদের ব্যায়াম সমিতি, ক্রিকেট ক্লাব আছে, ওদিকে সুইমিং ক্লাব, রোইং ক্লাব আছে, সবেরই মুখ্য বিপিন অর্থাৎ ওঁর শক্তিটা সাঁতরার জলস্থল উভয়ত্রই ছড়াইয়া আছে। বাড়ি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে চলে কোথা থেকে ওঁর? বাচ খেলা আর সন্তরণের বার্ষিক প্রতিযোগিতাটা মাস দেড়েক পরে ছিল, চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া—আগাইয়া আনিতে হইয়াছে, বিপিন এখন গঙ্গা লইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য যতটা সংগোপনে সম্ভব; বাবা আসিয়া পড়িয়াছেন, সময়টাও খুব অনুকূল নয়।

পাড়ার জন তিনেক বন্ধু মিলিয়া স্নান করিতেছিলেন। পথে জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হইয়া গিয়াছিল, বলিয়া দিয়াছেন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে, বাড়িতে কাজ। অন্য দিনের তুলনায় স্নানটা অল্পের উপরই সারিয়া দেখা গেল হোরমিলার কোম্পানীর শান্তিপুরগামী জাহাজটা আসিতেছে; একজন সাথী বলিল—"ঢেউটা খেয়ে যাবিনি বিপিন?"

বিপিন একটু অগ্রপশ্চাৎ করিতেছিলেন, অপর সঙ্গী বাড়ির কাজ লইয়া একটু বিদ্রূপ করিল। দোমনা ছিলেনই "চল্ তবে"—বলিয়া ঘুরিয়া আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরাদমে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সঙ্গীদ্বয় অনুসরণ করিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক পিছনে পড়িয়া গেল।

প্রায় যখন মাঝামাঝি আসিয়া গেছেন একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন জাহাজটা তখনও বেশ খানিকটা দূরে। হাত থামাইয়া একটু গা-ভাসান দিয়া—অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, সঙ্গীরা আগাইয়া আসিল।

কিন্তু রক্তে তখন দোল লাগিয়াছে, শরীর এলাইয়া অপেক্ষা করিতে ভালো লাগিল না। সঙ্গীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"তোরা এই দিকে থাক, আমি ওদিককার ঢেউটা খেয়ে ফিরছি।

সঙ্গী দুইজনেই ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"পারবি নি পেকতে বিপিন, জাহাজ এসে পড়ল বলে।"

জাহাজ পূর্ণ বেগে চলিয়া আসিতেছে; নিয়তির সূক্ষ্ম আকর্ষণ—একটা অদ্ভুত উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়াছে প্রাণের মধ্যে, রক্তে যেন ফুট্ ধরিয়াছে।...বিপিন একবার চকিতে জাহাজটার দিকে দেখিয়া লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে 'খুব পারব' বলিয়া জলে বুকের একটা প্রবল ধাক্কা দিয়া সামনে ঠেলিয়া গেলেন।...জাহাজটা সতর্কতার উৎকট নিনাদ করিয়া উঠিল।

পিছনে আবার শব্দ হইল—"পারবি নি।" বিপিন তখন পূর্ণোদ্যমে হাত পা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিনারার লোকেরা "গেল গেল" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, কাছাকাছি যত সব নৌকা ছিল তাহাদের মাঝিরা হাল-দাঁড় ছাড়িয়া একটু স্তব্ধ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই পরিণামটা বুঝিতে পারিয়া জাহাজমুখো হইল।

জাহাজের সারেং ব্যাপারটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে দেখিল লোকটি আসিয়া গা ভাসাইয়া—দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, বুঝিল ঢেউ খাইয়া ফিরিয়া যাইবে, সারাপথে দুইদিকেই এই ব্যাপার হইতেছে, রোজ। হঠাৎ সামনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। জাহাজ থামাইবার নির্দেশ দিয়াই বাঁয়ে মোড় ঘুরাইল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, বরং ফল উল্টাই হইল, বাঁয়ে মোড় ফিরাইতে বেগমত্ত জাহাজটা আরও কয়েক সেকেণ্ড হাতে পাইয়া শিকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। বিপিনের হিসাব ভুল হইয়াই গিয়াছিল, জাহাজ মোড়

ফিরানয় আরও এই কয়েক সেকেণ্ড হারাইয়া বসিলেন। যখন ঘুরিয়া দেখিলেন জাহাজ হাত চোদ্দ-পনেরর মধ্যে, মনে হইল ভীষণ গর্জনের সঙ্গে একটা পাহাড় যেন মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দৃশ্যটা অসহ্য বলিয়া হোক বা প্রাণধর্মের কোন গূঢ় তড়িৎ-নির্দেশেই হ'ক, বিপিন ডুব দিলেন।

রূপ আর শৌর্যের আকর্ষণে সাতকড়ি ভগ্নীপতির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাঁতার দেখিবার জন্য চণ্ডীচরণকে সঙ্গে লইয়া সেও বিপিনের পিছু পিছু আসিয়াছিল, এই ঘটনা-বিপর্যয়ে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। উৎকট ঔৎসুক্যে আশা নিরাশার মধ্যে যতটা পারিল দেখিল, তাহার পর ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটিল। বেশ খানিকটা দূরেই বাড়িটা; যখন পৌঁছিল তখন আর মুখে রা সরিতেছে না। চণ্ডীচরণ—"দাদা, দাদা,..." করিয়া কয়েকবার ঢোক গিলিল, সাতু হাঁপাইতে হাঁপাইতে অসংলগ্নভাবে বলিল—"মুখুজ্যেমশাই ডুবে গেছেন।"

"জাহাজের নিচে"—বলিয়াই চণ্ডীচরণ ভিড় চিরিয়া ভিতরের দিকে ছুটিল।

খবরটা যেন বিদ্যুতের বেগে আবালবৃদ্ধবনিতা—সবার কানে পৌঁছিয়া গেল। এত অপ্রত্যাশিত আর এতই ভীষণ একটা দুর্দৈব যে কেহই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না প্রথমটা; হাতের কাজ লইয়া সবাই থমকিয়া দাড়াইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল একটু. মুহূর্ত কয়েকের জন্য সব যেন নিশ্চল হইয়া গেল, তাহার পরই মেয়েদের কান্নায়, পুরুষের হাঁকাহাঁকি, বিস্মিত প্রশ্ন প্রভৃতিতে একটা ভীষণ কলরব উঠিল, অলক্ষিতে কে যেন একটা চাবির পাক দিয়া উৎসবের মুখরিত আনন্দ-কলরবটা বিভীষিকার আর্তনাদে রূপান্তরিত করিয়া দিল। হাতের কাজ ফেলিয়া একটা বড় দল গঙ্গাভিমুখে ছুটিল।

গিরিবালা উপর ঘরে পূজার জোগাড় করিতেছিলেন, হঠাৎ ক্রন্দনের রোলের সঙ্গে একটা অব্যক্ত কোলাহল শুনিয়া চন্দনকাঠ হাতে করিয়াই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সাতু হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল—"মুখুজ্যেমশাই জাহাজ চাপা পড়েছেন!"

দিনের সব আলো এক মুহূর্তেই নিবিয়া গেল, একটা অন্ধকার গহ্বর থেকে যেন গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কে?...কি হয়েছে?"

সাতু উত্তর না দিয়াই হুড়দাড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নাবিয়া যাইতেছে, শেষ চৈতন্যে গিরিবালার মাত্র এইটুকু ধরা পড়িল, তাহার পর সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়া দেবতার সামনে লুটাইয়া পড়িলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা মিনিট দশেক স্থায়ী হইল না। যাহারা গঙ্গাভিমুখে ছুটিয়াছিল, অর্ধেক যাইতে না যাইতেই দেখিল ওদিক হইতে কয়েকটি ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে, দূর থেকেই হাত তুলিয়া বলিল— "বেঁচে গেছে!" এ-দলের কয়েকজন শুনিয়াই বাড়ির পানে ছুটিল, কয়েকজন ব্যাপারটা সবিস্তারে শুনিবার জন্য অগ্রসর হইল। কয়েকজন ছুটিয়া একেবারে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। দেখিল একটা সবুজ-রঙের পানসি করিয়া বিপিন প্রায় ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিশেষ এমন যে ক্লান্তভাব তাহা বোধ হইল না, তবে কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "চণ্ডে বুঝি খবর দিয়ে দিয়েছে বাড়িতে?" আওয়াজ শুনিয়া সবার যেন বুকের জোর বাড়িল, একটা মিশ্র কলরব উঠিল—"না, কাজ কি খবর দিয়ে!...তোমার আক্কেলটা!...গোঁয়ারতুমিতে প্রাণটা দেবে একদিন..."

হাসিতে না পারিয়া বিপিন রাগের দিকেই চেষ্টা করিলেন—"কি এমন হয়েছে যে...একটুতেই যেন সব হাত-পা এলিয়ে দেবে! বাবা, জেঠামশাইও খুব রেগেছেন?"

"না, সরবতের বাটি হাতে করে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

পিছনকার দলটাও ঘাটের উপর দেখা দিল; "উঠেছে?" বলিয়া—একটা চিৎকার উঠিল।

এতবড় একটা দলের মধ্যে পথ অতিক্রম করা—তিরস্কার, প্রশংসা আর উৎসুক প্রশ্নাদির জবাব দিতে দিতে—ভাবিতেই বিপিনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল বাঁচিয়া যেন একটা গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়িয়া গেছেন। বলিলেন—তা বেশ তো তোমরা এগোও, আমি আহ্নিকটা সেরেই চলে আসছি।"

অবশ্য ও চালটা টিকিল না। শুধু আহ্নিকের উপর হঠাৎ শ্রদ্ধার বহর দেখিয়া অনেকগুলি মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর শ্লেষের ফোয়ারা ছুটিল মাত্র।

ভগবতীচরণ পূজার জন্য উপরে উঠিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কলরবটা উত্থিত হইল। নামিতে যাইবেন, তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়াই সাতকড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠিয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভাইবোনের কথাটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, নামিতে নামিতে সাতকড়ি তাঁহাকেও সংবাদটা শুনাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভগবতীচরণ দুই ধাপ নামিয়াই আবার উপরে উঠিয়া গেলেন। বধূ ফুলের পরাতের উপর শরীরটা লুটাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ভগবতীচরণ প্রায় মনের স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন, একটু ইতস্ততঃ করিলেন—কোন্‌দিকে যাইবেন, তাহার পর খড়ম ছাড়িয়া ভিতরে গিয়া, আস্তে আস্তে পূজার সরঞ্জামগুলা সরাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আর যেন কোথাও কিছু হইতেছে না এইভাবে বধূর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া মুখে জলছিটা দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

নীচে থেকে সিঁড়ি বাহিয়া কে একজন উগ্রবেগে ঠেলিয়া উঠিতেছে,

স্বর লক্ষ্য করিয়া ভগবতীচরণ বুঝিলেন গৃহিণী। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া লইলেন—স্ত্রীলোকেরা এমন আকস্মিক বিপদপাতে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া বসে, দোষটা নববধূর উপর দিয়া কটুভাষে আক্রোশ মিটাইয়া মন হালকা করে; অনেক সময়ে আক্রোশ আরও উৎকট আকারের দেখা যায়।....উগ্র দৃষ্টিতে দুয়ারের পানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণী ক্ষিপ্রপদে উঠিয়া আসিলেন—শোকে অসহায়তায় যেন উন্মাদ হইয়া গেছেন। অমন শান্ত চক্ষু দুইটি যেন জ্বলন্ত ভাটার মতো হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবতীচরণ শান্তকণ্ঠে একবার প্রশ্ন করিলেন—"কি ?"

সঙ্গে সঙ্গে বধূকে রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, হুঙ্কার দিয়া বলিলেন —"নামো, এক্ষুনি নেমে যাও, যা বলবার আমায় বলগে, আমি ওঁর সর্বনাশ করেছি···জেনে শুনে····"

এখানে কর্তাকে দেখিবেন ভাবিতে পারেন নাই, তাহা ভিন্ন বধূকেও অচৈতন্য দেখিবেন আশঙ্কা করেন নাই, গৃহিণী যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভগবতীচরণ আবার গর্জন করিয়া উঠিলেন—"নামো, নইলে আমি কুরুক্ষেত্র করব, আমার মাথার ঠিক নাই।"

ওঁর উগ্রমূর্তি দেখিয়া স্থগিত ক্রন্দনের আর একটা উচ্ছ্বাস তুলিয়াই গৃহিণী সিঁড়ির মাথায় আছাড় খাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন—শোক আর ক্রোধের রুদ্ধ আবেগটা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চিৎকার শুনিয়া মনোমোহিনী দেবী, আরও কয়েকজন উপরে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, মূর্ছাহত জননীকে দেখিয়া—"ওরে মা-ও আমাদের ছেড়ে গেলেন !" বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।....সমস্ত বাড়ীটা যেন ওলটপালট হইয়া গেল।

এই সময় নীচে আর একটা শব্দ হইল—"বেঁচে গেছে!" সংবাদটা সঙ্গে সঙ্গে দূরে কাছে, নানান মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। আবার যেন একটি চাবির মোচড়েই কে সমস্ত দৃশ্যটা পরিবর্তিত করিয়া দিল। প্রতি মিনিটেই নূতনতর খবর আসিয়া পড়িয়া উৎসবের পূর্বভাবটা ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। তখন টুকরা-টাকরা যতটুকু খবর পাওয়া গেল তাহাই লইয়া কল্পনার সাহায্যে চলিল গভীর আলোচনা। কোন কোন মুখে বিপিনের শক্তিরও তারিফ আরম্ভ হইয়া গেল।—"আমি শুনেই বলেছিলাম অসম্ভব—গঙ্গাটাকে তো বিপিন গোষ্পদ করে তুলেছে···ওদের দেশের যা গঙ্গা, তার সামনে এতো একটা সুঁতী··· শুনছি নাকি চলল পশ্চিমে এবার ?····সাঁতরার আর শক্তি নিয়ে বড়াই করবার কিছু রইলনা তাহ'লে···সাঁতারের প্রাইজটা এবার তাহলে নির্ঘাৎ বালির দল নিলে..."

একসময় বিপিন যখন দলপরিবৃত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কলরবটা আবার একটু মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, মেয়েদের মধ্যে ক্রন্দনটাও আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। খানিক পরে সকলের আবার আসন্ন দায়িত্বের কথা মনে পাড়ল, উৎসবের বিভিন্নমুখী কাজ আবার নিজের নিজের পথে চালু হইল।

ভগবতীচরণ অদ্ভুতভাবে শান্ত। গিরিবালার মাথা কোলে লইয়া জলের ঝাপটা দিয়া ব্যজন করিতেছেন। পাশে বসিয়া আছেন মধুসূদন আর মনোমোহিনী দেবী, আর চতুর্থ কেহ উপরে নাই; সিঁড়ির মুখে পর্যন্ত জটলা করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন।

গিরিবালার দুইবার চৈতন্য হইয়াছিল, আবার মূর্ছা গেছেন। মনোমোহিনী দেবীর চাপা কান্না এক একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন একবার রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"মা একটাকে ফিরিয়ে

দিয়ে কি একটাকে নিলেনই দাদা? ডাকি না হয় প্রিয়নাথ ডাক্তারকে।"

ভগবতীচরণ গিরিবালার কপালে খানিকটা চন্দন লেপিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"কিছু ভয় নেই মধু, চুপ করো। এ-আসরে আর ডাক্তার আনতে চাইনা, দরকারও নেই।"

একটু পরেই আবার গিরিবালার চৈতন্য হইল; ক্রমে জ্ঞানও ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, ঘোমটাটা তুলিয়া দিবার জন্য হাতটা উঠাইবার চেষ্টা করিতে, মনোমোহিনী দেবী কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিলেন।

একটু পরে জ্ঞানটা আরও স্পষ্ট হইতে গিরিবালার মুখে হঠাৎ একটা উৎকট ভীতির ছায়া ফুটিয়া উঠিল; ভগবতীচরণ যেন অপেক্ষাই করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি মুখটা নামাইয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নেই মা, বিপিন নেয়ে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে; তার কি কিছু হতে পারে আর?"

আরও একটু পরে মনোমোহিনী দেবীকে বলিলেন—"যা তোর গর্ভধারিণীকে ডেকে আন, নিয়ে যা বৌমাকে আমার ঘরে। যেন একেবারে গোল না হয় ওধারে।"

মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"পূজোর ফুলটুলগুলো বদলে দেবার ব্যবস্থা করি বাবা?"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"ওর মধ্যে একটা কিছুও বদলান চলবে না; তবে একটু গুছিয়ে দে। তুই যা বরং, বৌমাই দিচ্ছেন আস্তে আস্তে, কাপড়টা ছাড়া আছে।....পারবে তো মা?"

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—পারিবেন।

উঁহারা যখন গিরিবালাকে তুলিলেন, মধুসূদনও উঠিতে যাইতেছিলেন, ভগবতীচরণ বলিলেন—"তুমি একটু ব'স মধু।"

উঁহারা নামিয়া গেলে একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"মধু, সমস্তটা জানা ব্যাপার, আমি এই জন্যেই তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে এলাম ঘরে, নৈলে একদিনে কি বিবাহ হয় ?"

মধুসূদন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"না, দাদা, তোমার গণনায় অবিশ্বাস ? তবে..."

ভগবতীচরণ যেন নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন—"তুমি বোধ হয় অতটা লক্ষ্য কর নি যে বিপিনের কুষ্ঠিটা আমি বরাবরই নিজের কাছে রেখে এসেছি, তুমি চেয়েছ কয়েকবার, কাটিয়ে দিয়েছি এ-কথা সে-কথা বলে ; একটা ভয়ানক ফাঁড়া ছিল, তুমি কোনখানে দেখিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠবে বলে দিই নি। কন্যার কুষ্ঠিতেই এর কাটান ছিল, কিন্তু সে-কন্যা পাচ্ছিলাম না আমি। শেষকালে বৌমার কুষ্ঠিটা হাতে আসতেই বুঝলাম ওষুধ পাওয়া গেছে। আমি আর একদিনও দেরী করলাম না। অনেকে চটেও গেল।

অবশ্য ঠিক যে আজকের দিনটিতেই এটা ঘটবে অতটা ঠাওর করে উঠতে পারি নি। তাহ'লে আজ আর কাজের হিড়িকটা করি না, তবে বিপদটা যে শীগগিরই আসছে তা আমি জানতাম।"

ভগবতীচরণ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটু আবেগ-কম্পিতস্বরেই বলিলেন—"মা আমার আশ্চর্য মেয়ে মধু! একটা কথা বলে দিচ্ছি—ওঁর মনে কখনও যেন কষ্ট দেওয়া না হয়। বেহাইরা ভালো দিতে-থুতে পারেন নি,—সাধারণ গেরস্ত, তায় বড্ড তাড়াহুড়োও হয়ে গেল ; কিন্তু এই নিয়ে যেন কখনও ওঁকে কিছু বলা না হয়।...যাও, দেখো গিয়ে কতদূর কি হচ্ছে।"

নিজের কথা সম্বন্ধে গিরিবালার মনের ভাবটা অদ্ভুত গোছের ছিল, —কতকটা ঔদাসীন্য কতকটা কৌতুক। তিনি যেন মাঝে মাঝে আপনা হইতে একটু তফাৎ হইয়া নিজেকে পর্যবেক্ষণ করিতেন—বিস্মিত কৌতূহলে নিজের পানে চাহিয়া থাকিতেন।

উত্তরজীবনে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করিতে করিতে বলিতেন—"সেই থেকে আমি যেন সবার চোখে কী এক অন্য জিনিষ হ'য়ে গেলাম। আমায় দেখবার জন্যে পাড়ায় যেন সব আহার-নিদ্রে ছেড়ে দিলে। পান সাজছি—"ও বৌমা, একবার বেরিয়ে এসো, এঁরা তোমায় দেখতে এসেছেন।" ঠাকুরপোর কাছে বইপড়া শুনছি—"বৌ, আয় তো একবার,...ওপাড়ার নতুনখুড়ি তোকে দেখবেন।'...ছাতে পূজার জো করতে উঠছি—'বৌদি, ঘোষেদের বৌয়েরা তোমায় দেখতে চাইছে, নেমে এসোতো একবার।'...উনি নিজের খ্যামতায় বেঁচে গেলেন, তার উচ্চবাচ্যই নেই, মাঝে পড়ে নতুন-বৌয়ের যশে গ্রাম ছেয়ে গেল; যার যশ তার কি রকম মনে হয় বল্ দিকিন। মনে হয় না কোথা থেকে একটা আপদ জুটে আমার হক্ নষ্ট করছে?..."

গিরিবালা কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া ওঠেন—যেন খুব ফাকি দিয়া স্বামীকে তাঁহার একটা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে, বিপিন যে নিজের শক্তিতেই বাঁচিয়া গেলেন সে-কথায় বিন্দুবিসর্গও সন্দেহের কারণ নাই। শৈলেন স্বকর্ণেই পিতার মুখে গল্পটা শুনিয়াছে—"আমি ঠিক জাহাজটাকে কাটিয়ে আগেই বেরিয়ে যেতাম, কেন না গা-ভাসিয়ে দিয়ে তখন আবার আমার পুরো দম ফিরে

এসেছে। কিন্তু ঐ যে একটু যাব কিনা যাব দোমনা হয়ে গেলাম, আর ঐ যে ওরা টুকে দিয়ে একটু অন্যমনস্ক করে দিলে ঐতেই সব গোলমাল হয়ে গেল, তার ওপর আবার সারেংটা জাহাজের মোড় ঘুরিয়ে—যাও একটু আশা ছিল সেটা নষ্ট করে দিলে। লোকে চেঁচামেচি করছে, বাঁশী ফুকরে উঠছে, আমি কিন্তু কোন দিকে না চেয়ে প্রাণপণে হাত পা চালিয়ে চলেছি। শেষে হঠাৎ কি মনে হ'ল একবার ফিরে দেখলাম,—না দেখলে আর বাঁচবার কোন উপায়ই ছিল না; দেখি বন্‌বনিয়ে ছুটে আসছে জাহাজটা, বোধ হয় হাত চোদ্দ পনেরর মধ্যে এসে গেছে। আমি তখন একেবারে মাঝখানে, এগুলেও গেছি, পেছুলেও গেছি। হঠাৎ কি মনে হ'ল, যতটা সম্ভব দম বুকে ভরে নিয়ে ডুব দিলাম, আর ডুব দিয়েই মাথাটা নিচের দিকে করে মাটি লক্ষ্য করে হাত টেনে যাওয়া—এইটুকুই মনে আছে, যতক্ষণ বুকে দমের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত ছিল ততক্ষণ ঐভাবে একঠায় টেনে গেছি, তারপর মুখটা বুজে গা ভাসিয়ে দিলাম।

মাঝগঙ্গায় পুরো ভাটার টান, জাহাজটা চলেছে উল্টাদিকে, যখন উঠলাম জাহাজটা অনেকখানি দূরে। আমি অবশ্য তখন অজ্ঞান হয়ে গেছি, তবে খুব বেশিক্ষণ অজ্ঞান হইনি; একেবারে ভাসবার মুখে মুখে হয়ে থাকব, সেই জন্যে পেটে এক আধ ঘোটের বেশি জল ঢোকেনি। গুকবল এই যে, ভেসে উঠলাম একটা নৌকোর পাশে, তক্ষুনি তুলে নিলে। ঘাটে পৌছুবার—অনেক আগেই আমার ভালো রকম জ্ঞান হয়েছে। তখন ভাবনা হয়েছে বাড়ি ঢুকব কি করে,—বাবা রয়েছেন, জেঠামশাই রয়েছেন, বাড়িতে কাজ, লোকে লোকারণ্য...ঠিক করলাম সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে ওখানে লুকিয়ে কাটিয়ে দিয়ে, গা ঢাকা হ'লে খিড়কির দোর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ব। ওরা যখন নামতে বললে, বললাম—"তোমরা এগোও, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা সেরে এক্ষুনি আসছি আমি।"

এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা মনে পড়িয়া গিয়া পিতা নিজে হইতেই হাসিয়া ওঠেন। বলেন—"যেন আহ্নিক ভিন্ন আর অন্য ভাবনা ভাববার ফুরসৎ নেই আমার। কিন্তু তা'কি তারা শোনে কখনও? কি করে যে বলতে পেরেছিলাম কথাটা ভাবলে আমার এখনও হাসি পায়। তাও—'তোমরা দাঁড়াও, আমি আহ্নিকটা সেরে নিই'—নয়,—"তোমরা এগোও; আমি সেরে আসছি!"

মধুসূদন যতটা তাড়াতাড়ি করিতে চাহিয়াছিলেন ততটা সম্ভব হইল না। প্রথমে গিরিবালাকে বাপের বাড়ি পাঠান লইয়া গোলমাল হইল। বৌভাতের দু'দিন পরে 'দিন' হইয়াছিল। ঠিক হইয়াছিল সেখানে দুদিন থাকিবেন, তাহার পর বিপিনবিহারীর সঙ্গেই সাঁতরায় ফিরিয়া আসিবেন। এখানে আরও দুইদিন থাকিয়া মধুসূদনের চাকরি-স্থান পাণ্ডুলে সকলে চলিয়া যাইবেন, সকলে মানে,—মধুসূদন, বিপিনবিহারী, গিরিবালা আর গিরিবালার বাপের বাড়ির কোন ঝি; যদি হারাণের বৌ যায় তো সে-ই।

কথা হইতেছে মধুসূদনের পাণ্ডুলে যেরূপ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, সেখানে তাঁহাকে আর একটা বেশ বড় ভোজের ব্যবস্থা করিতেই হইবে,—বৌভাতেরই একটা পুনরনুষ্ঠান। বড়ছেলের বিবাহ দিয়াছেন, শুধু যে ছেলেটিকে লইয়া গিয়া নির্বিবাদে আফিস সুরু করিয়া দিবেন সেটা চলিবে না।

আরও একটা কথা আছে, তাঁহার নিজের পরিবার সব পাণ্ডুলেই রহিয়াছে, এক বিপিনবিহারী আর চণ্ডীচরণ ছাড়া। বিবাহটা এত অকস্মাৎ হইয়া গেল যে তাঁহাদের আর আনা সম্ভব হইল না। সে যুগে যাতায়াতের এত সুযোগ ছিল না যে একটা খবর দিলেই সবাই এই প্রায় চারশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কয়েকঘণ্টার মধ্যে চলিয়া আসিবে। বৌভাতের পুনরনুষ্ঠান সেদিক দিয়াও দরকার। যাহাই হউক, তাড়া-

তাড়ি করা কিন্তু সম্ভব হইল না। ভগবতীচরণ বলিলেন—"দিন তো ঠিক করেছিলাম মধু, কিন্তু একটা ফাঁড়া গেল। বৌমা ত একলা ফিরবেন না, বিপিনকে জোড়ে যেতে হবে—ধীরে সুস্থে আরও একটা ভালো দিন দেখি, এসব কাজে তাড়াহুড়ো করে না।"

আসল কথা, গিরিবালা আসিয়াছেন পর্যন্ত জেঠশ্বশুরের নয়নের মণি হইয়া উঠিয়াছেন, বৌভাতের সকালের ব্যাপারটার পর যেন আরও খুঁজিয়া বেড়ান। মধুসূদন বুঝিলেন জ্যেষ্ঠের মনের ভাবটা। বলিলেন—"তাহ'লে তাই হোক দাদা, আমি যাই, বিপিন আর বৌমাকে পরে পাঠিয়ে দিও। না, তাড়াতাড়ি করার আমিও পক্ষপাতী নই।"

বৌভাতের পরদিন তিনি একাই চলিয়া গেলেন।

বৌভাতের জের কাটিতে আরও দুইটা দিন গেল, তাহার পর সাঁতরার বাড়ির জীবনের ধারা আবার পুরাতন খাতটিতে নামিয়া আসিল।

আসন্ন উৎসবের জন্য যে একটা উত্তেজনা-উৎকণ্ঠার ভাব ছিল, সেটা কাটিয়া গিয়া দৈনন্দিন জীবনের নিরুদ্বেগ গতির মধ্যে গিরিবালা যেন পরিবারের মধ্যে নিজের স্থানটি নূতন করিয়া অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিলেন। এ-কটা দিন তিনি যেন একটা ঘর-সাজান জিনিস হইয়াছিলেন, সময়ে অসময়ে সবাই আসিয়া দেখিতেছে, সন্তর্পণে আসিয়া মুখের একটি বিশেষ ভাব বজায় রাখিয়া বসিয়া প্রশংসা শুনিতেছেন। চলাফিরা কথা কওয়ার মধ্যে একটি বিশেষ ছন্দ অনুসরণ করিতে হইতেছে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি—কোথাও ত্রুটি ঘটিল কিনা।....বৌভাতের পর,—বোধ হয় বৌভাতের দিন বধু দেখার পালাটা পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার জন্যই ওদিক হইতে গিরিবালা অনেকটা ছুটি পাইলেন। বৌভাতের দিন এখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা

হইয়া গেল, সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে ভাবও হইল। মনটা একেবারে অবগুণ্ঠনের অবস্থা থেকে যেন একটু বাহির হইয়া আসিল। কুটুম্ব-পরিজন যাহারা আসিয়াছিল তাহারা একে একে চলিয়া যাওয়ায় সংসারের সবাইকে যেন আরও একটু বেশি করিয়া পাওয়া গেল—শ্বশুরকে, শাশুড়িকে, মনোমোহিনী দেবীকে, তাঁদের সেবার মধ্য দিয়া কতকগুলি বিশেষ কাজও হাতে আসিল। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"বাবার কাজগুলো সব তুই-ই কর বৌ, বাবার ভেতরের ইচ্ছেটাও তাই। তবে তাতে আমার পান-দোক্তা জোগাতে যদি একটু এদিক-ওদিক হয় তো ননদ যে কি জিনিস টের পাইয়ে দোব।"

দুপুরে যখন আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা জড়ো হয়,—মেজাজ হিসাবে তাসখেলা, নভেলপড়া বা গল্প-গুজব হইতে থাকে, মনোমোহিনী দেবী বলেন—"তুই একটু সেবা কর ব'সে ব'সে বৌ, তোর হাতটা খুব মিষ্টি।"

কাজ, কিন্তু এখানকার কাজের মধ্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত অবসরের ভাব আছে, তাই বাড়ির কথা আগেকার চেয়ে বেশি করিয়া মনে হয় একটু। পূজার জো করিতে করিতে চোখের পাতা ভিজিয়া আসে। একটি ছোট মেয়েকে দেখিতে পান, বেলে-তেজপুরে চিরপরিচিত ঘরবাড়িতে, চিরপুরাতন সঙ্গীদের মধ্যে আদর, বকুনি, হাসি, অভিমানের আলো-ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাঁতরায় নিজেকে আলাদা বলিয়া মনে হয়, যেন সম্পূর্ণ এখানকার লোক।...একটা অব্যক্ত বেদনায় মনটা ভারিয়া আসে,—বেলে-তেজপুরের ঐ সঙ্কীর্ণ অথচ মুক্ত জীবনটিকে ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করে। এদিকে এই নূতন জীবনেরও তো অচ্ছেদ্য মোহ আছে! বেলে-তেজপুর থেকে আলাদা হইয়া গেছেন ভাবিতে কষ্ট হয়, কিন্তু সাঁতরার জীবন থেকে আলাদা হইবার কথা যে ভাবাই

যায় না। প্রতিদিন সব যেন বেশি করিয়া আপনার হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যেক মানুষটি থেকে ঘরবাড়ি, আসবাব-পত্র—সব।...খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না, তবে গিরিবালা অনুভব করেন তিনি বড় হইয়া গেছেন, চারিদিক দিয়া ; সুদূর হইয়া গেছেন, আর পিছু ডাকার মত কোথা থেকে এক অতি ক্ষীণ কান্নার সুর ভাসিয়া আসিতেছে।

আজকাল সাতকড়িও দিদিকে একটু বেশি করিয়া পায়, তাহারও ফুরসৎ আছে, দিদিকেও সর্বদা লোকে ঘিরিয়া থাকে না। দিদি নিজের ঘর গোছায়, সাতকড়ি বিছানায় বা চেয়ারে বসিয়া সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। গিরিবালা গোছানর মধ্যে ঘোরাফেরা করিতে করিতে "হু-হাঁ" দিয়া যান, এক সময় হয়তো একখানা কাপড় লইয়া জানলার শানটিতে বসেন, কুচাইতে কুঁচাইতে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলিয়া ওঠেন—"আচ্ছা বল্‌তো, এতক্ষণ জেঠাইমা কি করছেন সাতু ?"

সাতকড়ি হেঁয়ালির প্রশ্ন দেওয়ার মতো একটা আঙুল তুলিয়া বলে—'বলব—বলব ?—...ঘোষাল ঠাকুরমার সঙ্গে গপ্প ক'রছেন।"

কোঁচান বন্ধ করিয়া গিরিবালা তর্কের ভঙ্গিতে বলেন—"না, কক্ষনও না। আমি বলছি, খোকার হাত ধরে এইমাত্র বাড়ি ঢুকলেন, ওঁর গা ধোওয়ার সময় হয়নি ?...বিকাশদাদা খোকার নাম কিশুরী বেখেছেন, নারে ? আমি আসবার দিন শুনলাম।...খোকাকে ঠিক "কিশুরী কিশুরী" বোধ হয়, নারে ?—বেঁটে, টুক্‌টুক্ করছে রং, হাসি হাসি..."

সাতকড়ি বলে—"কিশুরী নয়, কিশোর।"

"ঐ হ'ল, একই কথা। এমন দেখতে ইচ্ছা করে খোকাটাকে ! বিকাশদাদা বলছিলেন—'দিদি-দিদি করে নাকি বড্ড হেদিয়েছে ; কবে যে যাব বেলে-তেজপুরে, মন কেমন কচ্ছে বড্ড।....আচ্ছা এইবার বল্—মা কি করছেন ?"

"খিড়কির পুকুরে গা ধুচ্ছেন।"

"এবারেও হ'ল না, ঠিক দেখে নিস্; মা এতক্ষণ বাবার ঘরটা পরিষ্কার টরিষ্কার করছেন, আমি নেই যে; বাবা এক্ষুণি এসে পড়বেন না?"

হয় তো হারাণের বৌও আসিয়া পড়ে, দরজার কাছটিতে বসিয়া পড়িয়া বলে—"কি গো, ভাই-বোনে তোমাদের কি গপ্প হচ্ছে?...শুনছি এখনও যাওয়ার দিন ঠিক হ'ল না, আর তো ভালো লাগে না; বাড়িতে কি হ'চ্ছে কে জানে?"

গিরিবালা বলেন—"এসেছিস, দু'দিন থাকই না হারাণের বৌ; কেন, জায়গাটা কি মন্দ?"

হারাণের বৌ একেবারে শিহরিয়া উঠে, চিবুকে তর্জনী স্পর্শ করিয়া বলে—"সর্বরক্ষে, গিরিদিদিমণি বলে কি গো। দু'দিনে সাঁতরা এত ভালো হয়ে গেল।...সাতু-ঠাকুর, শুনলে তো?"

এই মাত্র যে বেলে-তেজপুরের কথা হইল বিস্ময়ের ঝোঁকে সেটা সাতকড়ি একেবারে ভুলিয়া যায়, বলে—"দিদি।"

গিরিবালা কথাটা নিতান্ত শাদা মনেই বলিয়াছিলেন, একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়েন এবং অপ্রতিভ হন বলিয়াই নিজেকে সমর্থন করিবার একটা জিদ চাপিয়া যায়; প্রশ্ন করিয়া বসেন—"মিছে কি বলেছি এমন? মন্দ জায়গাটা?"

"ওমা কোথায় যাব!" বলিয়া হারাণের বৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

নীচে থেকে ডাক আসে—"শালা-বাবু কোথায় হে?"

চণ্ডীচরণের ডাক। খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে অথচ ঠাট্টার দিক দিয়া রেহাই দেয় না।

"এই এলাম"—বলিয়া সাতকড়ি নামিয়া যায়।

গিরিবালার একটু সুবিধা হয় সাতকড়ি চলিয়া যাইতে। একটু ঝাঁজিয়া ওঠেন—"অমনি হাসি ধরে না পোড়ামুখে, যেন কত অন্যায় বলেছি।"

হারাণের বৌ একবার পিছনের দিকে দেখিয়া লয়, তাহার পর দুয়ারের দিকে গলাটা আর একটু বাড়াইয়া বলে—"হ্যাগা, তাই কি বল্ল?—অন্যায় বলবে কেন? তবে একটু আবার নোকদেকানিও রাখতে হয় নতুন শ্বশুরবাড়ির সুখ্যেত একটু রেখে ঢেকেই করতে হয়, —নইলে এইতো তোমার সগ্‌গভূমি, এইখানে নাতিনাতকুড় নিয়ে, পাকা চুলে সিঁদুর পরে…"

গিরিবালা মৃদু ধমক দিয়া উঠেন—"আচ্ছা তুই থাম, খড়দার মা-গোসাই এলেন।"

"মামিমা"—বলিয়া খেতনের বৌ আসিয়া উপস্থিত হয়…

এদের কথাটা বলাই হয় নাই। বৌ-ভাতের দিন বাড়িতে নূতন দুইটি লোক আসিয়া গিরিবালার বয়স এবং গুরুত্ব হটাৎ বাড়াইয়া দিল। কয়েকজন সমবয়সীর সহিত বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, "মামিমা কোথায় গো?"—বলিয়া একটি প্রায় তাঁহার স্বামীর বয়সের যুবক আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। দলের মধ্যে যে কয়জন বৌ ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি ঘোমটা নামাইয়া দিল, দুই একজন পাড়ার ঝিউড়ি মেয়েও ছিল, বলিল—"ঐ তোমার মামিমা, খেতনদাদা।"

এই সময় মনোমোহিনী দেবীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—"উঠে আয় বৌ, প্রণাম করুক; এই আমার ছেলে খেতন।…আয় উঠে। দেখো। মামি হ'য়ে কোথায় জোর করে প্রণাম আদায় করবে তা নয়, আরও কুঁকড়ে মুকড়ে বসে রইল!"

কতকটা ভয়ে ভয়ে গিরিবালা উঠিয়া আসিলেন। "এখন বড়

তাড়াতাড়ি, কিন্তু ঘোমটা চলবে না মামিমা, তা বলে রাখছি”—বলিয়া খেতন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে মনোমোহিনী দেবী পিছনে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন—“এবার তুমি এসো বৌমা।”

দুয়ারের পাশে একটি অবগুণ্ঠিতা বধূ দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—“দেখো হেলো-চাষার মেয়ের কাণ্ড! দাঁড়িয়ে রইলে, মামিশাশুড়ীকে প্রণাম করো।… এই তোর ছেলে-বৌ, বৌ; একটু দেখবি শুনবি, আমার তো মরবার ফুরসৎ থাকে না। দেখবি শুনবি একটু, বড় অভাগা ওরা….”

শেষের কথা কয়টিতে হঠাৎ গলাটা ধরিয়া যাওয়ায় মুখটা ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন।

অতবড় একটা ছেলের মুখে মা-ডাক শোনায় অত সঙ্কোচের মধ্যেও একটা অদ্ভুত ধরণের ভাব একটা আভাষের আকারে গিরিবালার মনটাকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। মনোমোহিনী দেবী যখন ‘এই তোর ছেলে বৌ’—বলিয়া তাঁহাদের ভারার্পণ করিলেন, সেই অনুভূতিটি গাঢ়তর হইয়া ফিরিয়া আসিল যেন। অবশ্য প্রণামের পর গিন্নি-বান্নিদের মতো বধূটির চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন লইতে পারিলেন না, তবে নিবিড় স্নেহে তাহার মাথাটি বুকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। সঙ্গিনীদেব বলিলেন—“তোমরা ততক্ষণ সাজো ভাই, আমি জামাটামা ছাড়িয়ে আনি বৌমাকে।” বধূকে ডাক দিলেন “এস বৌমা।”

সঙ্গিনীদের মধ্যে একজন বলিল—“ওমা, তুমি যে সত্যসত্য শাশুড়ী হয়ে বৌয়ের যত্ন-আত্যি করতে লেগে গেলে গো!”

সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতে গিরিবালা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং আরও সেই জন্যই ফিরিতে পারিলেন না; বধূকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

খেতন বিপিনবিহারীর চেয়ে বছর দু'একের ছোট, তবুও যে তাহার বিবাহ হইয়া গেছে তাহার কারণ তিনি এবাড়ির ছেলে নয়, ভাগ্নে। তিনি মনোমোহিনী দেবীরও পুত্র নয়, তাঁহার বড় বোন হরমোহিনী দেবীর পুত্র। হরমোহিনী ছেলেকে তিন মাসের রাখিয়া মারা যান। অত ছোট শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিয়া মনোমোহিনী দেবীরও আর মনে পড়ে না যে তিনি মাসি মাত্র, খেতনও ভাবিবার ফুরসৎ পান না যে উনি মা নয়। তাহার উপর বিধাতা মনোমোহিনীকে নিজের সন্তান দিলেন না—অর্থাৎ এমন কেহ আসিল না যে মাসি-বোনপোর এই ভ্রান্তিটিকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নয় পরের সন্তান পাওয়ায় যে একটি অভিনবত্ব আছে তাহার সহিত নিজের সন্তান না-পাওয়ার বেদনাটা মিশিয়া অনধিকারের মাতৃত্বকে করিয়া তুলিল আরও নিবিড়।

এদিককার ইতিহাস এই যে ভগবতীচরণের পুত্রসন্তান না থাকায় বিবাহের কয়েক বৎসর পর হইতেই মনোমোহিনী দেবী স্থায়ীভাবে পিতৃগৃহেই আছেন। স্বামী টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তিনিও একদিন ছাড়িয়া ছুড়িয়া চলিয়া আসিলেন ও ঘরজামাই হইয়া সাঁতরাতেই কায়েমী হইয়া রহিলেন। অকর্মণ্য গোছের মানুষটি, তর্ক লইয়াছিলেন, সেটুকু পর্যন্ত বাদ পড়ায় যেন জড়ভরত হইয়া শ্বশুরবাড়ীর নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

খেতন বাড়ীতে থাকিয়াই কাকার কাছে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন, যেন সম্বন্ধের স্বাভাবিকত্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্য;—তিনি তো ওঁদেরই। এই সূত্র ধরিয়াই বিবাহও হইল ঐ পরিবারেরই ক্রমপর্যায়ে নহিলে ছোট খুড়তুত ভাইয়ের পথ বন্ধ থাকে। কিন্তু খেতনের জীবনে অস্বাভাবিকই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল—নিজের বাড়ির প্রবাস

অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার সেই সাঁতরা, এবার থেকে নিজের করিয়া লইয়াই। এই ব্যবস্থাই পাকা হইয়া গেছে।

"খেতন আসবে···খেতন বৌভাতের দিন আসবে····" এই গোছের কথা একআধবার শুনিয়াছিলেন গিরিবালা; কিন্তু স্বভাবটা খুব অনুসন্ধিৎসু নয় বলিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই, এমন তো উৎসব উপলক্ষে কত আত্মীয়-কুটুম্ব যাওয়া আসা করিতেছে।

অতবড় খেতন পরিবার লইয়া আসিয়া তাঁহাকে যে শুধু বিস্মিত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল এইটুকুই নয়,—বাবা-জেঠাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেই অকাল মাতৃত্ব যে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকেও যেন ডাক দিয়া জাগাইয়া তুলিল। বধূটি তাঁহার চেয়েও ছেলেমানুষ, বছর-দশে বিবাহ হইয়াছিল, এখন এগার,—মাস দুই তিন বেশি হইবে, দিব্য ফুটফুটেটি কিন্তু রুগ্ন, অসুখে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল।—অর্থাৎ বয়সে এবং স্বাস্থ্যে এমন যে শুধু করুণাই জাগায় না, নাড়াচাড়া করিতেও কোন অসুবিধা হয় না। গিরিবালা বেশ অনায়াসে এবং খুব তৎপরতার সহিতই শাশুড়ি হইয়া বসিলেন। খোওয়ান, মোছান, সাজান, দুটো মিষ্টি কথা বলা, প্রয়োজন হইলে একটু ধমকও,—ওঁর সেই খেলাঘরের স্বর্গটাই অনুরূপ ধরিয়া যেন আবার ফিরিয়া আসিল।

এইবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আসা যাক্।—

"মামিমা" বলিয়া খেতনের বৌ আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালাকে জড়াইয়া ধরিয়া কতকটা আব্দারের সুরেই বলিল—

"আমিও যাব।"

গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় গো!"

"কথকতা শুনতে। মা বলছেন—বুঝবনা সুঝবনা মিছিমিছি

ভিড়ের মধ্যে গিয়ে কি হবে? দুর্বল শরীর....আমি কিন্তু খুব বুঝব।"

চৌধুরী পাড়ায় গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কথকতা হইতেছে;—কাজ থেকে ফুরসৎ হইয়াছে, আজ এ বাড়ির মেয়েরা যাইবে; মনোমোহিনী গিরিবালাকে লইয়া যাইবেন বলিয়াছেন। গিরিবালা রীতিমত একজন মামি-শাশুড়ির মতোই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন,—"না হয় ধরে নিলুম বুঝবে; কিন্তু শরীরটা তো দুর্বলই তোমার বৌমা; চলে তোমার অত লোকের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ব'সে থাকা?"

বধূ আরও আব্দার ধরিল—"খুব চলে আমার অভ্যেস আছে। তুমি একবার বলো মামিমা, তুমি বললেই হবে।"

"না হয় বুঝলাম—হবে; কিন্তু আক্কেল খুয়ে বলব কি ক'রে মা? রোগা মানুষ "

"আমার তো আজ পাঁচদিন জ্বর নেই।"

গিরিবালা এবার হারাণের বৌকে সাক্ষী মানিলেন—বলিলেন "শুনলি বামীর মা? পাঁচটা দিন জ্বর নেই বলে উনি আর রোগা হলেন না! এদিকে হাড়-ক'খানা একটি একটি ক'রে গোনা যায়! তুই-ই বল্..."

হারাণের বৌ আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসির মধ্যে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল—"ওমা, একলা কত হাসব! দু'জনেই কনে' বৌ, কে কাকে নিয়ে যায় ঠিক নেই,—কি শাশুড়িগিরির ছিষ্টি গিরিদিদিমণির! কী মুখের ভাব, কথারই বা কি যে বাঁধুনি!—বসে বসে ত্যাখন থেকে তাই দেখছি। আমার তো আর তর-সইছে না বাপু, কবে যাব বেলে-তেজপুর, গিয়ে গিরিদিদিমণির গিন্নিপনার কথা শোনাব সবাইকে..."

অপ্রতিভ হইয়া গিরিবালা রাগিয়া উঠিলেন বলিলেন—"তুই এক্ষুনি যা পোড়ারমুখী, বেরো। কাজ নেই কম্ম নেই শুধু ব'সে ব'সে গেলা আর পরের ব্যাখ্যানা করা। যা বেরো। এবারে গিয়ে হাবাণকে বলে যদি তোকে ঝাঁটা না খাওয়াই তো...."

রাগিয়া যাওয়ায় হারাণের বৌয়ের হাসি আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। মুখে আঁচল ঠুসিয়া দিয়াছিল, আঁচলটা একবার একটু বাহির করিয়া বলিল—"তার নিজের পিঠে কুলো বেঁধে আসতে ব'লো...."

স্বামীভক্তির বিস্ময়কর নমুনা দেখিয়া এরা দুজনে অবাক হইয়া চাহিতেই হারাণের বৌ আবার মুখে আঁচল দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

৭

ভগবতীচরণের 'দিন' দেখিতে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। ভিতরের তাঁহার রুক্ষ জীবনটা একদিকে পুত্রবধূ, একদিকে নাতবৌ—দু'জনে মিলিয়া স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই সুমিষ্ট সমাবেশটি তিনি ভাঙিতে পারিতেছেন না, গিরিবালাকে আরও কয়দিন থাকিয়া যাইতে হইল। এদিকে যেমন ধরিয়া রাখিলেন, অন্য দিক দিয়া—মুক্তিও দিলেন খানিকটা। মনোমোহিনী দেবীকে বলিয়া দিলেন—"বৌমাকে আর নাতবৌকে মাঝে মাঝে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে আনিস মোস্ত, কনেবৌ—কনেবৌ'—করে' অত আবদ্ধ ক'রে রাখবার কোন দরকার দেখি না; ছেলেমানুষ হাঁপিয়ে উঠবে যে!"

ছেলেমানুষের পা, চলার জন্যে চুলকায়ই, তায় এই আশকারাটুকু পাইয়া দু'জনে সমস্ত দিন কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে আবিষ্কার

করিতে ব্যস্ত থাকেন। চর হইয়াছে চণ্ডীচরণ, তাহার সহায়ক সাতকড়ি, খবর আনিয়া হাজির করে।—সাতকড়ি আবার পাড়াগাঁয়ের ছেলে, দূতবৃত্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

পূজায় বসিবার পূর্বেও ভগবতীচরণের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা হয়; তবে প্রশস্ত সময় হইতেছে দুপুরবেলা।

আহারাদি সারিয়া ভগবতীচরণ শয্যাআশ্রয় করিয়াছেন, দুই বধূতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—

গিরিবালা শয্যার একপাশে বসিয়া পা দুইটি কোলে তুলিয়া লইলেন। নাতবৌ বলিল—"তুমি দুটো পা-ই দখল করে নিলে মামিমা; আমি কি করব ?···বেশ, আমি পাকাচুল তুলি দাদুর।"

ভগবতীচরণ হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ সেই ঠিক; পাকাচুলে খেতুর পাশে টেক্কা দিয়ে দাঁড়াতে পারব কেন ?"

বিদ্রূপটিতে দুই বধূতে অলক্ষ্যে একটু হাসির বিনিময় হইল; তাহার পর আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি; অর্থাৎ আসল কথাটা কে পাড়িবে। বেশির ভাগ গিরিবালাই পাড়েন। পা টিপিতে টিপিতে বলিলেন—"আজ নাকি কথকতার শেষ দিন জেঠামশাই ?"

কিসের উপক্রমণিকা ভগবতীচরণ সেটা বেশ বুঝেন, তবু কি রকম চতুরালির আকারে আসল কথাটি আনিয়া ফেলা হয় সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য বলিলেন—"খোঁজ রাখিনি তো মা।"

একটু চুপচাপ গেল। গিরিবালা একটু ভাবিলেন, চণ্ডীচরণের নামটা করিতে চান না। খেতনের বৌকে প্রশ্ন করিলেন—"কে যেন এই রকম বলছিল না গা বৌমা ? তুমি শোন নি ?"

বধূ মুখের পানে একবার চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া উত্তর দিল—"শুনছিলাম যেন; তবে হাতে কাজ ছিল, অত কান দিই নি।"

চতুরালির সূক্ষ্মতায় ভগবতীচরণের বুকের মধ্যে একটি হাসি গুরগুর করিয়া উঠিতেছে, আত্মসম্বরণ করিয়া নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিলেন—"বাঁচা গেল, শেষ হ'ল, যেন বিরক্তি লাগিয়ে দিয়েছিল।"

দুই বধূতে আবার অলক্ষ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হইল, দৃষ্টি একটু নিষ্প্রভ। একটু পরে গিরিবালা বলিলেন—"বাঁচা গেল তো নিশ্চয়ই, সন্ধ্যেটি হ'ল কি চীৎকার আরম্ভ,—কান যেন ঝালাপালা বাপু।"

একটু পরে বলিলেন—"আর কিছু নয়, শেষটা শোনা হ'ল না. আধকপালে না ধরে; পরশু আমাদের না গেলেই ছিল ভালো। ঠাকুরঝি বললেন—'না', বলতেও পারলাম না, গুরুজন তো?"

খেতনের বৌ বলিল—"আমার তো আরম্ভই হয়ে গেছে কপাল-টিপটিপিনি; তাই ভাবছিলাম, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এরকম..."

গিরিবালা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বধূর পানে চাহিলেন—অর্থাৎ; চুপ করো তুমি বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে।

ভগবতীচরণ আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, সজোরেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"নাতবৌ, তোর হাতটা একটু সরা; পাকা চুল তুলবি কি, তোর তাবিজের পুঁটেটা গলায় লেগে সুড়সুড়ি লাগছে।"

গিরিবালাকে বলিলেন—"তাহ'লে আজও একবার যাবে না কি?—তা যেও, মোনুকে বলে দোব। নাতবৌয়েরও গেলে ভাল হতো কিন্তু...'

খেতনের বৌ একেবারে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, আর চাতুরির ধারেও না গিয়া সোজাসুজি আব্দার ধরিয়া বলিল—"যাব দাদু আমিও, কেন যাব না? বাঃ!"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"তুই যে এই নিজেই বললি মাথা টিপ-টিপ করছে? কি গো বৌমা, বললে না?"

পিঠের উপর দিয়া আবার শুষ্ক মুখে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিলেন। গিরিবালা ঠোঁট দুইটি একটু কুঞ্চিত করিলেন—অর্থাৎ, তুমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল বসালে যে!

মেয়েটি একে বয়সে একটু বেশি ছোট, তায় অজ পাড়াগাঁয়ের. একটু চুপ করিয়া বলিল—"তুমি ওষুধ চেন না দাদু, শুনলে—অদ্ধেক শুনেই এই আধকপালেটা ধরেছে আমার, পুরোটা না শুনলে কখনও সারে?"

দুইবার কথকতা শোনা হইল। একদিন লাহিড়িদের বাড়িতে কীর্তন; একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া শীতলা ঠাকুরও দেখা হইল।

যেদিন শীতলাতলায় গেলেন, মনটা একটা ব্যাপারে বড় নাড়া খাইল। মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি রাস্তাটা রেল লাইনের উপর দিয়া আসিয়াছে, একটা ফটক আছে। একটা মালগাড়ি আসিতেছিল বলিয়া ফটকটা বন্ধ ছিল, গিরিবালাদের দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একবার পিছনে নজর পড়িতে দেখেন হাতদশেক দূরে একটি স্ত্রীলোক মাঝরাস্তার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া সামনে গিয়া যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। হাতে একটা কাঠি ছিল, তাহা দিয়া ভূমিতে একটা দাগ কাটিয়া স্ত্রীলোকটি তখনই উঠিয়া দাড়াইল। ভিজা কাপড়, ভিজা এলো চুল, কপালে নাকে-মুখে, কাপড়ে রাস্তার ধূলা লাগিয়া লালচে কাদা হইয়া গেছে; বয়স গিরিবালার হিসাবে মনে হইল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া যে দাগটি কাটিয়াছিল তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে রাস্তার উপর সেইভাবে হস্ত প্রসারিত করিয়া সটান শুইয়া পড়িল। গিরিবালার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল; একবার মনে হইল পাগল; কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে কয়েকটা মুখের পানে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর কাহারও মুখে কোন

কৌতূহল বা বিস্ময়ের ভাব নাই, শুধু যাহারা নেহাৎ সামনাসামনি পড়িল তাহারা পথ ছাড়িয়া একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটি বার-কয়েক ঐ রকম করিয়া ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মালগাড়ি আসিয়া ঢকাং ঢকাং করিয়া মন্থরগতিতে ফটকটা অতিক্রম করিয়া গেল। ফটক খুলিল, দুইদিকের অবরুদ্ধ জনতা লাইন পার হইল। ওপারে গিয়া গিরিবালা একবার ঘুরিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটি তখন লাইনের উপর শুইয়া আছে। মনোমোহিনী দেবীর হাতে একটা মৃদু টান দিয়া ফিস্ ফিস করিয়া ডাকিলেন—"ঠাকুরঝি!"

উত্তর হইল—"কি?"

"ও বুড়িটা ওরকম করছে কেন? পেছনে চেয়ে দেখো না।"

মনোমোহিনী দেবী একবার ঘুরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"দণ্ডী কাটছে।"

গিরিবালার যেন মনে হইল কথাটা কোথাও শুনিয়া থাকিবেন, স্বরূপটা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় লাগিল। নিজের মনেই কথাটা একটু তোলপাড় করিয়া একটু পরে আবার প্রশ্ন করিলেন—"কেন ঠাকুরঝি?"

"মানৎ আছে বোধ হয় ছেলেটেলের জন্য।"

উত্তরে এ সংক্ষিপ্ততা দেখিয়া গিরিবালা আর প্রশ্ন করিলেন না ক'নে বৌয়ের যে রাস্তায় বাচালতা করিতে নাই ঠাকুরঝি একথা পূর্বে কয়েকবার বলিয়া দিয়াছেন।

মনোমোহিনী শীতলাতলায় দেবী-দর্শন করিয়া পূজার জন্য চিনি সন্দেশ, ডাব আর ফুল পুরুতের পাশে রাখিয়া দিলেন, তাহার পর বাহিরে বারান্দায় আসিয়া জপে বসিলেন।

আজ কি একটা তিথি-যোগ আছে, বেশ ভিড় হইয়াছে। বয়স্থা এবং কয়েকজন অল্পবয়সী বিধবা, যাহারা জপে বসিয়াছে তাহারা

একটু আলাদা হইয়া মন্দিরের দুয়ার ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। আর সবাই একটু দূরে। ইহারাও পূজা দিতে আসিয়াছে, কাহারও বলিদান মানসিক করা আছে, কেহ শাদা-পূজা দিয়া আরতি দেখিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে যে মাত্র পূজাসংক্রান্ত কথাবার্তা হইতেছে এমন নয়। মনোমোহিনীর নির্দেশে গিরিবালা ইহাদেরই এক পাশটিতে গিয়া বসিলেন।

একজন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল গিরিবালার। বয়স খুব বেশী নয়, বেশ মোটাসোঁটা, টকটকে রং, খুব দামী একটা বেনারসী শাড়ি পরা, গায়ে এক-গা গহনা। সঙ্গে একটি বছর দু'য়েকের ছেলে, সায়েবের ছেলেদের পোষাক পরা। রং, মুখশ্রী কতকটা মায়েরই মতন। একটু দুরন্ত ছেলে, এর পিঠের উপর দিয়া, ওর কোল মাড়াইয়া, কাহারও খোঁপা টানিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মা উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দু'একবার চাপা স্বরে—"ঝি ঝি!" করিয়া ডাকিল, উত্তর না পাইয়া সেই ভাবেই ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিল—"বোস্ এসে নৈলে আস্ত পুতে ফেলব উঠে।"

সমস্ত দলটা যেন শিহরিয়া উঠিল, গিরিবালার বুকটাও ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

কয়েকজন মৃদু ভৎর্সনাও করিল—"ষাট্ ষাট্ ··বালাই····ওরকম ক'রে বলে মা?···এই মন্দিরে বসে!"

বর্ষীয়াদের মধ্যে কয়েকজন একটু রুক্ষ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল। মেয়েটি কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। ছেলেটির কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, ঘুরিতে ঘুরিতে একবার গিরিবালার পাশে আসিয়া হঠাৎ তাহার ঘোমটাটুকু দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া মুখটা ঝুঁকাইয়া বলিল—"বৌমা।"

ছেলেটিকে কোলে লইবার জন্য গিরিবালার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, হাতের এত কাছে পাইয়া, তাহার হাতটা ধরিয়া কোলে টানিবেন, "কৈ খোকাবাবু?"—বলিয়া একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া বারান্দার বাহিরে দাঁড়াইল। বেশ ভালো কাপড় গহনাগাটি পরা, ঝি বলিয়া চেনা যায় না।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়া উঠিল—"চল্ তুই বাড়ি আজ, থাকিস কোথায়? আমি ঐ হতভাগা আপোদকে সামলাবো, না পুজোর দিকে মন দোব?"

দলের মধ্যে এবার আর বিশেষ কেহ কিছু বলিল না, যেন সবই গুম্ হইয়া গেছে। একজন শুধু যেন সহ্য করিতে না পারিয়াই উঠিয়া পড়িল, বাহিরে যাইতে যাইতে বহিল—"বললে আবার বাড়ায়।" মেয়েটি কোন উত্তরই দিল না। ঝি ছেলেটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

এই সময় রাস্তার সেই দণ্ডীকাটা স্ত্রীলোকটি বাহিরের রকে আসিয়া সেইভাবে শুইয়া পড়িল। এবার একটু বেশিক্ষণ রহিল। তাহার পর উঠিয়া একটু গলাটা তুলিয়া পাশের ভিড়ের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"কৈ গো?"

একটি প্রায় গিরিবালার বয়সের মেয়ে একটা বছর সাত-আটের ছেলেকে সঙ্গে করিয়া পাশটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটার হাতে একটা ছোট খুরিতে চিনি; সন্দেশ আর গোটাকতক ফুল, মেয়েটার ডান হাতে একটা ডাব, বাঁ হাতে ছেলেটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই গিরিবালার কৌতূহল জাগাইয়াছিল, ছেলেটি'ক দেখিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এত রোগা যে মনে হয় যেন হাড়-কখানা শুধু চামড়া দিয়া ঢাকা, সমস্ত শরীরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে, আর তাহার উপর গাঢ়তর কালিতে থোবা-থোবা বসন্তের দাগ। মাথার অবস্থাও ঐরকম, চুল নাই বলিলেই চলে।"

দুইজনেরই কাপড় জীর্ণ, তবে বোধ হয় দেবস্থানে আসার জন্য ধার দেওয়া।

এত দ্রষ্টব্য যে সেই সাহেবী পোষাকপরা শিশুটিও কোথা থেকে আসিয়া একটু মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। ঝি আসিয়া আবার তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেল।....

ইহারা তিনজনে বারান্দায় একটি থাম ঘেঁষিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

গিরিবালা অপলকনেত্রে সব দেখিতেছেন। স্ত্রীলোকটি কি এক অদ্ভুত রকম করুণ দৃষ্টিতে ছেলেটির পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া মাথায় হাতটা বুলাইয়া দিয়া ভিতরে দেবী প্রতিমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর উভয়ের নিকট হইতে পূজার সম্ভারগুলি লইল। তিনজনে একটু আগাইয়া আসিয়া বারান্দার থাম ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাতরভাবে যাত্রীদের দু'একজনকে কি বলিল, গিরিবালা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার পাশেই একটি মেয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল—"দিক না কেউ একবার কাউকে ডেকে বাপু, পুজোটা এসে নিয়ে যাক।"

ও-পাশের একটি মেয়ে প্রশ্ন করিল—"কি জাত ওরা?"

"কৈবর্ত; মন্দিরে তো ঢুকবে না।"

একটু চুপচাপ গেল, তাহার পরও পাশের মেয়েটি ছেলেটির পানে চাহিয়া চাহিয়া কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল—"কি করে বাঁচল ছেলেটা!"

গিরিবালার পাশের মেয়েটি উত্তর করিল—"বাঁচল—মায়ের...."

ঐসময় আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠায় সবাই দাঁড়াইয়া পড়িল।

সামান্য দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আদিও জানা নাই, পরিণামে কি হইল তাহাও জানিতে পারিলেন না, তবু এই দুইটি সমস্ত দিনটা গিরিবালার মনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দুইটি শিশুই থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল—একটি রুগ্ন কদর্যতায়, প্রাণহীন শান্ত করুণ দৃষ্টিতে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের মা,—কোন দিক দিয়াই মিল নাই। গিরিবালার কেবলই মনে হইতেছিল বর্ষীয়সী জননীটির কথা। এতদিন যত মা দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে তাহাকে বড় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল,—মায়ে এতও করে? গিরিবালার শুধু জানা ছিল মা হইলে কতকগুলা ব্রত করিতে হয়; এ যাহা দেখিলেন, তাঁহার কল্পনাতীত। সমস্ত দিন কাজের মধ্যে মধ্যে যখনই মনে পড়িয়াছে—সেই কাদামাখা শান্ত-দৃষ্টি মা,—একটুও নিজের কথা না ভাবিয়া হাজার লোকের পায়ের ধূলার উপর শুইয়া পড়িল—ঐ উঠিল—ঐ আবার শুইয়া পড়িল। এই একটা দৃশ্যই জুড়িয়া জুড়িয়া গিরিবালার যেন মনে হইল মায়ের এই বিরামহীন যাত্রা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে। তাহার নিজের কিছু নাই—আহার নাই, নিদ্রা নাই, ভালোমন্দ বিচার নাই; অনশনে অনিদ্রায়, ঐরকম কাদামাখা কাপড়ে, হাতে মুখেও কাদা, দৃষ্টি আর সব হইতে নির্লিপ্ত—শুধু অনন্তপথ ধরিয়া দণ্ডীকাটিয়া চলিয়াছে, শুধুই চলিয়াছে।....ক্রমে আর সবই মিলাইয়া—মুছিয়া গিয়া—শুধু একজন মা রহিল—আর একটিমাত্র শিশু···আর সমস্ত জগতে যেন একটিমাত্র কাজ রহিল—দেবতার চরণ উদ্দেশ করিয়া অবিরাম দণ্ডী-কাটিয়া যাওয়া।....এখন আরও মা আসিল—দুলাল বাগদীর বৌ,—ছেঁড়া কাঁথায় জড়ান শিশুকন্যাকে লইয়া রসিকলালের পায়ের কাছে লুটাইয়া দিয়া বলিল—"বাবাঠাকুর গো, ও বাঁচবে নি"।···আরও মা—গিরিবালা-দের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া কবে একদিন যে-মেয়েটি নির্বাক ইঙ্গিতে

কোলের শিশুকে দেখাইয়া একমুঠা ভিক্ষা চাহিয়াছিল, সে। সব মায়ের একই রূপ—নিজের বলিতে কিছু নাই, সন্তানের জন্য দণ্ডী, সন্তানের জন্য লজ্জাসরম ভুলিয়া সন্তানকে পরের পায়ে লুটান, সন্তানের জন্য কাতর অন্ন-ভিক্ষা। কি অব্যক্ত বেদনায় গিরিবালার সমস্ত মন যেন মথিত হইয়া উঠে।..সাজগোজ পরা ছেলেটি হঠাৎ সামনে আসিয়া পড়িল—ঘোমটা তুলিয়া বলিতেছে, "বৌমা!"—কোলের মধ্যে পাইলেন না বলিয়া এমন একটা ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে গিরিবালার মনে সেই থেকে।...আহা, ও-ও তো এদেরই মতো, ওপরেই না হয় একটা চাক-চিক্য—ভিতরে ভিতরে তো এদেরই মতো অসহায়—যেমন সব মায়ের শিশুই অসহায়।...মা ওর বোঝে না কেন? বড়লোকের বাড়িতে ওরা কি মা হইতে পারে না?

সমস্ত দিন গিরিবালার মনটা কেমন যেন ভার-ভার হইয়া রহিল।—বর্ষীয়সী জননী পূজার দ্রব্য হাতে ছেলে আর মেয়েটিকে লইয়া থামের পাশটিতে দাঁড়াইয়া আছে।...ওর পূজা শেষ পর্যন্ত পহুছিল ঠাকুরের কাছে?...গিরিবালার পাশের মেয়েটি উত্তর করিল—বাঁচলো মায়ের ..." তাহার পরেই আরতি আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় কথাটা আর শেষ করা হয় নাই।...গিরিবালার মনে একটা প্রশ্ন সেই থেকে লাগিয়া আছে—কোন মায়ের কথা বলিতে চাহিয়াছিল মেয়েটি?—ছেলেটির নিজের মায়ের, না মা-শীতলার?...সেই বড়মানুষের বৌটি নিশ্চয় যাইবার সময় মা শীতলার কাছে মাথা খুঁড়িয়া, মানৎ করিয়া গিয়াছে....ছেলের কোন অকল্যাণই হইবার ভয় নাই নিশ্চয়।...না, অকল্যাণ হইবে না, গিরি-বালার মন বলিতেছে। "সবাইকে নীরোগা রেখো মা"—বলিয়া যখন তিনি নিজে দেবীকে প্রণাম করিলেন, আর মনে হইল সাঁতরার আর বেলে-তেজপুরের সবাই আসিয়া মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাদের মধ্যে

সেই রোগা ছেলেটি আর এই ছেলেটিও ছিল—মা-শীতলা আশীর্বাদের জন্য ডাকিলেন বলিয়াই তো ?

৮

এইসব দেখাশোনার মাঝে মাঝে কয়েক জায়গায় নিমন্ত্রণও খাইয়া আসিলেন, পরিচয়টা আরও বাড়িল, ষোল দিনের দিন গিরিবালা বেলে-তেজপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

জীবনে যে পরিবর্তনটা আসিয়াছে বাপের বাড়ির মুক্তি আর প্রচুর অবসরের মধ্যে গিরিবালা সেটা আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিলেন। নিজেকে তো নিজের কাছেই অন্যরকম বোধ হইতেছে, বাড়ির সবার আর পাড়ার সবার মুখেও তাঁহাকে সম্ভাষণ করার, তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়ার ধরণটা অনেকটা বদলাইয়া গেছে, কতকটা যেন সম্ভ্রমের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।....ঘোষালগিন্নির সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রথমটা দেখিয়াই ঘোষালগিন্নি যেন বিস্মিত হইয়া গেলেন, সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"এই যে গিরি এয়েছে, কবে এলি গো ?....কাল বিকেলে ?....নাৎবৌ, গিরিকে একটা কিছু পেতে দাও তো বাছা, ওর শ্বশুরবাড়ির গপ্প শুনি ?"

বধূ একটি মাদুর লইয়া বাহিরে আসিল ; একেবারে পাতিয়া না দিয়া বলিল—"কেন, হঠাৎ কি এমন হ'য়ে এলেন ঠাকুরঝি যে আসন পেতে দিতে হবে ? দরকার পড়েছে নিজে বিছিয়ে নিয়েছেন, না হয় ভুঁয়ে বসেছেন ; আজ হঠাৎ এ অভ্যর্থনা কেন ?"

গিরিবালা তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এ গঞ্জনাই বা কেন ?—এত কি পর হয়ে গেলাম ?"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। তাহারই মধ্যে মাদুরটা টানিয়া লইয়া গিরিবালা নিজেই বিছাইয়া লইলেন। ঘোষাল-গিন্নি বলিলেন—"তা সত্যি, নিজের বাড়িতে এল,....তবু কিন্তু হয় বাছা একটু, বিয়ে হলেই যেন মনে হয় একটু আলাদা হয়ে গেল,—হয় না ? আদ্যিকাল থেকে চিরদিনই যে এই রকম হয়ে আসছে।"

বাড়িতেও কতকটা এই রকম অবস্থা। আগে প্রত্যহই জেঠা-মশাইয়ের সঙ্গে আহারে বসিতেন, যেদিন তাঁহার বেশি দেরি হইয়া যাইত সেদিন তিনি আহার করিয়া উঠিলে পাতে বসিতেন, সেদিন দুইবার খাওয়া হইত। অধিকস্থলে দেরিই হইয়া যাইত বলিয়া, পাতে বসাটাই প্রায় নিয়ম হইয়া গিয়াছিল।

আহারে বসিয়া অন্নদাচরণ ডাকিলেন—"কৈ গো গিরি, আয় বোস।"

গিরিবালা উপস্থিত হইলে বলিলেন—"একটা পিঁড়ে কি আসন নিয়ে বসবি নি ?"

আগের দিনই ঘোষালবাড়ি গিয়াছিলেন, গিরিবালা বলিলেন—"এই বেশ জেঠামশাই, কবেই বা আসন পেতে বসেছি যে...."

অন্নদাচরণ যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"তাতো বটেই, নিজের বাড়িতে কে আর সর্বদা পিঁড়ে টেনে টেনে....?....কাপড়টা ময়লা হবে তাই বলছিলাম..."

একটু পরে সোজা হইয়া বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কেমন লোক সব ওরা ?....আগে, কেমন নতুন জেঠামশাই পেলি বল।"

গিরিবালা উৎসাহের সহিত বলিলেন—"খুব চমৎকার মানুষ, জেঠামশাই আগে একটু রাগী খিটখিটে ছিলেন...."

ওইখানে নিজের নাকি একটু কৃতিত্ব আছে, গিরিবালা কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই চুপ করিয়া গেলেন।

অন্নদাচরণ বলিলেন—"ভালোই হ'ল ; পুরণ জেঠামশাইকে শীগ্‌গির ভুলতে পারবি।"

আগে এ ধরণের কথায় যে রকম অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া জবাব দিতেন, গিরিবালা সেরকম পারিলেন না, যদিও আজই নিজের ভুলটা বেশ করিয়া বুঝিতে পারিলেন—এই যে নূতন জীবনের এত বেশি করিয়া প্রশংসা করাটা ; বেশি করিয়া কষ্টও হইল। লজ্জিত হইয়া মাত্র একটু মাথা নীচু করিলেন।....গল্প হইল, এর পর উচ্ছ্বাসটা যথাসম্ভব বাদ দিয়াই গল্প করিলেন গিরিবালা—সবাই লোক এমন কিছু মন্দ নয়,—তবে জেঠশাশুড়ি একটু চাপা লোক, কম কথা কন, ব্যবহার অবশ্য মন্দ নয়।...সাঁতরার গঙ্গার ঘাটটি চমৎকার,—তাই বলিয়া কি অমন কোথাও নাই বলিতে হইবে? তবে, হ্যা, বেশ জায়গাটি।...

আর উচ্ছ্বাসের দিকে যান না গিরিবালা, তবে শ্বশুরবাড়িব যাহা কিছু সুন্দর তাহার সম্বন্ধে বলিবার জন্য একটা আবেগও জাগে ভিতরে। বলেন—"ভয় ছিল জেঠামশাই, সেখানে বুঝি সিংহবাহিনীর মতন বড় ঠাকুর-টাকুর কিছু নেই। তা দেখলাম, শেতলাঠাকুর রয়েছেন। দিব্যি মন্দির, ভাড়ার ঘর, নাটমঞ্চ ; তা বলে কি বলতে হবে সিংহবাহিনীতলার মতন? তা নয়, তবু...."

আহার শেষ হইল। আগে অন্নদাচরণের পাতে কিছু কিছু থাকিত, আবার কিছু কিছু চাহিয়াও লইতেন গিরিবালার জন্য। কিরকম অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন, পাতে বিশেষ কিছু তো রহিলই না, যখন চৈতন্য

হইল, তখন চাহিতে গিয়া মুখে যেন আটকাইয়া গেল। চকিতে একবার পরিবর্তিতা কন্যার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

পরের দিনও এইরকম গল্প চলিল। আহার যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বসন্তকুমারী বলিলেন—"ওগো, গিরির দুঃখু যে তোমার পাতে…"

গিরিবালা জেঠাইমার পানে ফিরিয়া চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"যাও, কখন বললাম ?"…

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটিয়াই রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

বসন্তকুমারী নিজেই দু'টি কলা আরও খানিকটা দুধ লইয়া আসিলেন, বলিলেন—"তোমরা মনে কর, বিয়ে হলেই মেয়ে বড় হয়ে গেল, পর হয়ে গেল, সে আর পাতে খাবার যুগ্যি রইল না, কত কি ; তা কখনও হয় গা ?"

"আর ক'দিনই বা খাবে ?" বলিয়া অন্নদাচরণ বাকি দ্রব্যগুলি মাত্র একপ্রকার স্পর্শ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কপালের ঘাম ঝাড়িবার সময় বসন্তকুমারীর মনে হইল যেন একবার চোখের উপরও আঙুল ক'টা বুলাইয়া লইলেন।

বেলে তেজপুরে থাকিবার দিন গোণাগুনতি, তাহারই মধ্যে গিরিবালা দেখাশুনার পাট যতটা সম্ভব সারিয়া লইলেন। নেহাৎ আটক না পড়িয়া গেলে বসন্তকুমারী সঙ্গে থাকেন। গিরিবালারও একলা যাইতে কিরকম বোধ হয়, বসন্তকুমারীরও সাধ নূতন শ্রীতে দেওর-ঝিকে দেখাইয়া ফিরেন একটু। এভিন্ন প্রায় প্রতিদিনই নিমন্ত্রণের হিড়িক লাগিয়াই রহিল—কন্যা, জামাতা, উভয়েরই। এমন কি একদিন নিকুঞ্জলালের বাড়িও নিমন্ত্রণ হইল। দামিনী আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, বলিলেন—"দাদাকে আজ জেলায় যেতে হল,

বৌয়েরও শরীরটা খারাপ—ওতো লেগেই আছে, কবে যে ভালো থেকে উবগার করলেন—ভেবেছিলাম দুদিন পরেই খাওয়াব, তা শুনছি ধুলো-পায়েই নাকি জামাই নিয়ে যাবেন গিরিকে ?”

খোঁচা না দিলে দামিনীই নয় ; খোঁচাটুকু বরং আরও তীক্ষ্ণ করিয়া দিলেন, একটু ঠোঁটটা কুঁচকাইয়া বলিলেন—“বাবাজী আমাদের পশ্চিমে পালোয়ান, বারণ ক'রে বলতেও বোধ হয় কারুর সাহস হয় না।”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“সেই জন্যেই তো বড়্ঠাকুর একটি বুড়ো-সুড়ো গোবর-গণেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন, উঠতে বললে উঠত, ব'সতে ব'ললে ব'সত। ওঁরা জ্ঞানী বিচক্ষণ লোক, অনেক দেখছেন তো ?”

আরও একটু খোঁচা দিলেন,—“আব তোমাদের বাড়িতে খাবে, তাই নাকি আবার নেমন্তন্ন !—গিরিবালা দুই জেঠাকে কখনও আলাদা ভাবতে শেখেনি,—সুবিধে মতন আব্দার করে কেড়েকুড়ে খেয়ে আসত।...ভালোবাসতেন বলেই তো, বড়্ঠাকুর ভালো ঘরে দেবার জোগাড় করেছিলেন গা।”

একদিন নিমন্ত্রণ হইল পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে। গিরিবালা যেদিন আসিলেন তাহার তৃতীয় দিনে।

যেদিন আসিলেন তাহার পর দিন সকাল থেকেই জোর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খুব জোর বৃষ্টি,—পথ চলাব কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সমস্ত গ্রামখানি যেন গৃহাশ্রয়ী হইয়া বসিয়া রহিল। পণ্ডিতমশাই কয়েকবার দাওয়ায় আসিয়া নীচু হইয়া সমস্ত আকাশটা দেখিলেন, বৃষ্টি ধরণের কোনই লক্ষণ না দেখিয়া বাঁশের ছাতাটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ছাতায় ধারাপাতের শব্দ হইতেই সামনের ঘর হইতে গৃহিণী বাহির

হইলেন। পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"এই এখুনি আসছি একটু এখান থেকে।"

গৃহিণী নিজের মনেই গর গর করিতে লাগিলেন—'এখুনি আসছি!'…"চললেন এই বৃষ্টি মাথায় করে রসিকের জামাই দেখতে।… সে তো পালিয়ে যাচ্ছে না।"

যখন পৌঁছিলেন তখন বৃষ্টির ছাটে বেশ খানিকটা ভিজিয়া গেছেন। বাহিরের ঘরে দাওয়ায় উঠিয়া রসিকলালকে ডাক দিলেন। বৃষ্টির আওয়াজের জন্য তিন চারিবার ডাকিতে হইল। তাহার পর উত্তর হইল—"কে? দাঁড়াও আসছি।"

পণ্ডিতমশাইয়ের বুকটা দমিয়া গেল। অন্নদাচরণের আওয়াজ। রসিকলালের কাব্যচর্চায় ইন্ধন জোগান বলিয়া এ বাড়ির লোকে, বিশেষ করিয়া অন্নদাচরণ যে তাঁহাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখে না এটা পণ্ডিত-মশাইয়ের জানা। তিনি আসেনও না কখন এখানে, আজ আকাশের বারিপাতের মতোই কি একটা আবেগে সব ভুলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কেমন অহেতুক ভাবেই মনে হইয়াছিল গিয়া—রসিকলালের সহিত দেখা হইবে, অন্নদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনাটাই মনে হয় নাই। কী যে করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

ছাতা মাথায় দিয়া ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে অন্নদাচরণ বাহিরে আসিলেন। নীচে থেকেই দেখিয়া বিস্মিতভাবে ক্ষণমাত্র থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া ঘুরিয়া দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই, আপনি!"

পণ্ডিতমশাই সঙ্কুচিতভাবে স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন—"এই একবার ইয়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম—হঠাৎ হুড়-হুড় করে বর্ষাটা নামল—তাই পথ ছেড়ে উঠে পড়লাম।"

অন্নদাচরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—"আমার সৌভাগ্যি ; হঠাৎ যে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে আজ !...দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে চলুন—ছাট আসছে বৃষ্টির..."

এরকম প্রাণখোলা অভ্যর্থনা আশা করেন নাই ; পণ্ডিতমশাই একটু বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবু রহস্যপ্রবণ পণ্ডিত লোক, একটু হাসিয়া বলিলেন—"পায়ের ধুলোর কথা বললে অন্নদাচরণ, কিন্তু রয়েছে কাদা ; থাক !"

অন্নদাচরণ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"কাদা তো আরও বড় সম্পদ পণ্ডিতমশাই, কায়েমী হয়ে থাকবে।...না, সে কি হয় ? ভেতরে চলুন। আর কাপড়টাও ছেড়ে ফেলুন। দাঁড়ান...."

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতুকে একবার ডাকিলেন, উত্তর না পাইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়া একখানি বস্ত্র লইয়া আসিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে রসিকলালও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"এ দুর্যোগে বেরিয়ে আপনি বড় ভুল করেছেন। আমাদের অবশ্য লাভই, তবে..."

পণ্ডিতমশাই কাপড় ছাড়িলে সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। দুই ভাইয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়া গেছেন, রসিকলাল একেবারে নীরব, শুধু মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্নদাচরণ বলিয়া চলিয়াছেন—"আপনার আশীর্বাদে আমরা যে কী ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি জানেনই। শুধু একটা দুঃখু থেকে গেল আপনার নাতনির বিয়েতে আপনাকে পাওয়া গেল না, অথচ আপনিই সব ঠিক করলেন। আমি কিন্তু গিয়েছিলাম পণ্ডিতমশাই, নিজে গিয়েছিলাম আমি আপনার বাড়িতে, গিয়ে শুনলাম, আপনি দু'দিন আগে বাইরে চলে গেছেন। আমার যে কী মনে হ'ল—কোন উপায়ও নেই শুভ কাজ পেছিয়ে দেওয়ার...."

আর তখন মাথারই কি ঠিক আছে ?....সব শুনেছেন তো ? যাই হোক, শুভ কাজটা ভালোয় ভালোয়....তা সম্পূর্ণ যে ভালোয় ভালোয় তাই বা কি করে বলি ?"

পণ্ডিতমশাই স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন—"একেবারে সুশৃঙ্খলায় তো এ-বিবাহ হবার নয়...বলিনি তোমায় রসিক ?"

রসিকলাল মৃদুহাস্য করিলেন।

অন্নদাচরণ বলিলেন—"দেখ, দুজনেই ভুলে ব'সে আছি,—একটু তামাক চাই যে পণ্ডিতমশাইয়ের জন্যে,—তুমি নিজেই যাও রসিক। ...দেখ, ভুলের ওপর ভুল..."

পণ্ডিতমশাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার নাতনি-নাত-জামাই যে কাল এল বিকেলে।"

"সত্যি না কি ? দেখতে হবে তো, ভায়াকে দেখাই হয়নি।"

"দেখবেন বই কি, আজ সকালেই তাকে আপনার ওখানে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম, পায়ের ধুলো নেবার জন্যে, বিষ্টিটা এসে পড়ল। তা তার ভাগ্য ভালো, দেবতা নিজেই ঘর ব'য়ে এলেন।.... রসিক, অমনি বিপিনকেও ডেকে নিয়ে আসবে।"

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"তা তো হবে না, আমি দুজনকে একসঙ্গে দেখব অন্নদাচরণ, আমার অনেক দিনের সাধ যে। একটু থকক বৃষ্টিটা।"

অন্নদাচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, যেন চাওয়ার অতিরিক্ত পাইয়া যাইতেছেন। উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"বৃষ্টি এখন শীগগির ধরবে কি ? আমি নিয়ে আসছি দু'জনকে পণ্ডিতমশাই, এসে পড়লাম বলে।"

পণ্ডিতমশাই তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন, বলিলেন—'নাতজামাইকে

খানিকটা ভেজাও আপত্তি নাই, বরং খুসি হব; তবে দিদিকে আর এ দুর্যোগে বাইরে এনে কাজ নেই। বৌমাদের বলে দাও, আমি নিজেই গিয়ে দেখব।"

অন্নদাচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"আবার ভিজবেন?"

—"নাতনি-নাতজামাই না হয় একটু বেশি সরস হয়েইদেখলাম হে।"

—পণ্ডিতী প্রথায় বেশ একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন —"নাও, দেরি করো না, বলো গিয়ে।"

অন্নদাচরণ যাইবার একটু পরেই রসিক তামাক লইয়া আসিলেন। খুব বেশী কথাবার্তা হইতেছে না;—পণ্ডিতমশাই অতিরিক্ত অন্যমনস্ক, একটা মস্ত বড় সার্থকতার যেন সন্মুখীন হইতেছেন। একটু পরেই অন্নদাচরণ টোকামাথায় একটা ছাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

গিরিবালাকে বিবাহের সজ্জায় সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বেনারসী শাড়ী, সাটিনের একটা বডিস, সমস্ত গায়ে ভারী ভারী গহনা, পায়ে মল, একটা অপূর্ব শ্রী ফুটিয়াছে। বিপিন লজ্জাবশতঃ সাজিতে রাজি হন নাই রাঙা পেড়ে একটা শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া আছেন, ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত, সেকালের যুবকদের ফেশান মতো মাথায় সুবিন্যস্ত বাবরী চুল, প্রশস্ত রক্তাভ বক্ষের উপর তির্যক রেখায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত বিলম্বিত। পণ্ডিতমশাই নীচু মুখেই দাওয়ায় আসিয়া উঠিলেন, ছাতাটা মুড়িয়া চোখ তুলিতেই ওদের উপর নজর পড়িল, মুহূর্তের জন্য যেন একটা নৈরাশ্যের ছায়া মুখে খেলিয়া গেল।—অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষণিক একটা ছায়া—উনি যেন অলৌকিক কিছু একটা দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন এতক্ষণ,—মানুষ নয়, দেবদম্পতি, বোধ হয় সাক্ষাৎ হর-গৌরী হইলেও আশ্চর্য্য হইতেন না।

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কল্পলোক থেকে তাঁহার মনটা নামিয়া আসিল,

ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর অপরূপত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিবার যে সহজ শক্তি সেটুকু ফিরিয়া আসিল, মুগ্ধবিস্ময়ে পণ্ডিতমশাই দম্পতির পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। বিপিন এবং পরে গিরিবালা আসিয়া পাদস্পর্শ করিলেন, পণ্ডিত-মশাইয়েব চৈতন্য হইল। মনের পূর্ণতায় দুজনের মাথায় হাত দিয়া মনে মনেই আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর বিপিনবিহারীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া,—নাতজামাই সম্বন্ধে একটা চলতি রহস্যের ভাষা প্রয়োগ করিয়া অন্নদাচরণকে বলিলেন—"....গুমর হবে, তবুও বলতে হল এত অপরূপ যে, তা আমি আশাই করতে পারিনি।"

অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। একটু থামিয়া বলিলেন—"আমাবই ভুল। মধুসূদন বলেছিলেন—তবে নিজের ছেলের সম্বন্ধে আর কত স্পষ্ট করে বলবেন?"

বৃষ্টি ধরিতে একটু বিলম্ব হইল। অন্নদাচরণের ঘরেই বসিয়া সকলে গল্প করিলেন অনেকক্ষণ, গিরিবালা অবশ্য চলিয়া গেলেন, তবে বিপিন রহিলেন। পূর্ণতর করিয়া পরিচয় লওয়া, ওদের প্রবাসভূমির কথা—এই সব লইয়া আলোচনা চলিল। শেষে পণ্ডিতমশাই তাঁহার ওখানে নিমন্ত্রণের কথা পাড়িলেন। এই পরিবারটির সম্বন্ধে তাঁহার একটা আশঙ্কা ছিল, সেটা যে শুধু কাটিয়াই গেছে তাহাই নয়, তাহার জায়গায় একটি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব আসিয়া গেছে; মনের আকাঙ্ক্ষাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে আর পণ্ডিতমশাইয়ের বাধিল না;—ঠিক নিমন্ত্রণ নয়, কেননা মূল রাঁধুনি হইবেন গিরিবালা নিজে। ফাই-ফরমাইস খাটিয়া যোগান দিবেন তাঁহার ঠানদিদি। এবাড়ির সকলকেই যাইতে হইবে। গিরিবালা সকালেই যাইবেন, রাঁধিয়া বাড়িয়া সবাইকে খাওয়াইয়া তবে তাঁহার ছুটি। পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—

"গৌরী এবার অন্নপূর্ণা হ'ল, হাতেখড়িটা আমার ওখানেই হয়ে যাক না।....ভায়ার মুখটা যেন একটু শুকিয়ে গেল,—হাত পেতে দাঁড়াবার ভয়ে নাকি?"

উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, দুই ভাইয়েতে অল্প হাসিয়া মুখ ঘুরাইলেন। বিপিন সঙ্কুচিত হইয়াই পড়িয়াছিলেন, মৃদু হাস্যের সহিত মুখটা আরও নীচু করিয়া লইলেন।

পণ্ডিতমশাই রসিকলালকে বলিলেন—"তুমি একবার দিদিকে জিগ্যেস করে এস রসিক, নেমন্তন্ন ও আর কাউকে করতে চায় কি না। আমার শপথ রইল, যেন কোন কুণ্ঠা না করে।"

একটু দেরি হইল, রসিকলাল নিজেও আসিলেন না। হরিচরণ আসিয়া একটু উৎসাহের সহিতই বলিল—"দিদি বললে—দুলো বাগদির বাড়ির সবাইকে বললে ভালো হয়।"

সেই অর্ধভুক্ত বাগদি-পরিবার—দুলাল, তাহার বৌ, কোমরে ন্যাকড়া-জড়ান মেয়ে লক্ষ্মী, তার অর্ধ-উলঙ্গ ছোট রুগ্ন ভাইবোন...

একটুখানির জন্য যেন একইভাবের ক্ষণিক ঘোরে দুইজনেই একটু স্তব্ধ হইয়া গেলেন, তাহার পর পণ্ডিতমশাই আবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রসিক, গেলে কোথায় হে?—আর দুঃখ করো না, গৌরীদানই হয়েছে; এই দেখ না, সঙ্গে সঙ্গে ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার আরম্ভ হয়ে গেল!"

হাস্যটা ঘরের মধ্য হইতে বাহিরেও মেয়েদের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। দুয়ারের পাশেই ছিলেন রসিকলাল, হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আর নম্ভীর কথাও বললে যে গিরি; হরিচরণ বুঝি ভুলে গেলি?"

৯

পণ্ডিতমশাইয়ের ইচ্ছা ছিল পরদিনই হয়; কিন্তু তাঁহার নিজের নিমন্ত্রণটা বাকি ছিল, অন্নদাচরণ শুনিলেন না, আবার তাহার গৃহিণীকে সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া ওটা নিষ্পন্ন করাইয়া লইলেন। পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির ব্যবস্থাটা তৃতীয় দিনে।

বিপিন প্রথম পরিচয়ের পরই লোকটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেদিন বিকাল থেকে খানিকটা রাত্রি পর্যন্ত ওঁর ওখানেই কাটাইলেন। সন্ধ্যার অব্যবহিতপরেই প্রায় প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী রসিকলালও 'কল'-ফেরৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরে মাধবীলতার মঞ্চের নীচে শানের বেঞ্চে দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছেন, হারাণের হাতে ঘুড়ীর লাগামটা দিয়া রসিকলাল ভিতরে আসিতে আসিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতমশাই বলিলেন— "না, না, তোমার ফিরে যাওয়া চলবে না, এসো। বাঃ, আমার সন্ধ্যে কাটাবার জন্যে বিধাতা কি বরাবর একজনই বরাদ্দ করে দিয়েছেন নাকি? আর নাতজামাই এসে যদি আমার শিষ্যকে তাড়ায় তো ভারী উপকারই তো করলে তা'হলে।"

নিজের পদ্ধতিতে সজোরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। রসিকলাল অল্প হাসিতে হাসিতে সামনের বেঞ্চটিতে আসিয়া বসিলেন।

নিতান্ত হালকা একটা মেঘের আস্তরণ জ্যোৎস্নাটাকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। একটু গুমটভাব আছে, মাঝে মাঝে একটা হাওয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তবে খুব ক্ষীণ, যেন বহুদূরের যাত্রী, পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনজন অসম

বয়সের সঙ্গীর মধ্যে গল্প হইতেছে। ....হারাণের, মৃদঙ্গ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার থামিয়া গেল। কে আসিয়াছে, হারাণ পরিচয় দিতেছে। মৃদু হইলেও তাহার খানিকটা উচ্ছ্বাসের বেগে ভাসিয়া আসিতেছে—"...এখন হবে নি, কাল আসিস্‌, দেখিয়ে দোব।... নিয়ে আসিস্‌ তোর রায়েদের জামাইকেও ডেকে, ন্যাজ মুখে করে না ফিরে যেতে হয় তো....হরিপুরের তাদের কথা? সুতুনীর খালে তাদের খোঁজ নিগে...."মাঝে মাঝে আবার বোলও জাগিয়া উঠিতেছে।

গল্প বলিতেছেন বেশির ভাগ বিপিনই, ওঁদের প্রবাসভূমির কথা। মাঝে মাঝে একআধটা প্রশ্নে মোড় ফিরিয়া যাইতেছে। বেশির ভাগ প্রশ্নই পণ্ডিতমশায়ের। দূরের রহস্য আবার তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।..."আসল কথাই জিগ্যেস করা হয় নি। হিমালয় ওখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক বললে না? তা দেখা যায়?...তোমায় বলেছিলাম না রসিক যে জায়গাটা হবে হিমচক্রের মধ্যে?"

বিপিন বলিলেন—"হিমালয়ের নীচের পাহাড়গুলো মাইল পঞ্চাশেক দূরে, ওখান থেকে দিন তিনেকের রাস্তা; আসল হিমালয় অনেক দূর। দূর হ'লেও কিন্তু দেখা যায়। সব সময় নয়; শীতের সকালে আর বিকেলে বেশি করে চোখে পড়ে। অনেক দূরে আকাশের কোলে বরফে ঢাকা চূড়াগুলা উঁচুনিচু রেখায় দেখা যায়; কোথাও নীল, কোথাও, শাদা, আবার যেখানে সূর্যের কিরণ সামনা সামনি পড়েছে সেখানে সোনার মতন রাঙা, ঝকঝকে। সব চেয়ে সুন্দর দেখায় যদি কখনও এক আধ পশলা বৃষ্টির পর মাঝখানের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এরকমটা হ'লেই, আমরা কমলানদীর ধারে আমাদের পাহাড় দেখার উঁচু জায়গাটিতে গিয়ে জড়ো হই। মনে হয় হিমালয় যেন একেবারে পঁচিশ ত্রিশ মাইল এগিয়ে এসেছে

আমাদের দিকে—পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের ওপর পাহাড়—গোড়ার দিকে খানিকটা পর্যন্ত একটা ঢেউখেলান সবুজের রেখা এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত চলে গেছে—নীচের পাহাড়গুলো আর কি,—তারপরেই যেন একটা প্রকাণ্ড রূপোর চাপ—যেখানটা বোধ হয় খানা খন্দর, কি জঙ্গল, কি যেখানটা সূর্যের একটু আড়ালে পড়েছে সেখানটা নীল, বাকি সমস্তটা ঝকঝক করছে। এত বিরাট, এত অদ্ভুত যে চোখ ফেরান যায় না।"

পণ্ডিতমশাই বেশি আবেগের জায়গাগুলায় রসিকলালের পানে আড়চোখে চাহেন, ওঁরা উভয়ে যেন কি একটা ব্যাপার মিলাইয়া যাইতেছেন ভিতরে ভিতরে।

বিপিন বলিয়া যান—"যদি বিকেলের দিকে হ'ল তো আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকি। সূর্য একটু একটু করে রাঙা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সব চমৎকার ব্যাপার হতে থাকে, কোন চূড়ার ওপর রূপোর গায়ে বোধ হয় ঝপ করে একটা সোনার দাগ পড়ল—অল্প অল্প করে সেটা ছড়িয়ে গেল, তারপর আর একটা চূড়ায়, তারপর আর একটা···দেখতে দেখতে সমস্ত রূপোর পাহাড়টা আগাগোড়া সোনার হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, না দেখলে ধারণা করা যায় না।"····

গুরুশিষ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইতে থাকে। বিপিন হাসিয়া বলেন—"আমাদের সব চেনা হয়ে গেছে। যেটাতে প্রথম সোনার রঙের আঁচড় পড়ে, সেটার নাম দিয়েছি যক্ষপুরী, অর্থাৎ কুবেরের বাড়ি আর কি। হাজার হরগৌরীর ওপর ভক্তি থাকুক, হাজারই তাঁরা মনিব হোতে যান না কেন, নিজের বাড়ির ওপর সোনার জলটা তো আগে চড়িয়ে নেবেনই···"

বিপিন বেশ জোরেই হাসিয়া ওঠেন, এরাও যোগদান করেন, হারাণের মৃদঙ্গ বোল বন্ধ হইয়া যায়।

গুরুশিষ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন—জামাই এত উত্তেজিত তো আর কোন প্রসঙ্গেই হন না, কেন?—কারণটা কি?

বিপিন আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন, বলেন—"সব চেয়ে যেটা উঁচু হয়তো সেইটেই গৌরীশঙ্কর—সেটার নাম দেওয়া হয়েছে কৈলাস।... সন্ধ্যে যতই এগুতে থাকে আস্তে আস্তে আর একটা পরিবর্তন হতে থাকে; সোনা যেমন একটু একটু করে ফুটে উঠেছিল তেমনি একটু একটু করে মিলিয়ে আসে,—প্রথমে একটু একটু করে, তারপর একেবারে ঝপঝপ করে। সোনার নীচে রূপোও আর দেখা যায় না। সব চেয়ে উঁচু যে চুড়োগুলো তার ওপর তখনও সোনা রয়েছে, শেষ হ'তে হ'তে ক্রমে শুধু গৌরীশঙ্করের ওপরটিতে ঝলমল করতে লাগল। আমরা সবাই একদৃষ্টে চেয়ে আছি—সেকেণ্ড গুণছি—দেখছি আস্তে আস্তে চোখের সামনে রেখায় রেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর শেষ বিন্দুটুকুও মিলিয়ে গেল, অতবড় প্রকাণ্ড রূপোর চাপটা যেন একটা ছায়ার মতন আকাশের গায়ে লেগে রইল।"

তাহার পর সন্ধ্যার কথা, এবং সন্ধ্যা যখন গাঢ় হইয়া আসিল তখনকার কথা। একটা আবেগে সমস্তটা বলিয়া বিপিন একসময় চুপ করিয়া যান। একটু লজ্জিতও হইয়া পড়েন, যেন এতক্ষণে চৈতন্য হয় যে একটু ভাবের ঘোরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। শ্রোতার মধ্যে একজন যে শ্বশুর আর একজন যে বাট পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ সেটা মনে পড়িয়া যায়। একটু চুপ করিয়া থাকেন। ওরা দুজনেও চুপ করিয়াই থাকেন, যেন স্বপ্নাবিষ্ট।

পরদিন গিরিবালা সকালেই স্নান করিয়া নন্দী আর হারাণের বৌকে

সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতমশাইয়ের এ-ব্যবস্থাটা যেন খেলাচ্ছলে, অথচ এতগুলি লোককে রাঁধিয়া খাওয়ান নিতান্ত ছেলেখেলাও নয়; নূতনত্বের কৌতুকের সঙ্গে অনেকখানি দুশ্চিন্তা মিশিয়া গিয়া গিরিবালার মধ্যে বেশ খানিকটা গিন্নিপনার ভাব আনিয়া দিয়াছে। যখন পৌছিলেন তখন পণ্ডিতমশাই পূজায় বসিয়াছেন; ওঁরা তিনজনে বাড়ির ভিতর আসিলেন। একটা ছোটখাট কাজেরই বাড়ী বলিতে হইবে—সব মিলিয়া প্রায় খান কুড়িক পাত পড়িবে। কিন্তু বাড়িতে একটু সাড়াশব্দ নাই, কাহারও দেখা নাই পর্যন্ত। গিরিবালা ভীতভাবে ডাকিলেন—"ঠাকুরমা!"

গৃহিনী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; গিরিবালা ভীতভাবেই বলিলেন—"কিছুর জোগাড় দেখছি না যে ঠাকুরমা, ঝি কোথায়?...আমার তো ভয়ে যেন হাত পা আসছেনা!"

গৃহিনী তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"ছেলেমানুষকে এভাবে বিব্রত করা কেন বল দিকিন? ও-ও শ্বশুরঘর না দেখতে দেখতেই পাকা গিন্নি হয়ে গেল!....সব ঠিক আছে, তুই এসে বোস নিশ্চিন্দি হয়ে, ইটি কে? নিকুঞ্জর মেয়ে বুঝি?...এস দিদি, ব'স।...আর ইটি?"

গিরিবালা বলিলেন—"হারাণের বৌ!...আমি তো কিচ্ছু জোগাড় দেখতে পাচ্ছিনা, ঠাকুরমা! ঝি কোথায়?"

গৃহিনী হাসিয়া বলিলেন—"কি নিগ্রহ দেখ দিকিন? কোথা এসে একটু হেসে খেলে বেড়াবে, মা, তার ঘাড়ে একটা ভাবনা চাপিয়ে দেওয়া।....আয় বাপু, তুই দেখেই যা না হয়।....ঝি পুকুর পাড় থেকে ঘুঁটে আনতে গেছে, এসে উনুন ধরাবে।"

ভাঁড়ার ঘরে লইয়া গেলেন, গিরিবালা দেখিলেন শাক থেকে

অম্বলের কুটনা পর্যন্ত তৈয়ারি—বারকোস, চাঙারি করিয়া পাশে পাশে সাজান। গিরিবালা গভীর নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিলেন—"বারে, একি হ'ল!"

ওদিকের বারান্দায় পণ্ডিতমশাইয়ের খড়মের আওয়াজ হইল; প্রশ্ন করিলেন—"দিদিমণি এল?"

গিরিবালা বাহিরে আসিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন—'দিদিমণি এসেই বা কি হ'ল ঠাকুর্দা?"

"কেন?"

"কুটন টুটন সব তোয়ের।...তার চেয়ে একেবারে নেমন্তন্ন খেতে এলেই পারতুম।"

পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—"এই কথা? তা আমি সমস্ত রাত কত শাস্ত্র ঘাঁটলাম, অন্নপূর্ণা যে নিজে কুটন কুটেও নিতেন এটুকু কোন খানেই পেলাম না। তাই গিন্নিকে বললাম..."

গিরিবালা রাগের ভান করিয়া বলিলেন—"যাও, খালি ঠাট্টা!...নিজে কুটতেন না তো দিতো কে কুটে শুনি?"

"নন্দী কি ভৃঙ্গীর বৌ বোধ হয়।"—বলিয়া পণ্ডিতমশাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গৃহিণী কপট বিস্ময়ে মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—"দেখলে কলির বিচার! রাত জেগে সব ঠিকঠাক করে রাখলাম—শেষে হলাম কি না নন্দী-ভৃঙ্গীর বৌ!"

বিদ্রূপটা প্রকাশ হইয়া পড়ায় আবার একসঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। হারাণের বৌ ঘোমটাশুদ্ধ মুখটা ফিরাইয়া লইল। এমন সময় বাহিরে বিপিনের কণ্ঠ শোনা গেল—"ঠাকুর্দা!"

কাল পণ্ডিতমশাই বিপিনকেও সকাল সকাল আসিতে বলিয়াছিলেন, হিমালয়ের অত স্পষ্ট বর্ণনা ওঁর কল্পনাকেও উদ্রিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল,

ঠিক করিয়াছিলেন আজ দুইজনে একসঙ্গে "মেঘদূত" পড়িবেন। "আমাদের জলখাবারটা নিয়ে এস"—স্ত্রীকে আদেশ করিয়া পণ্ডিতমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা কাজে লাগিয়া গেলেন। গৃহিণীকে বলিলেন—"তোমার তা হলে ওই কুটন কোটাই পর্যন্ত হ'ল ঠাকুরমা; আর এদিকে ঘেঁসতে দিচ্ছি না।"

তরকারিগুলা এক একটা করিয়া বাহির করিয়া হারাণের বৌকে ধুইয়া আনিতে বলিলেন। নন্তীকে বলিলেন—"কোটা ঠিক হয়েছে কি না তুই একবার দেখে নে নন্তী, না হয়ে থাকে বঁটিটা বের করে ব'স। উনি কুটছেন বলেই আমায় মেনে নিতে হবে এমন কোন পাট্টা লিখে দিই নি।"

ঝি আসিল, এবং অচিরেই রান্নাঘরের গোলপাতার ছাউনি ভেদ করিয়া ধুঁয়ার কুণ্ডলি উপরের জামগাছটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রান্নার বাসনের ঝনঝনানি, ঝিয়ের গলা, গিরিবালার অযথা ব্যস্ত নির্দেশ, হারাণের বৌকে বকুনি সব মিলিয়া বাড়িটা অল্প সময়ের মধ্যেই কাজের বাড়ির মর্যাদায় জাগিয়া উঠিল।

একটু পরেই লঙ্কার ঝাঁজ, বৈঠকখানা পর্যন্ত সকলের হাঁচি এবং খুন্তি নাড়ার অবিশ্রান্ত শব্দের মধ্যে রন্ধন-যজ্ঞ সাড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, একটু অপেক্ষা করিয়াই আবার যোগদান করিবেন, খুন্তিটা নন্তীর হাতে দিয়া গিরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্মব্যস্ততায়, তদুপরি আগুনের তাতে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে। বলিলেন—"ঠাকুরমা, শাক ভাজাটা প্রায় শেষ হয়ে এল এইবার শুক্তটা চড়িয়ে দেব। ওটা ওদিকে হতে

থাক; আমি এদিকে চালটা বের করে দিই। কত দিই বল দিকিন ঠাকুরমা?—মোনখানেক দোব?—না আরও....

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী কপালে চোখ তুলিয়াই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"পনেরটা মানুষও খেতে হবে না, একমোন চাল? একি অন্নপূর্ণার...!"

গিরিবালা অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে হাত চাপিয়া বলিলেন—"চুপ করো ঠাকুরমা, বাইরে শুনতে পাবেন, তুমি চলো ওদিকে বরং।"

উনি ওদিকে ভাঁড়ার ঘরে চাল ডাল বাহির করিয়া দিতে গেলেন গিরিবালা রান্নাঘরে আসিয়া নন্তীকে বলিলেন—"এবার দে খন্তিটা আমায়, শাকটা ধরিয়ে ফেললি না তো?"

পিসিমা ঐ রকম, মা প্রায় অসুস্থ থাকে,—নন্তীকে মাঝে মাঝে রান্নাটা করিতে হয়, মোটামুটি একটা জ্ঞান আছে; বলিল—"শাক না কি ধরে? ওর নিজে থেকে যে জল বের হয় অনেকক্ষণ।"

এখানেও খাটো হইয়া গিরিবালা চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে ঠানদিদি সাজতে হবে না; শাকে জল বেরোয় সবাই জানে, তুই সর্।"

খন্তিটা লইয়া দুইবার ঘন ঘন নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন—"বড় যে মুড়ুলি করছিস, এতগুলো লোকের কত চাল লাগবে বল দিকিন?"

"কত জন আছে?"

"ধর্ জন পনের, কি জন কুড়ি।"

নন্তী একটু মনে মনে হিসাব করিল; বলিল—"একপো করে ধরলে ভেসে যাবে। পাঁচসেরের বেশি দরকার হবে না—যদি কুড়ি জনই হয়।"

এত বেয়ান্দাজ যে করিয়া বসিবেন, ধারণাতেই আসে না ;—"এই বুদ্ধি নিয়ে··" বলিয়া নন্তীকে বেশ একটু মিষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিতে যাইতেছিলেন, একটা বড় বারকোষে সের পাঁচেক আন্দাজ চাল লইয়া হারানের বৌ আসিয়া দাওয়ার নীচে দাঁড়াইল, বলিল—"এই দেখ গো গিরিদিদি, চাল ধুতে চল্ল ঘাটে। বলবে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে রামীর মা।"

নন্তীর উপরের ঝাঁজটা হারাণের বউয়ের উপরই মিটাইতে হইল, বলিলেন—"কী রাজ্য রক্ষে করছিস শুনি? বড় মুখ হয়েছে তোর, আসুক হারাণে।"

হারাণের বৌ বারকোষটা তুলিয়া লইল, গিরিবালার চোখের অন্তরালে গিয়া বলিল—"নন্তীদিদি, সে এলো ব'লে ভয়ে দুর্জ্জোধনের মতন পুকুরে সেঁধে বসে আছি।"

হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। নন্তী একটু হাসিয়া বলিল—"পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছে।···তুমি কি বলছ গিরিদিদি,—পাঁচসের চাল বেশি হবে।"

গিরিবালা শাকটা একটা পাত্রে তুলিলেন, তাহার পর কড়াটা আবার উনানে চাপাইয়া বলিলেন—"হবে না বেশী?—ওর মধ্যে কচি ছেলেই তো ক'জন। ভাত যদি না বাঁচে এককাঁড়ি তো···"

পণ্ডিত মশাইয়ের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—"শাক নামল, এইবার শুকতটা চড়িয়ে দিই, কি বল ঠাকুরমা?···নন্তী, ঠাকুরমাকে পিঁড়েটা দে, দোর গোড়াটায় বসুন।···মাছটা দুলোকে আনতে দিয়েছেন ঠাকুর্দা? না এসে পড়লে নিশ্চিন্দি হতে পারছি না বাপু, সে একটা আস্ত কুড়ের বাদশা···"

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা চারিদিক দিয়া যেন গম-গম করিয়া

উঠিতে লাগিল। কয়জনেরই বা ব্যবস্থা? তবুও 'দুইটি ছোট মেয়ের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা আসিয়া গিয়া সেটুকুকেই বেশ গুরুত্ব দিয়াছে। পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী সামলাইয়া দিতেছেন, কিন্তু পণ্ডিতমশাই প্রায়ই একটা না একটা ছুতা করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইতেছেন। বিপিন-বিহারী উদ্দেশ্যটা বুঝিয়া একবার হাসিয়া বলিলেন—"ওঁকে ছেড়ে দিন ঠাকুর্দা, নইলে আজ আর কিছু মুখে দেওয়া যাবে না। যা দুটি পাকা রাঁধুনির হাতে..."

পণ্ডিতমশাই উত্তর করিলেন—"না ভাই, আজ যে-জিনিসের স্বাদ আশা করে আছি তার মধ্যে পাকামির ভেজাল সেঁধুতে দোব না। ঝরণার জল খাব, সেখানে তোমাদের ফিল্টারের সরঞ্জাম হাজির করলে একেবারে ভেঙেচুরে দোব।"

গলা উঠাইয়া বলিলেন—"ওগো, শুনলে আমাদের নাতি-ঠাকুর্দার কি কথাটা হ'ল? শুনে গিয়ে এই বেলা সাবধান হও, নইলে..."

"মেঘদূত"-এর মধ্যে মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা অবান্তর কথা আসিয়া পড়িয়া হাসির হররা উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা আসিয়া বাহিরের দিকটা গুলজার করিয়া তুলিল। সাতু, হরিচরণ, তাহাদের সঙ্গে খানিকটা কিশোরও, ওদিকে ভুলোর দু'টি ছেলে, তিনটি ছোট ছোট মেয়ে। সমস্ত বাগানটার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহারা কি একটা দুর্জ্ঞেয় খেলায় মাতিয়াছে। ফুল তুলিতেছে, ফল পাড়িতেছে, বাগানের মধ্যে খানা কাটিয়া পুকুরের জল আনিয়া ভরতি করিতেছে। ব্যস্ততায় গিরিবালার চেয়ে কিছু কম নয়, হট্টগোলও কিছু অল্প হইতেছে না।

এরও মধ্যে একসময় রসিকলালের অশ্বিনী 'চিঁ-হি-হি' শব্দ করিয়া মালতী-মঞ্চের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রসিকলাল উপর থেকেই

বলিলেন—"ওরে তোরা করছিস কি? বাগানটা যে লণ্ডভণ্ড করে দিবি দেখছি। পণ্ডিতমশাই নেই না কি?"

পণ্ডিতমশাই ঘর থেকেই হাঁকিয়া বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই আছে, তবে একটা দিনের জন্তে চৌকিদারির কাজ থেকে ছুটি নিয়ে। তুমি সটান চলে এস রসিক।"

খোলা বইয়ের উপর হাতটা ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বিপিনের পানে চাহিয়া একটু আবেগস্তিমিত কণ্ঠে বলিলেন—"সত্যি বলছি ভায়া, সমস্ত জীবন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে শ্মশানের শান্তি আগলাতে আগলাতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বাড়িতে নিত্য একটু করে অগোছ, একটু ভাঙাচোরা, কচিবুড়ো পাঁচরকম গলার একটু হট্টগোল না হ'লে বেঁচে থাকা যে কী বিড়ম্বনা!"

ঠিক এই কথাটুকুই সেইদিন বিদায়ের সময় গৃহিনীর মুখ দিয়াও বাহির হইল—অন্যভাবে।—

বহু বৎসর পরের—গিরিবালার শেষ জীবনের কথা। শৈলেনের মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় বাহির হইতে বেড়াইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিতেই যেন মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—অসহ্য হট্টগোল! একটা বিবাহ উপলক্ষে বাহিরে যে যেখানে ছিল সব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—ছেলে-মেয়েয়, বড়-ছোটয় বাড়িতে এতটুকু জায়গা নাই। সমস্তদিনই অল্প-বিস্তর হৈচৈ লাগিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় বাড়িয়াছে। কে কতকগুলা নূতন রেকর্ড কিনিয়া আনিয়াছে—একটা ঘরে গ্রামোফোন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোনেদের মেয়েরা কলিকাতায় থাকে, নূতন নাচ শিখিয়াছে, বাড়ির অন্যদিকটায় খোলা ছাতটা ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। ঝিয়েদের কোলে পাঁচটা-ছয়টা কচি ছেলে-মেয়ে, বাড়ির এখানে-ওখানে রকমারি কান্না জুড়িয়াছে। বাহির থেকে চাকর

আসিয়া বৌয়েদের চায়ের তাগাদা দিতেছে। কি রান্না হইবে জানিবার জন্ম পাচক-ঠাকুর নিজের কণ্ঠস্বরকে এই ভিড়ে শ্রুতির উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেছে। এর উপর সমস্ত শব্দকে আবৃত করিয়া বাড়ির অলি-গলি, কোন-কাণ ভরাট করিয়া উঠিতেছে একপাল ছেলে-মেয়ের কলরব। বাহিরের খেলা শেষ করিয়া আসিয়া তাহারা উঠানটা দখল করিয়া ছড়া-সংযোগে ঘরোয়া খেলা ধরিয়াছে—আনিবানি, কাণামাছি আরও রকমারি কি সব।

—আর সমস্তর মাঝে মা গরদের শাড়ি পরিয়া, উঠানের তুলসীমঞ্চে মাথা ঠেকাইয়া অবিচল স্থৈর্য্যে দাঁড়াইয়া আছেন।

শৈলেন খুব উগ্রভাবে গোটা দুই-তিন ধমক দিতেই বাড়িটা নিঃশব্দ হইয়া গেল। আবার কোথাও শব্দ ওঠে কিনা শুনিবার জন্ম উগ্র দৃষ্টিতেই দাঁড়াইয়া আছে, মা ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। প্রশান্ত দৃষ্টি সমস্ত মুখটাতে তৃপ্তি মাখান, উনি যেন এ বাড়িতে ছিলেনই না।

শৈলেন রাগটা মায়ের উপরই মিটাইল, বলিল—"থাকো কি করে এই গোলমালের মধ্যে মা? মাঝে মাঝে একটা ধমক দিলেই তো হয়।"

সেইদিন শৈলেন পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির নিমন্ত্রণের কথা প্রথম শোনে। মা যেন কোথায় রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে একটি অপূর্ব্ব ক্ষমা আর ধৈর্য্যের হাসি হাসিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন—"এই আমার আশীর্বাদ রে! যেন এর মধ্যেই যেতে পারি। আজ সবাই এক জায়গায় হয়েছে, ঠাকুরমার আশীর্বাদের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।"

একটু পরে যখন উপরের ছাদে গেলেম, সব গল্পটা বলিলেন, হাসির মধ্যে, একমোন চালের কথাটাও। শেষে বলিলেন—"খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিকটা গল্পগুজব করে আমরা এইরকম সন্ধ্যের একটু পরে

পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি থেকে উঠলাম। বেরুবার আগে সবাই জড়ো হয়েছি, পণ্ডিতমশাই ঘরের ভেতর থেকে এলেন। দু'টি ছোট ছোট কৌটো খুলে ধরলেন, একটিতে একটা আংটি,—উনি নিজেই ওঁর হাতে পরিয়ে দিলেন। অন্য কৌটোতে দু'টি পার্শী মাকড়ি, তখন নতুন ফেশান উঠেছে। ঠাকুরমার হাতে দিয়ে বললেন—"তুমি এ'দুটো দিদিকে পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করো।"

বেশ মনে আছে—যেন এই সেদিনের কথা। ঠাকুরমা পরিয়ে দিচ্ছেন, হাত দু'টো একটু একটু কাঁপছে ; মুখে হাসি' এদিকে চোখের পাতাও অল্প-অল্প ভিজে। আমরা দু'জনে দু'জনকে প্রণাম ক'রে উঠতে আমার মাথায় হাতটা কয়েকবার টেনে টেনে দিলেন,—সে যে কি মিষ্টি টান! তারপর একটু কাঁপা গলায় বললেন—'ওকে আর কি আশীর্বাদ করব ?—আমার এই কাঙালের ঘরে একদিনের তরেও ভরা সংসারের যে সাড়া জাগিয়ে গেল, সেটা ওর নিজের ঘরে যেন নিত্যিকার ব্যাপার হয়ে থাকে।'

আমায় বকাঝকা ক'রতে বলিস নি শৈল। আমার ভয় হয় ; তাঁর আশীর্বাদ এমনি ফলন্ত দেখে যেতে পারবো তো ?

দ্বি তী য় প র্যা য়

১

গিরিবালার পাণ্ডুল যাওয়ার স্মৃতিটা একটু নূতন ধরণের।—এপারে বড় লাইনের গাড়ি, তাহার পর ওপারে গিয়া ছোট লাইনের ; শুধুই ছুটিয়া

চলিয়াছে, মাঠ, বাট, গাছের শ্রেণী, ছোটবড় গ্রাম : ঘাটের বৌ-ঝিয়েরা ; মাঠের চাষা, বলদ,—সব পাক খাইতে খাইতে পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। নিজের মাথাতেই মাঝে মাঝে কেমন একটা ঘুর্ণি জাগিয়া উঠিতেছে, ষ্টেশনের হাঁকডাকগুলাও ফুটিতে না ফুটিতেই আবার গতির শব্দের মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। তাহার পর আসিল উঁচুনীচু রাঙ্গামাটির দেশ— দু'ধারের জমি যেন ঢেউ খেলিয়া খেলিয়া পিছনে সরিয়া যাইতেছে। তাহার পর আসিল পাহাড়। গিরিবালা প্রথমটা দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, যেন হঠাৎ কি একটা ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। কি করিয়া 'সীতার বনবাস'—অষ্টপ্রহর মনটা পূর্ণ করিয়া আছে, বলিল—"সেই যে মাল্যবান পর্ব্বতের কথা পড়ে শুনিয়েছিলাম কিনা,—এইরকম জিনিষ।"....পাহাড়ের দল একসময় আরও ঘন হইয়া রেলের দুইটা দিক যেন চাপিয়া ধরিল, তাহার পর রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কখন্ একটা ছমছমে ভাবে অভিভূত হইয়া গিরিবালা ঘুমাইয়া পড়িলেন ; সুপ্তির মধ্যেও একটা অস্পষ্ট শব্দের সঙ্গে গতির একটা ক্ষীণ চেতনা জাগিয়া রহিল।...দুইটা রেলগাড়ির মাঝে খানিকটা জাহাজে চড়া, রেলের পর্ব শেষ হইলে বলদেটানা সাম্পেনি। তিনটা দিনের এই পথ।

এই নিরন্তর গতির মধ্যে কয়েকটা বিশ্রামের স্মৃতিও আছে, অল্প, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট।

পশ্চিমা চাকর মোহনা। গাঁট্টা গোঁট্টা, কালো কুচকুচে, মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ, পরনে একটা বাসন্তীরঙে ছোবান কাপড়, গায়ে হাতকাটা মেরজাই, উপর ডানহাতে ঝকঝকে একটা নীরেট রুপোর অনন্ত, মাথায় এক রাঙা পাগড়ি, বিয়েতে পাইয়াছে, মাথায় জড়াইয়াছে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া যতটা সম্ভব বড় করিয়া। পিতল-বাঁধান লাঠি ঘাড়ে

করিয়া গাড়ির সামনে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে।....বিপিন বলিলেন—"মোহানার বাহাদুরি দেখ্ চণ্ডী, যেন কত বড় কা'কে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"....তাহারপর যখনই গাড়ী থামিয়াছে, আগে নজর পড়িয়াছে মোহানার উপর। তীব্র বেগের গায়ে ও একটি মন্থরগতি চিত্র।...কথা নাই, এদিক ওদিক চাওয়া নাই, পাহারা দিয়া যাইতেছে; বাশি দিয়া গাড়ি ছাড়িতেই আবার পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

আর একটা বড় বিরাম গঙ্গা।—

দুপুরের একটু আগে ওরা গাড়ি থেকে নামিলেন। প্ল্যাটফরমের উপরেই একটা ঘরে আসিয়া সকলে প্রবেশ করিলেন। বিপিন জামা জুতা ছাড়িয়া বলিলেন—"আমি গঙ্গা থেকে নেয়ে আসি। ওর জন্যে মোহনা জল এনে দিচ্ছে। আমি এলে তো'তে মোহনাতে নেয়ে আসবি। এইখানেই খেয়েদেয়ে একটু আরাম করে নিতে হবে; ষ্টীমার সেই যার নাম চারটে, তাও যদি লেট্ না হয়।"

আহারাদি সারিয়া সবাই আরাম করিতেছেন, নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, একটা চড়া বাঁশির আওয়াজে গিরিবালার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অসহ্য গরম, ঘরের দেয়াল টিনের, টিনের ছাদ, যেন সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। পিছনের জানালাটা খোলা, কিন্তু খানিকটা উপরে; বাতাস পাইবার জন্য একটু অগ্রসর হইতেই পিছনের দৃশ্যের উপর নজর পড়িয়া গিরিবালা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।—বহুদূরে, আকাশ যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়াছে তাহার কোলে সবুজ পাড়ের মতো একটা টানা রেখা, বাকি সমস্তটাই জল। যেন সম্মোহিত হইয়াই গিরিবালা জানালার নিচে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁদের ঘরটা জলের প্রায় উপরেই; সেই যে সেখান থেকে জল আরম্ভ হইয়াছে, একেবারে সেই সবুজ রেখা পর্যন্ত; বড় বড় ঢেউগুলা ক্রমে ছোট হইয়া একেবারে মিলাইয়া গেছে,

কড়া রোদের আলো চঞ্চল ঢেউয়ের গায়ে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গিরিবালার সমস্ত মনটা যেন থম-থম করিয়া উঠিল। আরও অগ্রসর হইয়া জানালার মধ্য দিয়া গলাটা একটু বাড়াইয়া ডাহিনে-বাঁয়ে চাহিয়া দেখিলেন। বাঁ দিকে খানিকটা দূরে একটা প্রকাণ্ড চড়া, তাহার গায়ে গোটা দুই তিন বালির ঘূর্ণি উঠিয়াছে। চড়ার দুই দিক দিয়া গঙ্গা দুই ধারায় বহিয়া আসিয়াছে, তার এক একটি ধারাই সাঁতরার গঙ্গার বোধ হয় দ্বিগুণ।

গিরিবালা অপলক দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া রহিলেন। শুধু জল, বালি আর আকাশ ছাড়া কিছুই দেখিবার নাই, তাও প্রখর রৌদ্রে দীপ্ত; তবু চোখ ফিরান যায় না। মনটা একটা অদ্ভুত ধরণের শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু লাগে ভালো। শুধু মনে হয়—কত বড়!—কত বড়!!...বিকাশদাদার কছে সাঁতরার গঙ্গার গল্প করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবানের সৃষ্টি এই রকমই গিরি—যেটাকে ভাববি খুব বড, দেখবি তার চেয়েও বড় আছে—তার চেয়েও বড—আবার তার চেয়েও বড়—কোনখানে পূর্ণচ্ছেদ নেই!"...ছেলেমানুষি, তবুও নূতন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মনটা হঠাৎ খানিকটা বিস্তারলাভ করিয়াছে, সাড়া দেয়, যদিও খানিকটা ছেলেমানুষি লাগিয়া থাকে তাহার সঙ্গে।—ভাবিতে ভাবিতে গিরিবালার চেতনা যেন আপনাকে ছাড়িয়া, একটার পর একটা সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া যায়—ভগবানের সৃষ্টিতে তাহা হইলে এর চেয়েও বড় গঙ্গা আছে? যাত্রা করিলে তাহার উপর শুধু যাওয়াই আছে, কোথাও পৌছান নাই?... লোকে বলে সমুদ্রের নাকি কূলকিনারা নাই—সে আবার কিরকম তাহা হইলে?...এ ভগবানই বা কি?—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, না মহেশ্বর? গিরিবালার মনে যেন এক ধরণের অস্বস্তি জাগিয়া উঠে—যেই হউন, নিজের সৃষ্টির

সামনে তাঁহাকে যেন ছোট মনে হয় : অথচ ঠাকুরকে ছোট মনে করিতেও বাধে। অমীমাংসিত প্রশ্নের বেদনায় মনটা যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে ; গিরিবালা দু'টি হাত তুলিয়া প্রণাম করেন, যদিও কাহাকে যে প্রণাম করা তাহাও নিজেই ঠিক বুঝিতে পারেন না।

আর একটি দৃশ্য মনে এমনই স্পষ্ট হইয়া গাঁথিয়া গিয়াছে।—

পরের দিন সকালে খানিকটা বৃষ্টি হইয়া গেলে ওঁরা রেলপথের শেষ স্টেশনে আসিয়া নামিলেন। কুঠির সাম্‌পেনি আসিয়াছিল, স্টেশনেই একজন পরিচিত বাঙ্গালীর বাসায় স্নানাহার করিয়া যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার সময় নাকি পৌঁছিবার কথা। সাঁতরায় যেমন জুড়ীঘোড়ার গাড়ি চড়িয়াছিলেন, সাম্‌পেনি বলদ-টানা হইলেও প্রায় সেইরকমই চলে, কিন্তু কিছুদূর ভালোভাবে চলিয়াই একটা বলদ একটু খোঁড়াইতে আরম্ভ করিল। যখন বিকাল হইল তাহারা একটা ছোট নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন। খেয়া ঘাট, একটা বড় চেপ্টা নৌকা করিয়া তাঁহারা সাম্‌পেনি সুদ্ধ পার হইলেন।

ওপারে গিয়া চড়াইটুকু কোনরকমে ঠেলিয়া ঠুলিয়া খোঁড়া বলদটা যে বসিয়া পড়িল, আর কোন মতেই উঠিতে চাহিল না। বিপিনবিহারী মোহনাকে প্রশ্ন করিলেন—"কি উপায় রে মোহনা?" মোহনা বলিল— কুঠির এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়া গেছে, আর ভয় নাই, তবে পৌঁছাইতে বিলম্ব হইবে। প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা গ্রাম! খোঁড়া বলদটাকে একটা গাছের গোড়ায় বাঁধিয়া, ভালো বলদটা হাঁকাইয়া গাড়োয়ান গ্রামের দিকে চলিল। সাম্‌পেনির সঙ্গে একটা পেয়াদা আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে গেল, গ্রাম হইতে জোড়া মিলাইয়া একটা বলদ লইয়া আসিবে।

বিলম্ব হইতে লাগিল। বিকাল গড়াইয়া গিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিতে

লাগিল। জায়গাটা তেপান্তর গোছের। যতদূর দেখা যায় চারিদিকে মাঠ আর মাঠ, ধানে ধানে সবুজ একেবারে; মাঝখান দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রশস্ত উঁচু রাস্তাটা চলিয়া আসিয়াছে। ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে বিপিন বলিলেন—"চণ্ডী আয়, নদীর ধারটায় গিয়ে বসি।"

চণ্ডী প্রশ্ন করিল—"বৌদিদি?"

"ও-ও আসুক না, এ মাঠের মধ্যে অমন জবু-থবু হ'য়ে বসে থাকবার দরকার কি?"

নদীর ধারে ঘাসে-ঢাকা একটা উঁচু জায়গায় তিনজনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিন বলিলেন—"তোরা বোস, আমি ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি।"

বিপিনবিহারী একটু দূরে চলিয়া গেলে গিরিবালা অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিলেন। বহুদূরে কতগুলা গাছের পিছনে সূর্যাস্ত হইতেছে—ঠিক উপরে কতগুলা ভাঙা ভাঙা মেঘে তাহার রক্তাভা পড়িয়াছে। নিশুতি রাতের মতো ঝিল্লীর ডাক ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। সামনে নদীর জলে ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে; গোটা দুই বলদ লইয়া একটু দূরে খেয়ার নৌকাটা পার হইতেছে।...তিন দিনের একরকম অবিশ্রান্ত গতির পর গতিলেশহীন এই প্রকাণ্ড মাঠে নীরব সন্ধ্যাটি বড় ভালো লাগিল গিরিবালার। অল্পে অল্পে মুখর হইয়া উঠিলেন, একবার বলিলেন—এ নদীটার নাম কি ঠাকুরপো?"

"জীবছ্‌"

গিরিবালা একটু হাসিয়া উঠিলেন—"জীবছ্‌।—আবার কি নাম?... চাকরের নাম মোহনা, নদীর নাম জীবছ্‌, অদ্ভুত দেশ তোমাদের।"

সত্যই এমন কিছু অদ্ভুত নাম নয়, কিন্তু মনটা হঠাৎ মুক্ত হইয়া দেবরের সঙ্গে একটু রহস্য-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে।

চণ্ডীচরণ হাসিয়া বলিল—"আর মশাইয়ের দেশের নদীর নাম কি?"

"কাণা-নদী।"

—বলিয়াই গিরিবালা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না গো ঠাকুরপো, বেশ দেশ তোমাদের, কেমন বনজঙ্গল নেই বেশি, দেখতে দেখতে এলাম কিনা।"

একটু থামিয়াই বলিলেন—"আর এ-জায়গাটুকু আরও চমৎকার। কি ইচ্ছে হয় জান ঠাকুরপো?—এইখানে একটি কুঁড়েঘর বেঁধে থাকি, রোজ এই নদীর তরতরে জলে নাই—সকালবেলা উঠে..."

চণ্ডীচরণ হাসিমুখে গিরিবালার পানে কৌতূহল-দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, বলিল—"আর ভয় ক'রবে না?"

"ওমা, তোমরাও এই রকম থাকবে যে!"

চণ্ডীচরণ কি একটু ভাবিল, তৎপরে তর্জ্জনী নাচাইয়া প্রশ্ন করিল—"আমি বলব বৌদি?"

"বল না!"

"তোমার মা-জানকীর মতন হবার ইচ্ছে হয়েছে, ওরা তিনজনে যেমন পঞ্চবটী বনে ছিলেন না?—সত্যি কথা বোল' কিন্তু!"

গিরিবালা ও-ভাবিয়া বলেন নাই, তবে চণ্ডীচরণের কথাটা শুনিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিলেন, তারপর দেবরের পানে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বেশ, ধরো যদি তাই হয়, কেমন লাগে তোমার ঠাকুরপো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ভালো কথা মনে পড়ে গেল,—এটা তো মা-জানকীর দেশ, না ঠাকুরপো?"

চণ্ডীচরণ মাথাটা ঝুকাইয়া একটু গর্বের সহিত বলিল—হ্যাঁ-ই তো; মিথিলাপুরী!"

ইহার পর বেশ খানিক্ষণ আর কোন কথা হইল না; গিরিবালার শুধু ধীরে ধীরে মাথা ঘুরাইয়া চারিদিকে চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন, যেন কথাটা মনে পড়িবার পর জায়গাটা আর একবার নূতন হইয়া গেছে। খানিকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন—"তার কেউ আছেন বেঁচে এখন?"

বিপিনবিহারী এদের অলক্ষিতে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—"ওঠ চণ্ডী, বলদ এসে গেছে। কি সব কথা হচ্ছিল দু'জনে?"

চণ্ডীচরণ হাসিয়া বলিল—"বৌদি বলছিলেন এইখানে একটা কুঁড়েঘর বেঁধে..."

গিরিবালা চিমটি কাটিয়া দিতে "উঃ" করিয়া হাসিয়া থামিয়া গেল। বিপিনবিহারী বলিলেন—"জানিস্ না?—কবির মেয়ে যে। বেশ তা থাক্, মোহনাকে রেখে যাচ্ছি, একটা ঘর বেঁধে দেবে। চলে আয়, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

দ্রুত পা চালাইয়া দিলেন। চণ্ডীচরণ হাসিয়া পা চালাইবার পূর্বেই গিরিবালা "ঠাকুরপো—লক্ষ্মীটি"—বলিয়া বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন।

গাড়োয়ান খুব জোরে বলদ হাঁকাইয়া দিল, বেশ খানিকটা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, রাস্তায় একে একে দুইজন কুঠির ঘোড়সওয়ার আসিয়া পৌঁছিল—মধূসূদন চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দৌড় করাইয়া দিয়াছেন। প্রথম জন যখনই ফিরিয়া খবরটা দিতে গেল, দ্বিতীয় জন রাত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই রহিল।

সাম্‌পেনি পৌঁছিতেই একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণের ভাষার কলরবের মধ্যে কিছু কিছু বাংলা কথাও শোনা গেল। পরিচিতের মধ্যে শ্বশুরের গলা,—গাড়োয়ানটার উপর ভয়ানক

চটিয়াছেন, দুর্বল বলদ কেন লইয়া গিয়াছিল। একটি ছোট মেয়ের গলা—ভিতর থেকে বাহিরে আসিতে আসিতে কথায় টান দিয়া চেঁচাইয়া বলিতেছে—"বাবা, মা এসময় রাগারাগি করতে বারণ কচ্ছে—এ-এ-ন।" বাংলা আর এদেশী ভাষায় চণ্ডী ও বিপিন নানা প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। "বৌদি কোথায়?—বৌদি দেখব" বলিয়া কয়েকটি ছোট মেয়ে একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও সব হুকুম, সতর্কবাণী—"আলো ঠিক কর্...দুয়ারি মে সাম্‌পেনি লাগাও...দেখিস কেউ যেন চাপা না পড়ে সামপেনিতে...."

এই মিশ্র কলরবের উপর হঠাৎ চৌদ্দ পনের জন নারীর কণ্ঠে গান উঠিল। মধুসূদন চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"গান থামাতে বলো কলেশ, আমার মাথাব ঠিক নেই।"

"গীত বন্ধ্ কর, গীত বন্ধ্ কর"—বলিয়া চারিদিক হইতে একটা দাবড়ানি উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আবও পাঁচ সাত জন যোগদান করা ব্যতীত কোন ফল হইল না। মধুসূদন আরও চটিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় সেই মেয়েটির গলা। ক্রমাগতই চঞ্চলভাবে ভিতর-বাহির করিতেছে, ভিতর থেকে দরজার কাছে আসিয়া সব্বার উপরে গলা তুলিয়া বলিল—"বাবা, গান করতে দাও; মা বললেন আজ কারুর মনে কষ্ট দিতে হবে না-আ-আ..."

বিপিনবিহারী ধমক দিলেন—"তিনি।—অনেক দিন ছিলাম না, তাই গলা বেরিয়েছে?"

মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, গলা তুলিয়া একরাশ প্রশ্নে-মন্তব্যে অভিভূত করিয়া দিল—"কেন ছিলে না?—কেন থাক না?—চুপি চুপি বিয়ে করেছ তিনিকে ফাঁকি দিয়ে—মজা দেখাব।...কী এনেছ বিপিন-ভাইয়া আমার জন্য?...."

সামপেনির মুখ ঘুরাইয়া সদর দরজার সঙ্গে লাগানো হইল। তবুও যেটুকু অবকাশ রহিল, কয়েকজন লোক দু'ধারে দু'টা কানাৎ দাঁড় করাইয়া সেটা বন্ধ করিয়া দিল। সেই ঘেরা জায়গার মধ্যে বাড়ির মেয়েরা নামিয়া আসিলেন, শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে শাশুড়ি বরণ আরম্ভ করিলেন। বাঙালী বধূ বরণ এখানে প্রথম। কিছু মৈথিল স্ত্রীলোকও ঢুকিয়া পড়িয়া একদিকে গান করিতেছিল, উলুর অদ্ভুত আওয়াজে একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যাহারা উলু দিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটি বড় মেয়ে অনুযোগের সুরে বলিল—"দেখো মা, হাসি ভাল লাগে না; ওদের আদাড়ে গানের জন্যে আমরা হাসছি?" তাহার পর শুদ্ধ মৈথিল ভাষায় সোজা তাহাদের সঙ্গেই মৃদু ঝগড়া আরম্ভ আরম্ভ করিয়া দিল—"ইঃ হসৈছি কিয়্যা? আঁহা লোকৈন্—আহে-মাহে কি গবৈৎ যাইছি? (ইস্, হাসছ কি?—তোমারাই বা আগড়ম বাগড়ম কি গাইছ?)

হাসিটা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"ই ত মনুখ্যক্ গীত ছিয়েই হে, আঁহা লোকৈন্ গিদড় জ'কা কি হুক্কি পাড়ৈৎছি? (এতো মানুষের গান গো, তোমরা শেয়ালের ডাক কি তুলেছ?)

ঝগড়াটা দুইদিকের হাসির ভিতর দিয়া একটু গড়াইল। রেষারেষির উপর গান আর উলুধ্বনি দুইটাই আরও সতেজ হইয়া উঠিল।

বরণ শেষ হইলে বধূকে লইয়া সকলে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

পাণ্ডুলের অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালী প্রথার সঙ্গে খানিকটা এ দেশীয় প্রথাও জড়াইয়া রহিল। এ দেশীয়ের মধ্যে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য। বাসার সামনে একটি পুরাতন বট আর একটি অশ্বত্থগাছ বেশ খানিকটা জায়গা ছায়াচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহার তলায় একটি সামিয়ানার মধ্যে সকাল থেকেই নটুয়ার নাচ আরম্ভ হইয়া গেল। বার-তের থেকে কুড়ি বাইশ বৎসরের পর্যন্ত ছেলে পুরাপুরি এক বাইজীর সাজ পরিয়া স্ত্রী-জনোচিত হাবভাবের সঙ্গে নৃত্যগীত করে। তাহাদের সঙ্গীতও ঠিক বাইজীর মতোই—দুইপাশে দুইজন সারাঙ্গীওয়ালা, ঠিক পিছনে ডুগিদার কোমরে তাহাদের নিজের নিজের বাদ্যযন্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গীত করিয়া যায়; একটি মন্দিরাওয়ালাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। নটুয়ারা বাবরী চুল রাখিয়া নর্তকীর আরও খানিকটা নিকটতর হইবার চেষ্টা করে। ওদিকে বয়স একটু বেশী হইয়া গেলে যদি গোঁফ উঠিয়া পড়ে তো গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। মোটের উপর নটুয়া পাঁচমিশেলী কাণ্ড, ছোট বড় সব কাজেই কিন্তু অপরিহার্য।

একধারে বটগাছের নীচে সানাই বসিয়াছে, ঢোলের চামড়া ঢিলা হইয়া গেলেই তাতাইয়া লইয়া আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু করিয়া দিতেছে।

ঠিক দরজার কাছে গাহিতেছে ভাট। এরা জাতিতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, কিন্তু কোন বড় হিন্দু কবির, অথবা নিজেদেরই রচিত দেবদেবীর-বন্দনা বা অন্যবিধ কোন ছড়া হালকা এক রকম গানের সুরে গাইয়া যায়। ভাল ভাট হইলে সদ্য সদ্যও কোন বিষয় লইয়া ছড়া রচনা করিয়া, সুরে টানিয়া শুনাইয়া দেয়।...ভাট ধরিয়াছে চলতি এক

ছন্দে হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনা, তাহার পর ধরিবে জনকপুরের রামায়ণী বিবাহোৎসব,—বিবাহ-ঘটিত উৎসবে এই সাধারণ পদ্ধতি।

এর উপর মেয়েদের গীত আছে, ভিন্ন ভিন্ন পাড়া থেকে সাত আট জন করিয়া দল বাঁধিয়া আসিতেছে, বাসার কাছে আসিয়া গলা জড়াজড়ি করিয়া গীত করিতে করিতে আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, গান সমাপন করিয়া বধূ দেখিয়া নিজেদের মন্তব্য করিতেছে; তাহার পর ইচ্ছামত যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে; ব্রাহ্মণ আছে, আবার ইতর জাতেরও মেয়ে আছে।

ভিন্নরকম সুরের সংঘর্ষে খুব যে একটা শ্রুতিরোচক কিছু হইতেছে এমন নয়, তবে যে ভাবেই হ'ক সমস্ত পাড়াটাতে একটা সাড়া জাগাইয়া দিয়াছে। এরা উল্লাসটা একটু উদ্দাম ভাবেই উপভোগ করিতে চায়। বড় মানুষের বাড়িতে উৎসবটা যদি এই আকারে না আসে তো নিন্দা হয়;

রাত্রের উৎসবটা অন্যভাবে হইল। শানাই, ভাট; মেয়েদের গীত বন্ধ রহিল। সামিয়ানা আরও ভালো করিয়া সাজাইয়া আলোক-শোভিত করা হইল। কুঠির আমলা এবং গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা আসিয়া ফরাসের উপর বসিলেন, বড় বড় আলবোলায় সুগন্ধী তামাকের গন্ধ উঠিল, রূপার পরাতে, সোনার তবক মোড়া পান, জরদা, আতরদানে আতর ঘুরিতে লাগিল। গোলাপপাশে গোলাপজল ভরিয়া চারিদিকে সিঞ্চিত করা হইতে লাগিল। আসরের মাঝখানে নটুয়া;—সকালের মতো মিশ্র শ্রোতার সামনে যদিচ্ছা সঙ্গীত নয়, রসজ্ঞদের ফরমাইস অনুযায়ী সঙ্গীতে রাত্রের আসর জমিয়া উঠিল। নটুয়ার পরে উঠিল কথক, এখানকার উচ্চারণে কথ্থক। এরা নটুয়ার মতো গেরস্ত-পোষা আর সুলভ নয়। এদের বয়সও অনেক, সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গি, বিশেষ করিয়া ভাবানুসরণ

করিয়া অঙ্গুলিভঙ্গি আর নৃত্যশিল্পে ইহারা খুবই দক্ষ।…পোষাকে কিন্তু নটুয়ার অনুরূপ, এবং গোঁফের উপর কখন কখন যদি দাড়ি রাখিবার অভিরুচি হয় তো কেহ আপত্তির কিছু দেখে না।
মোটের উপর ছোটখাট একটু আধটু অসামঞ্জস্যের কথা ছাড়িয়া দিলে কথকের মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য আছে।

কথকটি দৈবযোগে পাওয়াও গেছে ভাল; বারাণসীর লোক, সহরে কোন এক বড় মৌক্ষিলে বায়না লইয়া আসিয়াছিল, খবর পাইয়া তাহাকে লইয়া আসা হইয়াছে। সে আসরটা খুব জমকাইয়া দিল।

এই অবিরাম সঙ্গীতের পটভূমিকায় ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল। সে এক বিরাট ব্যাপার। বৌভাতের মধ্যে যেটুকু শুদ্ধ বাঙালী অংশ সেটুকু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মাত্র দুই তিনটি পরিবার লইয়া ব্যাপার, তাহাও দূরস্থিত অন্য কুঠি থেকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা। স্থানীয়দের জন্য আয়োজনটাই আসল

আয়োজনের মধ্যে সূক্ষ্মতা নাই, একদিন হইবে চিড়াদই চিনি আর আচার; একদিন পুরি, আর জিলিপি, গোটাদুই তরকারি থাকিবে। সূক্ষ্মতা নাই তবে নববধূর কড়া পর্দার মধ্যে হইতে গিরিবালা বহর যাহা দেখিলেন তাহাতে শুধু বিস্মিত নয়, কতকটা যেন বিমূঢ়ও হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই পনের জনের জন্য এক মণ চাউলের আন্দাজ সত্বেও। বস্তা বস্তা চিড়া, বস্তা বস্তা চিনি আসিয়া ভাড়ার ঘরে জমা হইতেছে; দই দেশের মতো ছোট ছোট তিজেলে নয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালসায়;—এখানে বলে আথ্‌রা।

দেশে চিড়াদইয়ের ফলারের পাট প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তবুও গিরিবালা বার দু'এক দেখিয়াছেন, একবার নিকুঞ্জলালের বাড়ি আর একবার ঘোষালমশাইয়ের বাড়ি, কিন্তু সে এ ধরণের কিছুই নয়; লোক

খাওয়াইবার জন্য যে এ-জাতীয় আয়োজন হইতে পারে গিরিবালা ধারণাতেই আনিতে পারিতেছেন না।

পরদিবস দুপুর বেলার কথা। ইঁহারা কয়েকজন সমবয়সী দাওয়ায় বসিয়া পান সাজিতেছেন, কয়েকজন মৈথিলী মেয়েও সঙ্গে আছে। জানকী, লছমী, দুলারমন্, কৌশল্যা, রামপিয়ারী—পাড়ার ঝিউড়ি মেয়েই সব। এমন আনকোরা বাঙালী নববধূ তাহারা কখনও দেখে নাই। খুব খুশি, তবে সাধারণতই একটু রহস্যপ্রিয় জাত বলিয়া তাহাদের আমোদটা নববধূর সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আকারেই প্রকাশ পাইতেছে বেশি,—দেশ লইয়া, দেশের মানুষ লইয়া, কয়েকটা যে বাংলা কথা শিখিয়াছে তাহা লইয়া। গিরিবালা প্রথম দিন ক্লান্তিবশত বলিয়াছিলেন—"ঘুমব", ওদের ভাষায় কথাটার মানে হয় "বেড়াব।"...সেই লইয়া বিদ্রূপ হইতেছে—"ম্যায় গে, কনিয়া অবৈৎমাত্র কহৈছতিন্ ঘুম্ব।" (মাগো, কনেবৌ আসামাত্রই বলেন বেড়াতে যাবো!)

বোধ হয় খুব হাসিবার কথা নয়, কিন্তু নির্মল সমবেত হাস্যে বাড়িটা মুখর হইয়া উঠিতেছে। গিরিবালাও হাসির ছোঁয়াচেই হাসিয়া উঠিতেছেন, তাহার পর ননদ মতিবালাকে প্রশ্ন করিতেছেন—"কি বলছে ভাই, মেঝ ঠাকুরঝি?"

দ্বিভাষিণীর টীকায় আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিতেছেন—"তাই আমি বললাম! এঁরা সব করতে পারে দেখছি!"

ওরা আবার দ্বিভাষিণীর শরণাপন্ন হইতেছে, তবে সোজাসুজি নয়; কপট গাম্ভীর্যে বলিতেছে—"কনিয়া হামরা সবকে গাইর্ পারৈৎছতিন; তব্ উঠুহে লোকৈন্ (কনেবৌ আমাদের গালাগাল দিচ্ছেন;...তাহ'লে চল্ গো সব উঠা যাক)

মোতিবালা বলিতেছেন—"না, গালাগাল দেবে কেন?"

গিরিবালার কথার অর্থটা বুঝাইয়া দিতেছেন।

"এরা সব করতে পারে"—এই অভিমতের উপর মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আরও গম্ভীরভাবে বলিতেছে—"কিয়্যাক্ ন সক্‌বৈ? হুন্‌কা মাথাপর লক টোলা টোলা ঘুমা লা সকৈছি, গৌরী থিকি, ঢাকিয়া ঢাকিয়া পুন্ হেতৈ। চলথুন্।" (কেন পারব না? ওঁকে মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়ে আসতে পারি, উনি গৌরী, আমাদের চাঙারি ভরা পুণ্যি হবে।...চলুন না)

আরও জোরে হাসি উঠিল। গিরিবালা কি জবাব দিতে যাইবেন, বাহিরে একটা কলরব উঠিল। একটি মেয়ে বলিল—"বিজো ভেল্ হেতেই।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কি বললে গা মেজ-ঠাকুরঝি?"

একটি মেয়ে গিরিবালার প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিয়া বলিল—"কি বোল্লে গা মেজো ঠাকুর-ঝি?"

আবার একটা হাসি পড়িয়া গেল। মোতিবালা হাসিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণদেব পাত হ'য়েছে তাই গোলমাল হচ্ছে। গা তুলতে বলাকে ওরা 'বিজো' হওয়া বলে।" তাহার পর শুদ্ধ মৈথিলীতেই উহাদের তাড়াতাড়ি পানটা সাজিয়া লইতে বলিলেন, এখনই তো দরকার পড়িবে। ভাজের হইয়াও একটু ওকালতি করিলেন—কথায় কথায় যদি সবাই ছল ধরে তো বেচারি যে মারা যায়।

সকলে পান সাজার-হাতটা ত্রস্ত করিয়া দিল। ওরই মধ্যে গল্প হাসিও অবশ্য চলিল;—তাহারা তো ছল ধরিবেই—'কনিয়া' না খাইয়া রাত জাগিয়া, যে উপায়ে হোক মৈথিলী ভাষা শিখিয়া নিন। নহিলে ছল ধরিয়া পাগল করিয়া তুলিবে। উনি তো এবারে এদের লোক হইয়া গেছেন; আর দেশে যাইতে দিবে নাকি? আর বাংলা কথা

বলিতে দিবে নাকি ?—ওদের টিয়াকে এবার পিঁজরায় বন্ধ করিয়া মৌথিলী কথা শিখাইবে।

খাওয়া দাওয়ারও কথা উঠিল।....গিরিবালা বলিলেন—"ঠাকুরঝি, বলনা এরা খাবার আর জানেন কি ? এই তো দেখলাম—গাবদা গাবদা আটার লুচি, দু'টো তরকারি হ'ল কিনা হ'ল, তারপরেই জিলিপি, ব্যস সন্তুষ্ট। আমাদের ওখানে অন্তত তিন চার রকম মিষ্টি না হলে চলবে না ; তার আগে পাঁচ-ছ দফা তরকারি—শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, ছক্কা, ডালনা, ডাল, মাছ, অম্বল..."

উত্তর দিবার জন্য সবাই হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল, একজন টানিয়া টানিয়া বলিয়া উঠিল—"আর ডাটাকে চচ্চোড়ি নেই কহলি ? (আর ডাটার চচ্চড়ির কথা বললে না ?)

সকলে আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; মেয়েটি ঠাট্টা করিয়াই চলিল—লাউ কুমড়োর ডাঁটাগুলাকে পর্যন্ত কাটিয়া কাটিয়া চচ্চড়ি করিয়া খায়, তারা আবার খাওয়ার গুমোর করে !...এরকম লুচ বাংগালীরা হজম করিবে কোথা থেকে ? ফু দিলে উড়িয়া যায়—এই রকম দু'এক লুচ খাইয়াই—"মা গো, গেলাম গো !...."

মেয়েটি নিজের পেটটা চাপিয়া, পিট বাঁকাইয়া দুলিয়া দুলিয়া অসহ্য যন্ত্রণার এমন নকল করিতে লাগিল যে আবার একটা হাসির তোড় উঠিল। সেটা থামিলে গিরিবালা বলিলেন—"তা বই কি আমাদের বেলেতেজপুরের ননী আচার্যির খাওয়া যদি দেখে..."

এমন সময় সেজ ননদ ত্রিনয়নী ঝড়ের মত বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং গলা ছাড়িয়া—"লোটন ঝা খেতে বসেছে-এ-এ-এ-এ..." বলিয়া সমস্ত উঠানে একটা পাক দিয়া সেইভাবেই বাহির হইয়া গেল।

মেয়েগুলির মধ্যে যাহারা ছোট তাহারা "লোটম ঝা বৈস্‌লা হে!"—বলিয়া হুড়মুড় করিয়া বহিরের দিকে চলিয়া গেল।

যাহারা অপেক্ষাকৃত বড় তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, মোতিবালার দিকে চাহিয়া বলিল—'ইঃ, নো-নী আচারজী'!—যেনা নাম তেহিনা খেতা কি, বেখা দহুন হিন্‌কা লোটন ঝাকে খানাই হে মোতি-দিদি, কহিও নামো নৈ লেতা নোনী আচারজী কে—নো-নী আচারজি!" (ইঃ ননী আচার্যি! যেমন সেইরকমই খাবে তো? ওঁকে লোটন ঝার খাওয়া দেখিয়ে দাও মোতিদিদি, ননী আচার্যির নামও নেবেন না কখনও)

মোতিবালা বলিলেন—"যাবে বৌদি?"

"মা রাগ করবেন, তা না হলে···"

"রাগ করবেন না; আচ্ছা দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে আসি।"

গৃহিণী নিস্তারিণী দেবী দেখাশুনা করিয়া ফিরিতেছেন, নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন—"তোদের পান সাজা হ'ল? ওদিকে ব্রাহ্মণেরা বসে গেছেন।"

মোতিবালা বলিলেন—"খেতে খেতে হ'য়ে যাবে'খন; খাওয়া শেষ হতে তো এক পহর। মা, বৌদিদিকে লোটনঝার খাওয়া দেখিয়ে আনব, আহা কখনও দেখেননি!"

ভাজের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া মিনতি করার ভাবে নিস্তারিণী হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"তবে আর কি,—মস্ত বড় জিনিষ দেখেননি!"

সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না, ছিঃ ব্রাহ্মণেরা খেতে বসেছেন, কে একমুঠো কম খাচ্ছেন, কে একমুঠো বেশী খাচ্ছেন তা নিয়ে তামাসা করতে নেই, আর ওঁরই কল্যাণে যখন খাচ্ছেন। বলে

নারায়ণ ব্রাহ্মণদের হাতে আহার করেন, ওঁরা যত সন্তুষ্ট হন ততই ভালো গেরস্তর।…ছিঃ"।

এই ব্যাপারটুকু লইয়াই হাস্যকৌতুক হইতেছিল বলিয়া দলের সকলেই একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ডুলারমন নামে মেয়েটি বলিল —সে নেই হে চাচী, ভৌজী কহৈৎছেলি হুনকা মুলুকমে কেদন নোনী আচারজি বড্ড্ খৈন্হার ছৎ, তেই হুনকা একবের লোটনঝাকে দেখা দিতিঔঁও। পাণ্ডোলসে ককরো হম টপ দেবৈন্?" (কাকীমা তা নয় গো,—বৌদিদি বলছিলেন ওর দেশে কে একজন ননী আচাযি নাকি মস্ত বড় খাইয়ে আছে, তাই ওঁকে একবার লোটন ঝাকে দেখিয়ে দিতাম। কাউকে পাণ্ডুল ছাড়িয়ে যেতে দোব নাকি ?)

নিস্তারিণী দেবী জানাইলেন—"এখন তো পাণ্ডুলই ওঁর দেশ হ'ল, তোমাদের মত উনিও পাণ্ডুল নিয়ে গুমোর করবেন। তা বলে কি ব্রাহ্মণের খাওয়া নিয়ে রঙ্গ করে? খাইয়ে একআধ জন থাকে সব জায়গায়, আমাদের দেশে ছিল মুন্‌কে রঘু—একমণের কমে তার পেটই ভবত না,… "

ডুলারমন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"শাশ-পুতৌ একে ভ' গেলি হে, আপনে দেশকে বঢ়বৈছতিন্।" (শাশুড়ি পুত্রবধূ এক হয়ে গিয়ে নিজের দেশকেই বাড়াচ্ছেন গো!) সকলেই সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। নিস্তারিণী দেবী পর্যন্ত যোগ না দিয়া পারিলেন না। ঠিক এই সময় সেজ মেয়ে ত্রিনয়নী পূর্ববৎ সবেগে প্রবেশ করিল এবং সমস্ত উঠানটাতে পূর্ববৎই একটা চক্র দিয়া জানাইয়া গেল—"লোটনঝার পাঁচশটা বোম্বাই আম হয়ে গেলো ও-ও-ও ও…."

সকলে আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, কৌশল্যা বলিল—"আব্ শুনু" (এবার শোন) ওর ছোট্ট মন্তব্যটুকুতে হাসিটা আরও তরঙ্গায়িত

হইয়া উঠিল। নিস্তারিণী যেন দলবৃদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষের নিকট হার মানিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন, বলিয়া গেলেন মস্করা না করিয়া পানটা যেন তাড়াতাড়ি সাজিয়া ফেলে সবাই।

নিস্তারিণী দেবী চলিয়া গেলে দুলারমন মুখটা ঝুঁকাইয়া গিরিবালার পানে চাহিয়া বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলিল—"শুন্‌লি হে কনিয়া? আব পাণ্ডোলে আঁহাকে ঘর ভ' গেলেই; তেজপুরকে গুমান ছোড়ুঃ।" (শুনলে গো কনে বৌ, এবার পাণ্ডোলেই তোমার ঘরবাড়ি হ'ল, তেজপুরের গুমোর ছাড়ো।)

গিরিবালা হাসিয়া ননদকে বলিলেন—"ওদেরও তো বিয়ে হয়ে গেছে মেজঠাকুরঝি, জিগ্যেস করতো ওঁরা পাণ্ডুলের গুমোর নিয়ে পড়ে আছেন কেন? শ্বশুর বাড়িরই যশ গান না।"

অল্পস্বল্প বাংলা বোঝে, প্রসঙ্গ ধরিয়া কথাটা বুঝিতে আরও কষ্ট হইল না, দুলারমন সোজা হইয়া বসিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—বুঝলওঁ হে; পাণ্ডুলের গুমোর নিয়ে—ইঃ পাণ্ডোল ছোড়্‌ক ককর্‌ যশ গায়ব?" (বুঝেছি গো বুঝেছি,—পাণ্ডুলের গুমোর নিয়ে....ইঃ, পাণ্ডুল ছেড়ে কার যশ গাইব?)

সেও হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার তর্কের ভঙ্গী দেখিয়া বাকি সকলেও হাসিয়া উঠিল।

চণ্ডীচরণ আসিল, চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—"উস্‌ বৌদি, আজ যদি সাতু থাকতো তো উরে ব্বাসরে'—উরে ব্বাসরে' বলেই তার দম ফুরিয়ে যেত!"

ভ্যাংচাইতে ভ্যাংচাইতে নিজের একটু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। "উরে ব্বাসরে! লোটনঝা!...."বলিয়া আবার দৌড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কাজের কটা দিন অল্পঅল্প কাজে, তাহারই মধ্যে নূতন সঙ্গিনীদের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়ে, হাসি-কৌতুকে কাটিয়া গেল। কাজের জের মিটিতেও দুই তিন দিন গেল; তাহার পর নিত্যকার জীবন আরম্ভ হইল পাণ্ডুলের।

৩

গিরিবালার নূতন জীবন যেখানে আরম্ভ হইল সে জায়গাটির মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া দরকার।

পাড়া-গাঁ হইলেও পাণ্ডুল বেশ বর্ধিষ্ণু স্থান। এর জীবনের কেন্দ্রস্থল নীলকুঠিটা। জায়গাটা মিথিলার একেবারে মাঝখানটিতে, তায় বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রধান হওয়ায় স্বভাবতঃই একটু পুরাতন-ঘেঁষা। এরই মাঝে অতি-আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রতীক এই নীলকুঠি হঠাৎ কোন সময়ে ঠাঁই করিয়া লইয়া একটা মিশ্র সুরের অবতারণা করিয়াছে। টোলের সংস্কৃত চাপা দিয়া যখন কলের ভোঁ ওঠে, কিম্বা ব্রাহ্মণ-পল্লীর মাঠ ভাঙিয়া, পুকুরের পাড হইয়া সাহেব মেমে ঘোড়ায় চড়িয়া হাওয়া খাওয়াব সঙ্গে-সঙ্গে যখন তদারকে বাহির হয়, পুরাতন একটু চকিত হইয়া ওঠে। তবে গা সওয়া হইয়া আসিয়াছে; আর এই গা-সওয়া হওয়াটাই পাণ্ডুলের বিশেষত্ব—এইখানেই অন্যান্য স্থানের তুলনায় সে প্রগতিশীল—তাহাদের উপহাসেরও পাত্র, আবার হিংসারও পাত্র।

পশ্চিম দিক দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটা ছোট নদী পড়ে। ঠিক নদী বলা ভুল,—নিজ মিথিলার প্রধান নদী কমলার একটা সৃতি।

স্থানীয় লোকেরা কিন্তু মর্যাদা কমাইতে চায় না, কমলা নদীই বলে। এর ধারে কয়েক বিঘা জায়গা লইয়া কুঠি, সাহেবের বাড়ি ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ বাগান। বাড়ির স্থাপত্যে, বাগানের পরিকল্পনায়, কুঠিরপ্রাঙ্গণে কিছু কিছু অপরিচিত গাছের জন্যও, সমস্ত পরিবেশটুকুতে একটা বিদেশী ভাব আছে; মনে হয় ওদের নিজের দেশের ম্যানর হাউসকে দূর বিদেশে যতটা সম্ভব রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। গ্রাম থেকে অল্প একটু দূরে কুঠিটাও নিজের আভিজাত্য লইয়া তফাতে আছে, গ্রামটাও বিস্ময়শঙ্কান্বিত দৃষ্টিতে দূরে থেকে উহার পানে চাহিয়া আছে। কুঠির পরেই 'জিরাৎ' অর্থাৎ খাস আবাদী বিঘা শতেকের এক চাকলা ক্ষেত বাদ দিয়া আমলাদের বাসা। সব মাটির; এক জেলা সহরে গোটাকতক বাড়ি; আর এখানে ওখানে নীলকুঠিয়ালদের আস্তানা ছাড়িয়া সে যুগে এ-প্রান্তে কোঠাবাড়ির চলন ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কুঠির সর্বোচ্চ আমলা হিসাবে মধুসূদনের বাসার কতকগুলা দেয়াল কাচা ইটের, সেই একটা মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য সে যুগে।

আমলাদের পিছনেই বামহন্-টুগি অর্থাৎ ব্রাহ্মণপাড়া—কৌশল্যা, তুলারমন, জানকীদের বাড়ি। মাঝে মাঝে কোথাও গয়লা পাড়া, দুসাদ পাড়া, কুর্মিধানুক পাড়া, ক্ষেত, আমবাগান—আবার ব্রাহ্মণপাড়া আরম্ভ হইয়া গেল। এরাই প্রধান এবং সংখ্যাধিক। জিরাতের বাঁ দিক ঘেষিয়া যে রাস্তাটা আমলাপাড়ায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই একপাশে, অর্থাৎ কুঠির সব চেয়ে নিকটে ছুতারপাড়া আর কামারপাড়া। কুঠির দৃষ্টিতে ওদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, যন্ত্রযুগে ওরা বিশ্বকর্মার প্রতিনিধি; তাই কুঠির জমিতে, কুঠির তত্ত্বাবধানে আমলাদের পাশেই ওদের বসতি।

নদীর ধারে কুঠির পাশেই হাতিশালা, তাহার পরেই হাট এবং তাহার পরেই টানা বাজার চলিয়া গিয়াছে।

মধুসূদনের বাসার সামনে পাশাপাশি দুইটা পুরান গাছ, একটা বট একটা অশ্বত্থ। এদের সুদূর-বিক্ষিপ্ত শাখাপ্রশাখার নীচে ওদিকটা, পরে জিরাতের খানিকটা, সামনের দিকটা, পরে কুঠির একটা কাঁচা রাস্তা, এই রাস্তার পরেই খানিকটা উঠান গোছের, তাহার পরেই মধুসূদনের বাসাটা। একটা বহির্বাটি, একদিকে খানকতক ঘর দুই দিকে রক, মাঝখানে একটা চৌকো উঠান। তাহার পরেই ভিতর বাড়িটা, সবই মাটির—সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

মাটির বাড়ির প্রসঙ্গে শৈলেনের একটা কথা মনে পড়িয়া যায়। ঠাকুরমার যখন অনেক বয়স—তাঁদের যুগের আর শৈলেনদের যুগের প্রভেদটা যখন নিরতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেন —"আমাদের সে সময় মাটির বাড়িতে সোনার মানুষ থাকতো, তোদের এসময় দেখছি সোনার বাড়িতে মাটির মানুষ থাকে।"

সহরের মধ্যে, চারিদিকের কোঠাবাড়ির মাঝে নিজেদের কোঠাঘরেই বসিয়া কথা হইত। শৈলেন অবশ্য ছাড়িত না, সম্পর্ক ধরিয়া বলিত —"সে মাটির বাসায় ঠাকুরদাদা ছিলেন বলে তুমি একথা বলছ ঠাকুরমা, এখানেও যদি তিনি থাকতেন, এই-তুমিই বলতে সোনায় সোহাগা হয়েছে।"

ওটা হইল ঠাট্টার কথা। যখন ভাবে শৈলেন তখন কি আর তাহার সন্দেহ থাকে ঠাকুরমার কথায়?—কী আত্মকেন্দ্রিক মানুষের যুগ!—নিজের স্বার্থের চারিদিকে পাক দিতে দিতে খর্ব হইয়া কোথায় যে মিশাইয়া যাইতেছে তাহার কি কোন হিসাব আছে?

গিরিবালার শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবী বনেদী ঘরের মেয়ে। জমিদার

নয়, বনেদী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, যাঁদের মূলধন ছিল পাণ্ডিত্য, আর সম্বন্ধ ছিল যজমানসম্প্রদায়। ওঁদের বাড়িতে দোলদুর্গোৎসব ছিল, সদাব্রত পর্যন্ত ছিল, তাই নিস্তারিণী দেবীর চরিত্রের মেরুদণ্ড ছিল ধর্মনিষ্ঠা। দুইটি বংশের মধ্যেই এইদিক দিয়া একটা মিল ছিল। বোধ হয় নিস্তারিণী দেবীর দিকটা আরও একটু উজ্জ্বল ছিল—সে-যুগের বাঙালীর সাংবৎসরিক পূজায়, দানে-ধ্যানে। পাণ্ডুলের জীবনে দোল-দুর্গোৎসব অবশ্য ছিল না, এদেশে সে-যুগে প্রতিমা গড়িয়া মূর্তিপূজার প্রচলন অতটা ছিলও না, তবে সদাব্রতগোছের একটা জিনিস নিস্তারিণী দেবী বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন; খাওয়ানটা মধুসূদনের বাড়িতে একটা নিত্যকার ব্যাপার গোছেরই ছিল।

নিস্তারিণী দেবী ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী, মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি মাখান, কর্মচপল অথচ স্বল্পভাষিণী। ওঁর চরিত্রের মধ্যে দর্প আছে, কিন্তু গুমর নাই; বংশের যদি একটা নিজস্ব ধারা থাকে তো সেটি যেন ওঁকে সর্বক্ষণ বেষ্টন করিয়া আছে।

সন্তানের মধ্যে চারিটি কন্যা, দুই পুত্র। বিপিনবিহারী জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাহার পরেই কন্যা বিরাজমোহিনী, তাঁহার কোলে চণ্ডীচরণ।

গিরিবালা যখন এ বাড়িতে আসিলেন তাহার বছর তিনেক পূর্বে বিরাজমোহিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি আসিয়াছেন। ভাজ বয়সে ছোট অথচ সম্বন্ধে বড়,—বিরাজমোহিনী তাহাকে লইয়া যেন একটু দোটানায় পড়িয়াছেন। আরও মুস্কিল এইজন্য যে উনি একটু ঠাট্টা ভালবাসেন অথচ গম্ভীর—মায়ের গাম্ভীর্যটি চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছেন, বলিতেছেন—"রাগটা অবশ্য আমার দাদার উপরই বেশি হচ্ছে, উনি দু'বছর পরে জন্মালেই গোল মিটে যেত; কিন্তু তা যখন হ'ল না তখন তুমিই না হয় ওঁর দোষটা সামলে নিয়ে বছর দু'তিন

আগে জন্মাতে,—তাহ'লে গুরু হলেও অন্ততঃ সমবয়সী তো হতে পারতে।"

বিরাজমোহিনীর পরে মোতিবালা, গিরিবালার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। স্বভাবটি অত্যন্ত নরম, তাহার উপর বিরাজমোহিনী চলিয়া গেলে সংসারে মায়ের পরেই থাকেন তিনি, তাই বয়স অল্প হইলেও একটু গিন্নিবান্নির ভাব আসিয়া গিয়াছে। এখানে একথাটাও বলিয়া দেওয়া দরকার যে পাণ্ডুলে ও-জিনিসটা মেয়েদের জীবনে দুদিন আগেই আসে। অবরোধ প্রথাটা এখানে কড়া; বাঙালীদের আবার একটু বেশি করিয়া মানিতে হয়। বিবাহের বয়সের কাছাকাছি আসিলেই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, খেলাধূলা ঘোরা-ফিরার পরিধিটা হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া, বয়স্থাদের অবিচ্ছিন্ন সংসর্গে বয়সটাতে যেন অকালে রং ধরিয়া যায়।

অবরোধ একধরণের কবর, তাই দুইটার মধ্যে অনেকটা মিল আছে—অবরোধ ও ছোট-বড়র প্রভেদ মিটাইয়া দেয়, কিশোরীতে আর বর্ষীয়সীতে কোন তফাৎ রাখে না।

নরম স্বভাব বেশি স্নেহপ্রবণ হয়,—মোতিবালার স্নেহটা মানুষের উপর হইতে উপচাইয়া একটি রাঙা বিড়ালের উপর জুড়ো হইয়াছে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেই সেইটি আসিয়া কোল দখল করে।

গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ নিস্তারিণীদেবীর তৃতীয় মেয়েটিতেও লাগিয়াছে, তবে অন্যভাবে। এ মেয়েটি যেমন তীক্ষ্ণধী, তেমনি চঞ্চল।—ত্রিনয়নী সর্বত্র আছে, সবার কথায় আছে এবং সব ধরণের কথায় আছে। বাপকে পরামর্শ দেয়, মায়ের কথায় গম্ভীর ভাবে সায় দেয়, দাদা-দের কথা কাটে, বোনেদের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। মেয়েটি বিপিনবিহারীর বড় প্রিয়। বাড়িতে থাকিলে দাদার ঘাড়ে

পিঠেই তাহার জায়গা, চঞ্চল প্রাণের আবেগে ঐ কেন্দ্র থেকেই ছিটকাইয়া পড়ে মাঝে মাঝে—নিতান্ত হঠাৎ। হয়তো কামারপাড়ার সঙ্গিনীদের কথা মনে পড়িয়া গেল, ত্রিনয়নী আর বাড়িতে নাই। বাবা কুঠি থেকে ফিরিতেছেন, ত্রিনয়নী ছুটিল; একটা হাত জড়াইয়া মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরের ভারটা আলগা করিয়া দিয়া রাজ্যের গল্প করিতে করিতে আসিবে—বাড়ির সমস্ত দিনের খুঁটিনাটি খবর একটি বাকি থাকিবে না জানিতে মধুসূদনের, প্রত্যেকটির সঙ্গে থাকিবে ত্রিনয়নীর নিজের মন্তব্য—"জান বাবা? খজনী আবার শ্বশুর-বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে; এবার একটা বিহিত করো; মেয়েমানুষ শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে আসবে এ কোন দেশী কথা বাবা, এমন তো শুনিনি কোন কালে।"...কখনও হয় তো লোটনঝার খাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে, ত্রিনয়নী একলা উপভোগ করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারে না, দাদার পিঠের উপর থেকে ছুটিয়া গিয়া—সমস্ত বাড়িটায় একটা কৌতুকের হিল্লোল তুলিয়া জানান্ দিয়া আসে—"লোটনঝার পচিশটা গ্রাম হয়ে গেলো—ও ও ও..."

বিপিনবিহারী নিজেই নাকি ছেলেবেলায় এই ধরণের ছিলেন—প্রাণের প্রাচুর্য্যে সদা চঞ্চল। বোনের মধ্যে প্রাণের এই অহেতুক স্ফূর্তি তাই তাঁহার বড় ভালো লাগে। এক এক সময় বলেন—'কেন মরতে তুই মেয়ে হয়ে জন্মালি?—তুই ছেলে মানুষ করতে করতে মিইয়ে গেছিস্—ভাবতেও যেন আমার চোখ ফেটে জল আসে।"

ত্রিনয়নীর পরেই অভয়া, এখনও কোলের শিশু, এই সবেমাত্র নামকরণ হইয়াছে।

বেটাছেলের মধ্যে আরও আছেন কৈলাশচন্দ্র, মধুসূদনের ভাগিনেয়।

বিপিনবিহারির চেয়ে বছর তিন চারেকের বড়; কুঠিতে নূতন কাজ শুরু করিয়াছেন। বিপিনবিহারীর মতোই সবল সুস্থ যুবক। মধুসূদন নিজে অতি সুকুমার; সুখলালিত সেকালের বাঙালী বাবুটি। এ দেশের শক্তিচর্চার মধ্যে নিজের সেই সৌকুমার্য্যটা তাঁহার নিশ্চয়ই পছন্দ নয়, তাই ভাগনে পুত্র দুই জনকেই এই দিক দিয়া তালিম দিয়াছেন, দস্তুরমত পালোয়ান রাখিয়া।

মোটের উপর পরিবারটি বিশেষ বড় না হইলেও সবদিক দিয়া বেশ ভরাট।

গিরিবালার সবচেয়ে বেশি যাহা চোখে ঠেকিল তাহা এখানে দাসদাসীর বাহুল্য। ক'জন যে আছে তাহার ঠিক মতো হিসাব পান নাই এখনও। সব জিনিসেই এখানে চাকরদাসীর উপর নির্ভর; বাড়ির মধ্যে যে সাধারণত্ব আছে, সেটা ঐ দিকের অসাধারণত্বে পুষাইয়া গেছে।

মোহনা মধুসূদনের খাস চাকর, তাহা ভিন্ন বাড়ির জন্য একটা আছে; বাহিরের জন্য যতদূর মনে হয় একটার বেশিই আছে। এতদতিরিক্ত ঝি আছে জন তিনেক, আর রাঁধুনি ব্রাহ্মণীও আছে। প্রধানা ঝি খঞ্জনীর মা। মাছে-দুধে পুষ্ট মাঝবয়সী মানুষটা, কাজের বেশি ফোপরদালালি করিয়া বেড়ায়। বাড়িতে মুখ বুজিয়াই থাকে তবে শ্রুতির একটু বাহিরে হইলে রূপার মোটা বাজু খেলাইয়া বলে—"হাম, মাইজীকে খাবাসিন্ ছি হে, ঝাড়ু বাহারণলা নই ছি।" (আমি মাইজীর খাস চাকরাণী, ঘর ঝাঁট দেওয়া আমার কাজ নও গো।)

মধুসূদন নিস্তারিণীদেবীকে ঠাট্টা করিয়া বলেন—"তোমার পার্শ্ব-চারিণী মন্থরা।"

খজনীর মার প্রতিপত্তির আর একটা কারণ এই যে, সে সপরিবারে বাড়িটি দখল করিয়া আছে,—বাহিরে খাটে তাহার স্বামী বুধন, ভিতরে মুড়ুলি করে সে নিজে, তাহার উপর তাহার মেয়ে আছে,—খজনী; খজনীর কাজ হইতেছে কচি ছেলে-মেয়েদের আগলান। ওর কাছে এর অর্থ হাতে কিছু একটা দিয়া নিজে নিদ্রা যাওয়া, অবশ্য বাহিরে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া। শিশু যদি নিদ্রায় ব্যাঘাত দেয় তো ভয় দেখাইয়া ঠাণ্ডা করে। খজনীর হাড়কাট মোটা মোটা, রং খুব কালো, চোখ দুইটা একটু উগ্র, বড় বড় দাঁত,—সামান্য চেষ্টাতেই ছেলেপুলে ভয় পাইয়া যায়; ও ঘুমায়। এই করিয়া প্রায় দশ বৎসর চালাইয়া আসিতেছে; সাত আট বৎসরে প্রবেশ করিয়াছিল এই গৃহে, এখন তাহার বয়স সতের-আঠার। চণ্ডীচরণ হইতে নিস্তারিণীদেবীর সমস্ত সন্তানগুলিকেই আগলাইয়াছে খজনী।

খজনী, আমাদের দেশে যাদের বলে 'হুড়কো' মেয়ে—তাই; শ্বশুর-বাড়ি থাকিতে চায় না। জোরজারি করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহার পর একটু সুযোগ পাইলেই পলাইয়া আসে।

বাহির হইতে কারণটা খুবই স্পষ্ট,—বাবুরবাড়ির ভাত, তায় বাপ-মায়ের আদর, কিন্তু এইটুকুই কারণ কিনা এক একবার সন্দেহ হয় সবার। পলাইয়া আসিয়াই খজনা তাহার প্রতিপাল্য শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরে, পা ছড়াইয়া হাপুস নয়নে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে দুলিয়া দুলিয়া গানের সুরে কান্না জুড়িয়া দেয়—"শুগা গেঃ, সোনমা গেঃ, বলিন গেঃ, তোরা ছোড়কে রহবেই কেনা গে—এ—এ....” (টিয়া আমার, সোনা আমার, বোন আমার, তোকে ছেড়ে থাকব কেমন করে রে....)

নিস্তারিণীদেবী বকেন, পাড়ার মেয়েরা যাহারা থাকে উপদেশ

দেয়; গঞ্জনা দেয়; নিবারণের চেষ্টা সত্বেও ওর মা আসিয়া নিজে লাথিটা-আসটা বসাইয়া দেয়ই; সবের মাঝে খজনী শুধু আরও নিবিড়ভাবে শিশুকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরে. কান্নার কীর্তনে আরও আখর জুড়িয়া চলে।

এই হইল স্বজন-পরিজন, এ ভিন্ন পাড়াপড়শি আছে। ব্রাহ্মণের বাড়ির মেয়েরা; প্রায় সব টকটকে রং, গা-ময় উল্কি পরা, আর কম-বেশ করিয়া রূপার গহনা পরা। কথা গিরিবালা বুঝিতে পারেন না কিন্তু লাগে বড় মিষ্ট। বাংলার অনেক কথাই কানে আসে, অর্থটা মাঝে মাঝে ধরা দিয়াই যেন হাত-ফসকাইয়া যায়। গিরিবালা অর্থ ধরিবার জন্য মন দিয়া শুনেন, যেন একটা লুকা-চুরি খেলা চলিতে থাকে।

অন্য জাতের মেয়েরাও আসিয়া উঠানে বসে; দেশের তুলনায় নোংরা একটু বেশি, কিন্তু সবাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আর প্রায় সবাই বেশ সদানন্দ গোছের। একদিন একটু অন্য ধরণেরও মেয়ে দেখিলেন, যদিও এ-দেশীই। ত্রিনয়নী হঠাৎ দুপুরবেলা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"কাদের বাড়ির পাল্কী এসেছে—এ—এ..."

একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক, একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের, আর একজন চৌদ্দ-পনের বৎসরের যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিল। বেশ-ভূষা অনেকটা আলাদা,—গায়ে আঙরাখা, কাপড় পরার ঢংটাও একটু অন্যরকম, কোচা আছে তবুও অনেকটা বাঙালীর মতো। হাতে আর পায়ের পাতায় মেহেদির বুটি তোলা। গায়ে রূপার সঙ্গে এক আধটা সোনার গহনাও আছে, গড়নও অনেকটা বাঙালী-দের গহনারই মতো!—কুঠির মুন্সি কুলদীপ সহায়ের পরিবার,—স্ত্রী, পুত্রবধু আর কন্যা।

এরা মগধী অর্থাৎ পাটনা-গয়া অঞ্চলের কায়স্থ, আচার-ব্যবহারে অনেকটা মুসলমানী আভিজাত্যের ছাপ আছে। সঙ্গে বড় পানের বাটা আর সজ্জিত আলবোলা লইয়া একটি দাসীও আছে। কথাবার্তাও একেবারে অন্য ধরণের; গিরিবালা একেবারেই বুঝিলেন না। নিস্তারিণী দেবী আর বিরাজমোহিনী অবশ্য বুঝিলেন, তবে উত্তর দিয়া গেলেন মৈথিলীতেই।

অভ্যর্থনা, বিদায়, মাপিয়া-জুপিয়া অল্প কথাবার্তা—সবকিছুর মধ্যে বিধিবিধানের একটা কাঠিন্য লাগিয়া রহিল। মৈথিলী প্রতিবেশিনীরা যেমন গায়ে পড়িয়া মিশিয়া যাইতে পারে, এ তেমন নয়। মেয়েটি বয়সের কৌতূহলেই গিরিবালার গায়ে হাত দিয়া, গহনা পরীক্ষা করিয়া একটু ভাব করিবার চেষ্টা করিতেছিল, মা ছোট্ট কি একটা বলিতে গুটাইয়া বসিল।

ওরা চলিয়া গেলে গিরিবালা বড় ননদকে বলিলেন—"মেয়েটি দিব্যি; কি বললে গিন্নি ওকে গা বড়ঠাকুরঝি?"

বিরাজমোহিনীর কয়েকটা কথার সঙ্গে পরিচয় আছে, বলিলেন—"বললে 'বদ্‌তমিজি'—মানে অসভ্যতা হচ্ছে। ওরা বড্ড সভ্যভব্য একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই।"

গিরিবালা বলিলেন—"তার চেয়ে এরা বেশ; মেয়েটি কিন্তু দিব্যি ছিল।"

বোধ হয় বিদেশে বাঙালী-ঘেঁষা মেয়েটির সঙ্গে অসম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্যই ছোট গোছের দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

৪

এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে গিরিবালার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। প্রথম ছয়-সাতটা দিন কাজের গোলমাল আর তাহার জের মিটাইতে গেল। তাহার পর একটা অবসাদ আসিল সবার মধ্যেই। তাহার পর একসময় বাহিরের লোকের ভিড় আর উৎসবের কাজের ভিড় একেবারে অপসারিত হইয়া গিয়া সংসারটি যেন নিজের স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার সময় আসিল, নিজের দিকে চাহিবারও অবসর মিলিল।

গিরিবালাকে এইখানেই কাটাইতে হইবে। এই কঠিন অবরোধের মধ্যে এই গোনাগুণতি পাঁচ-সাতটি মানুষ, যাদের তিনি বোঝেন, যারা হয়তো তাঁহাকে বোঝে; তাহার পরই অপরিচিত মহাসমুদ্র! গিরিবালা যেন হাঁপাইয়া ওঠেন।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন অলস হইয়া উঠে। বোধ হয় কোন এক দুঃস্বপ্নেই গিরিবালার ঘুম ভাঙিয়া যায়, হয়তো বা বেলেতেজপুরের কোন একটা দিন স্বপ্নের মায়ায় ভাসিয়া উঠিয়া মনটাকে হঠাৎ আতুর করিয়া তোলে বিছানা ছাড়িয়া গিরিবালা জানালার কাছে গিয়া দাড়ান। জানালাও নয়, কেননা বাহিরের দিকে জানালা রাখা এখানে রেওয়াজ নয়; খুব মিহি-বুনট তারের জাল দেওয়া ঘুলঘুলি, জানালা বলিলে তাহার মর্যাদা যতটা বাড়ে তার চেয়ে জানালার মর্যাদা কমে ঢের বেশি। সেই ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া গিরিবালা বাহিরের দিকে ভীততৃষিত নয়নে চাহিয়া থাকেন এক ফালি বহির্জগতের দিকে।—অশ্বত্থতলায় কয়েকটি বালকবালিকা খেলাঘর রচনা করিতে ব্যস্ত—বেলে-তেজপুরে নিজেকে

যেমন এবং যে বয়সের বলিয়া মনে হয় সেই রকম। একটি মেয়ে ঠিক যেন নন্তীর মতো—শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, হাসি-হাসি অথচ শান্ত মুখ।…আরও দূরে জিরাতের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—তাহার পর কুঠির রাঙা ইটের উঁচু ঘরটা, মোতি-ঠাকুরঝির নিকট শোনা—নীলের গুদাম; তাহার পাশেই গুলমোহর বা রাধাচূড়ার প্রকাণ্ড গাছটা, ফুলে ফুলে রাঙা হইয়া আছে। তাহার পর সাহেবের বাড়ি, দীর্ঘ ঝাউগাছের শ্রেণী। গবাক্ষপথে ধরা যায় সামনের এইটুকু, পৃথিবীর আর সমস্তই কে যেন মুছিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।….বাড়ির উঠানে খর রৌদ্র, চোখ ঠিকরাইয়া পড়ে। তারের সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া সামনের ঐ যৎসামান্য দৃশ্যকণাটুকু কিন্তু বড় মোলায়েম। বিধাতা দয়া করিয়া যেটুকু দিলেন সেটুকু আরও দয়াপরবশ হইয়া একটু মধুর করিয়া দিলেন—একটা কুহেলীর মায়া বুলাইয়া তাহার সব রুক্ষতা মিটাইয়া দিয়া।…গিরিবালা অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকেন। জেঠামশাইয়ের উপর অভিমানে মনটা ভরিয়া উঠে; ক্রমে বাবা, জেঠাইমা, মা—সবারই উপর। "কি ব'লে আমায় এ নির্বাসনে দিলে তোমরা বাপ হ'য়ে মা হ'য়ে ?"…অভিমানটা গিয়া পড়ে স্বামীর উপরও,—"ঠাট্টা ক'রে নদীর তীরে কুঁড়ে বেঁধে দেবে বলেছিলে, তাই দাও; এত অনাদর যার বাপ-মায়ের কাছেই, তার প্রাণে সব সইবে।" আঁচল তুলিয়া অশ্রুমোচন করেন গিরিবালা।

আবার বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে; এই অবরোধের মধ্যেই যে মাধুর্য আছে, অবগুণ্ঠনকে বেড়িয়া যে মায়া আছে তাদের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হয়। এক একদিন চণ্ডীচরণ 'সীতার বনবাস' আনিয়া বসে। গিরিবালা বলেন—"দাঁড়াও ঠাকুরপো, মেজঠাকুরঝিকে তুলে নিয়ে আসি, বই শুনতে বড্ড ভালোবাসে গো। একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি।"

পাঠ চলিতে থাকে, দুইজনে বসিয়া নিস্পন্দ অভিনিবেশে শোনেন ; না-বোঝার নিশ্চিন্ততায় গিরিবালার মনে জাগিয়া ওঠে সীতরার ছবি— কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটু অবসর লইয়া বাড়িটা শান্ত হইয়া গেছে, তিনি দেয়ালে পিঠ দিয়া, পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, চণ্ডীচরণ পড়িয়া যাইতেছে। মনোমোহিনী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন কি একটা কাজে। বলিতেছেন—"ভাজকে কী পড়ে শোনান হচ্ছে চণ্ডীবাবুর—নাটক-নবেল নয় তো ?—বাবা বড্ড চটা। চণ্ডীচরণ বলিতেছেন—"হুঁ, 'সীতার বনবাস' নাটক-নবেল হ'ল !"...."সীতার বনবাসই বা কেন ? কিলো, রামচন্দ্র আর দেওর লক্ষণকে নিয়ে বনে যাওয়ার সাধ হয়েছে নাকি ?"... মনোমোহিনীদেবীর স্মৃতিটা বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। কাহারও সঙ্গে বেশি বনিত না, অথচ গিরিবালাকে অত ভালোবাসিতেন কেন ? আসিবার সময় প্রণাম করিয়া উঠিতে বুকে জড়াইয়া বলিলেন—"তোকে কি আর মিষ্টি কথা ব'লে বিদায় দিতে ইচ্ছে করে ? বাবাকে পর্য্যন্ত আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলি, তবুও একদিনের তরে তোকে একটা কড়া কথা বলেও মনের রাগ মেটাতে পারি নি।"

গিরিবালা হঠাৎ চোখে আঁচল দেন। মোতিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করেন—"ওকি বৌদি, কাঁদছ নাকি ?"

গিরিবালা যখন বললেন—"না, কাদব কেন ?...তবে এইখানটা শুনলে বড্ড কষ্ট হয় না সীতার জন্যে ? শোন না, ঠাকুরপো আবার পড়ছেন।"

বৈকালে যখন নিস্তারিণীদেবী বধূ আর মেয়েদের চুল বাঁধিতে বসেন, পাশের ব্রাহ্মণপাড়া থেকে মেয়েরা এবং কখনও কখনও দুই একজন বর্ষীয়সীও আসে। কেহ যদি না-ই আসে, দুলারমনের উপস্থিতি তো একরকম বাঁধা। ওর কোলে থাকে ওর ছোট ভাই। ফুটফুটে ছেলেটি,

কোমরে একটা ঘুনসি, গলায় মাঝে মাঝে শাদা জরি জড়ান একটা কালো সুতার মালা—এদেশের ভাষায় বলে 'বদ্ধি'। ডান বাহুতে কালো কালো কিসের বিচি একটা সুতা দিয়া বাঁধা। সমস্ত মাথায় কটা রংয়ের চুলের সঙ্গে তেঁতুলের মতো অনেকগুলি জটা। সেইগুলি দুলাইয়া দুলাইয়া ভাইটি সমস্ত উঠানটায়, ঘরের দাওয়ায় খেলা করিয়া ফিরিতে থাকে, আর দুলারমন ওঁদের চুলবাঁধার সামনে বসিয়া গল্প করিতে থাকে। যেমন হাসি-খুশিতে ভরা তেমনি জীবন সম্বন্ধে এই মেয়েটির কৌতূহল অন্য সবাইয়ের চেয়ে ঢের বেশি। বাঙালীদের বাড়িতে জীবনের যে একটা মুক্ত রূপ দেখিতে পায়, একটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়, তাহা তাহাকে আকৃষ্ট করে। পাণ্ডুলকে যতইনা কেন ভালবাসুক, পাণ্ডুল সম্বন্ধে মুখে যাই বলুক, তবু পাণ্ডুলের বাইরে যে একটা বড় জগৎ আছে এটা বোধ হয় এই মেয়েটির মতো করিয়া এখানে আর কেহ বোঝে না বা বিশ্বাস করিতে চায় না। এরা বেশ বুদ্ধিমান জাতই, কিন্তু এই মেয়েটির বুদ্ধির বিশেষত্ব এই যে সেটা শুধু অন্তর্মুখী নয় ; জানায়, পাওয়ায়, বোঝায় সেটা বাহিরের দিকে একটা প্রসার চায়।

বেশ ভালো লাগে বাঙ্গালীদের খোপা বাঁধিবার ভঙ্গিটি ; একরকম বলিতে গেলে রোজই দেখে, কিন্তু তবুও দেখায় শ্রান্তি আসে না। হাতের কাছে পাইলে ত্রিনয়নীকে লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকে, অবশ্য ত্রিনয়নীর যেদিন ফুরসৎ থাকে। বিরাজ, মোতিবালা বলেন—"আয়না দুলারমন, তোরও খোঁপা এই রকম ক'রে বেঁধে দিই।" দুলারমন একটু লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলে—"হুঁ, কিয়্যাক্ ন ?—আর বাঙালীন্ বৈন ক দাদি-ঠাম্ ঝাড়ু খাউ গ!" (হ্যাঁ, তা বৈ কি ; আর বাঙালী হয়ে ঠাকুরমার কাছে ঝাঁটা খাইগে)

সকলের সঙ্গে নিজেও হাসিতে থাকে।

নিস্তারিণী দেবীও যোগ দেন, বলেন—"ওর ঠাকুরমা বেঁচে থাকতে হবার জো আছে? ওর বাপ মায়েরা তো ভালোই; মেয়ের ইংরেজী-পড়া ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—পাগুলে এখন কোন বাপ যা করে নি। ওর ঠাকুরমাই যে…"

বিরাজমোহিনী কপট বিরক্তিতে মুখ ঝামটা দিয়া উঠেন—"মরুক না ওর ঠাকুরমা-বুড়ি বাপু, কে বেঁচে থাকতে বলছে, বেচারির খোঁপা বাঁধা বন্ধ করে?"

আবার সকলে হাসিয়া উঠে। দুলারমনও যোগদান করিয়া বাঁচে, বিবাহের কথায় সে একটু লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বলে—"যাইছি ন বুঢ়িয়াকে কহে, লাঠি লক দৌগৎ।" (যাচ্ছি বুড়িকে বলে দিতে, লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসবেখন।)

একটু সুবিধা পাইলেই বাংলার গল্প শোনে, যার কাছেই সুবিধা হয়। আজকাল গল্পগোষ্ঠী রচনা হয় গিরিবালা আর মোতিবালাকে লইয়া বেশির ভাগ। গিরিবালা একেবারে নূতন আসিয়াছেন বলিয়া ওর গল্প সব টাটকা। বাংলা ভিন্ন ওঁর গতি নাই, দুলারমন তাহাই হাঁ করিয়া শুনিয়া যায়।—কেমন দেশ ওঁদের, সাঁতরা কেমন, আসিবার পথ কেমন….

মোতিবালা যদি এক একবার মৈথিলীতে বুঝাইয়া দিতে যান তো দুলারমন ফোঁস করিয়া ওঠে—"হে, থমু হে মোতি, দুলরিও কিছু কিছু বাংলা বুঝেইছেই; ইঃ, উয়্যা একটা কাবিল্ ভৌল হ্যা।" (থামো গো মোতি, দুলারিয়াও কিছু কিছু বাংলা বোঝে; ইস্, উনিই এক বিজ্ঞ হয়েছেন!)

—অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে না বুঝুক, গল্পের স্রোতে ব্যাঘাত চায় না। গিরিবালাকে প্রশ্ন করে—"আর তুমি কোলকাত্তা দেখাইছিস্ গো বৌদি?"

—সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া মোতিবালার পানে চাহিয়া বলে—"দেখু, হম্‌হু বাংলা কম্ ন জনৈছি।" (দেখো, আমিও বাংলা কম জানি না) সঙ্গে সঙ্গেই তিন জনে হাসিয়া উঠেন। এমন নিষ্ঠাবতী শ্রোত্রী পাইয়া গিরিবালা আর প্রাণ ধরিয়া সত্য কথাটা বলিতে পারেন না, বলেন— দেখিয়াছেন বৈকি, কলিকাতা আর দেখেন নাই?

জেঠামশাই, বাবা প্রভৃতির কাছে শোনা বর্ণনাটা কাজে লাগান— সেখানে গড়ের মাঠ আছে, আজব ঘর আছে, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, পাথর দিয়া বাধান রাস্তা, জলের কল আছে, তাহাতে লোহার নলে করিয়া আপনি জল আসিয়া বাড়িতে পৌঁছিয়া যায়...

মোতিবালা বলেন—"কেন দেশের কথা আর কলকাতার কথা এত জিগ্যেস করছে জান বৌদি?—ওর বর বলছে কলকাতায় পালিয়ে কলেজে ইংরেজী পড়বে...."

দুলারমন রাগের ভান করিয়া বলে—হ হে, ডিগ্‌ডিগিয়া দ'ক কহে গেল হ্যা। আঁহা শুনে গেলি।" (হ্যাঁ গো, ঢেটরা পিটিয়ে বলতে গেছে, তুমি শুনেছ।)

মোতিবালা একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া বলেন—ঢেটরা দেবে কেন? যাব কাছে বলেছে তার কাছেই শুনেছি।"

দুলারমন আরও রাগে, বলে—"ইঃ, গাল যে করৈৎছুতি মোতি!")
ইস্ কি গালগল্পটাই যে করতে পারে মোতি!")

তাহার পর এদিকে যে ভিতবে ভিতরে হাসিটা জমিতে থাকে সেটাকে অন্য ছুতায় প্রকাশ করিবার জন্যই ঘাড়টা একটু দুলাইয়া গিরিবালাকে বলিয়া উঠে—"তুমি তোমার গোল্পো বোলো গো বৌদিদি।"

—মুখটা হঠাৎ গম্ভীর করিয়া লইয়া বলে—"আব হম্‌হু বংলেমে বাজব,—এবার হামি বাংলাতেই কোথা বোলবো।"

আবার গাম্ভীর্য ছিন্ন করিয়া হাসি উঠে।

সন্ধ্যার পর বেশ কাজ থাকে খানিকটা, বিশেষ করিয়া মধুসূদন যদি বাসায় থাকেন। তিনি থাকিলে কুলদীপ সহায় প্রভৃতি অফিসের উচ্চস্তরের কয়েকজন আমলা ও ব্রাহ্মণপাড়ার কয়েকজন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হন। বাড়ীর সামনেই প্রাঙ্গণটিতে চাকরেরা দুই তিনখানা চৌকি বিছাইয়া জায়গা করিয়া দেয়। মজলিস বসে; কুঠির বড় সাহেব ঠাট্টা করিয়া নাম দিয়াছে—'পাণ্ডৈ পার্লামেণ্ট'। চারিদিককার দৈনন্দিন খবর এইখানেই আসিয়া জড়ো হয়,—সামাজিক, রাজনৈতিক, সব রকম। ধর্মসংক্রান্ত আলোচনাও হয়, পাণ্ডুল পণ্ডিতের জায়গা। ধর্ম ভিন্ন সাহিত্য চর্চাও হয়, একদিকে কালিদাস থেকে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস পর্যন্ত আর একদিকে ফার্সি কবি হাফিজ, গালিব, ফিরদৌসী। কায়স্থরা এদেশে তখন একান্তই উর্দু ফার্সি-বিৎ, মৈথিলী-দের মধ্যেও মুসলমান যুগের অভ্যাসটা কিছু কিছু লাগিয়া আছে।

এই মজলিসের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হয় বাড়িতে, আর এটা আছে নিস্তারিণী দেবীর নিজের হাতে, খাওয়ানর আনন্দটা তাঁহার বংশগত বলিয়াই উনি আর ওখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না। লুচি, হালুয়া, কোন একটা লবণহীন তরকারি এই সাধারণ ব্যবস্থা, লোক একটু অল্প থাকিলে সময় পাইয়া অসাধারণও কিছু একটা যুক্ত হইয়া যায়—পায়স হ'ক, মালপো হ'ক, এদেশের খাবার 'পেরাকি' হ'ক। আমের সময় আম থাকে। ঘণ্টা দুই ধরিয়া নিস্তারিণী দেবী এই লইয়া ব্যাপৃত থাকেন, সঙ্গে থাকে মেয়েরা; বিরাজমোহিনীর অনুপস্থিতিতে মোতিবালা একাই।

গিরিবালা আসিয়া এইখানটিতে নিজের জায়গা করিয়া লইলেন; প্রকৃত কাজ পাইয়া যেন বাঁচিলেন। ওঁদেরও শাশুড়ি-বধূ-ননদে এই

সময়ে একটু মজলিস বসে—ওদিকে খাইয়েদের মজলিস, এদিকে জোগাড়েদের মজলিস। এরা বেলেন অথবা তরকারি কোটেন, ওদিকে রান্নার মাঝে বিরাম দিয়া নিস্তারিণী দেবী গল্প করিয়া যান, নববধূকে উপদেশ দেন, প্রয়োজন মতো দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যেই কোনটা লইয়া আলোচনা করেন। নিস্তারিণী দেবী স্বভাবত একটু গম্ভীরপ্রকৃতির এবং অল্পভাষিণী, কিন্তু এই সেবার কাজটি নাকি ওঁর বড়ই অন্তরের, তাই এই সময়টা উনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া ওঠেন।

একদিন বলিলেন—"বৌমার পাণ্ডুল কেমন লাগছে গো?"

"লাগছে তো মন্দ নয় মা, তবে আসতেই বড্ড কষ্ট; চলেছি তো চলেইছি।"

"এখন তো ভালো হয়েছে গো, আমি যখন আসি, শুধু গঙ্গার ওপার পর্যন্তই রেল হয়েছে। নৌকোয় পার হয়ে গোরুর গাড়িতে এই পঞ্চাশ-ষাট ক্রোশ পথ, ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। পাণ্ডুলই কি এমন ছিল? চারিদিকে জঙ্গল, একটা মানুষের মুখ দেখবার জো নেই, গাছে দি) বাঘ এসেছে বলে গুজব উঠতো মাঝে মাঝে, তার তুলনায় এখন তো সগ্‌গ।"

বিরাজমোহিনী লুচি বেলিতে বেলিতে মুখ তুলিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া টিপ্পনী করিলেন—"কি সগ্‌গেই টেনে এনেছ বৌকে!"

নিস্তারিণী দেবী ভাজা লুচি সাজায় তুলিতে তুলিতে বলিলেন—"তুই এখন শহরে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—আজ ডুমকা, কাল ভাগলপুর, পরশু গোড্ডা, তুই তো নাক সিটকোবিই; আমার সগ্‌গই পাণ্ডুল—এখন যা হয়েছে। কেন, মন্দই বা কি? কি গো বৌমা?"

"বেশ-ই তো মা।"

ননদ-ভাজে মৃদুহাস্যের সহিত একটু আড়ে দৃষ্টিবিনিময় হইয়া যায়।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"আরও খারাপ ছিল তোমার শ্বশুর যখন প্রথম আসেন। তখন আবার রেলের নাম গন্ধও নেই, রাস্তা পাতা হবে তার জন্যে মোটে গাছ কেটে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে...."

বিরাজমোহিনী হঠাৎ বেলন থামাইয়া বলিলেন—"মা, বৌদিকে সেই গল্পটা বল না।"

"কোনটে!"—বলিয় মেয়েরা মুখের পানে চাহিয়াই নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"যাঃ, তোদেরও যেমন, সে-গল্প নাকি আবার শোনে?"

৫

বিরাজমোহিনী দেবী ধরিয়া বসিলেন, মোতিবালাও যোগ দিলেন, নিস্তারিণী দেবীরও বিশেষ অনিচ্ছা ছিল না; একটু মৌখিক আপত্তি করিলেন, তাহার পর কড়ায় খানিকটা কাঁচা ঘি ঢালিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"উনি বাড়ি ছেড়ে যখন বেরোন তখন বয়েস মাত্র সতের বছর। তাই মাঝে মাঝে বিপিন কৈলেশকে বলেন না?—'এখনকার বাঙালী, তোরা তো বাবু হ'য়ে গেছিস; আমরা সেকালে যা করে মানুষ হয়েছি তোরা ভাবতেও পারিস না।'

সতের বছর বয়েসে একদিন বাড়িতে কাউকে না ব'লে না ক'য়ে উনি চাকরির জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওপারে তো তেমন বিশেষ হাঙ্গাম ছিল না, গরুর গাড়ির ডাক ছিল, পয়সা দিয়ে দিয়ে যতদূর ইচ্ছে চলে যাও। উনি তো সৌরাটেই যাচ্ছিলেন—বরাবর গ্যান্-ট্যাঙ্ক রোড ধ'রে..."

বিরাজমোহিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া টিপ্পনী করিলেন—"মা গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড বলতে পারেন না।"

নিস্তারিণী দেবী রাগের ভান করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছল ধরিস

তো থাক্ গল্প বাপু। মা সেকেলে মানুষ, পারে না; তোমরা এখন নাটক-নবেল পড়তে শিখেছ…"

মোতিবালা বলিলেন—"আঃ, দিদি!…বলো মা!"

নিস্তারিণী দেবী বলিতে লাগিলেন—"যাচ্ছিলেন মীরাটেই. ফৌজের আফিসে চাকরির আশা পেয়ে, পথে একটি বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল; তিনি বললেন—তিরহুতে নীলকুঠিতে তাঁর এক আত্মীয় কাজ করেন, যদি উনি চাকরি করতে চান্ তো চিঠি দিতে পারেন। মীরাট অনেক দূর. উনি রাজি হ'য়ে গেলেন। সেই মানুষটির সঙ্গে তাঁর বাড়ি মুঙ্গেরে এলেন, তারপর সেইখানেই একটা দিন কাটিয়ে তাঁর চিঠি নিয়ে গঙ্গা পার হ'লেন।

ওদিকে দিল্লী পর্যন্ত টানা রাস্তা. লোক চলাচল বেশি, কষ্ট হয় নি। এপারে এসে একবারে আলাদা ব্যাপার;—মাঠ, কাঁচা রাস্তা, কোন্‌টে কোথায় গেছে জানা নেই, এক রাস্তাতেই বোধ হয় দু'বার তিনবার ক'রে ঘুরে হাক্লান্ত হ'য়ে সন্ধ্যের খানিকটা আগে একটা গ্রামের বাইরে এসে পড়লেন। একটা ইঁদারা ছিল, তার চাতালে বসে আছেন, দেখেন একটি আধ-বুড়ো গোছের লোক মাঠ থেকে গাঁয়ের মধ্যে আসছে। ব্রাহ্মণ দেখে রাত্তিরটার জন্যে একটু জায়গার কথা বলবেন বলবেন করছেন. একটি অচেনা দিব্যি ফুটফুটে ছেলেকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে সে নিজেই এগিয়ে এল। একটু ঠাউরে দেখে জিগ্যেস করলে—"কোথায় যাবে?" ভাষাতো বুঝেন না, আন্দাজে ধ'রে নিয়ে বললেন—"পাণ্ডুল।" পাণ্ডুল শুনে লোকটা মুখের পানে একটু স্থির হ'য়ে চেয়ে থেকে জিগ্যেস করলে—'মধুবাণী-পাণ্ডুল?'…অতশত জানতেন না, মেলা কথা কইবার ভয়ে বললেন—'হুঁ।' লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাবলে, জিগ্যেস করলে—'ওখানেই বাড়ি?' বলে ফেললেন—হু।'…

'মৈথিল ব্রাহ্মণ ?'....ও নিজের ভাষাতেই 'ছি-ছা' ক'রে জিগ্যেস করে যাচ্ছে, উনি মানেটা আন্দাজে ধরে ধরে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। দুর্বুদ্ধি,— এতেও বলে বসলেন—'হুঁ', ভাবলেন তাহ'লে রাত্তিরে থাকার ব্যবস্থাটা সহজে হ'য়ে যাবে। বলেই কিন্তু খেয়াল হ'ল মৈথিলী ব্রাহ্মণতো বলে বসলেন, কিন্তু ওদের ভাষা তো জানেন্ না। ভুলটা কি করে শুধরে নেবেন ভাবছেন, লোকটা জিগ্যেস করলে—'কোথা থেকে আসা হচ্ছে—নবদ্বীপ থেকে ?'

বিরাজমোহিনী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিলেন—"সামলাবেন কি, বাবা এতেও 'হুঁ'-ই ব'লে বসলেন। কি অলুক্ষণে 'হুঁ'-তে যে পেয়েছিল বাবাকে সেদিন !"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"উনি ভাবলেন, সুবিধেই হ'ল, এবার টের পেয়ে যাবে বাঙালী, ভাষা জানেন না ব'লে ভুলে মৈথিল ব'লে ফেলেছে। ও যে অন্য রাস্তা ধরেছে, কি করে জানবেন ?... জিগ্যেস করলে—'ন্যায় পড়তে গিয়েছিলে ?'

টুপ করিয়া ঠিক তালের মাথায় "হুঁ" বলিয়া বিরাজমোহিনী আবার এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে লুচিটা বাঁকিয়া গেল। ইহারা তিন-জনেও পূর্বাপেক্ষা অধিক জোরে হাসিয়া উঠিলেন। সবার থাকিয়া থাকিয়া হাসির মধ্যেই নিস্তারিণী বলিয়া চলিলেন—"তারপর এমন অবস্থা হ'ল, যা জিগ্যেস করে তাইতেই 'হুঁ'।....'নাম কি ?' নাম বললেন—'অমুক'।....'অমুক ঝা' ?'...'হুঁ'....'বাপের নাম কি ?'... 'অমুক'...'অমুক ঝা ?'...'হুঁ'।..."

বর্দ্ধিত হাসির মধ্যে বলিলেন—"একবার ওঁর কাছে শুনো না, হাসতে হাসতে নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। বলেন—'হেঁচকি উঠলে যেমন সামলান যায় না, তেমনি যা জিগ্যেস করছে তাইতেই টানা 'হুঁ—হুঁ' করে যাচ্ছি,

আর কিছু বেরুচ্ছেই না যেন।'…লোককে ভূতে পায়, ওঁকে সেদিন 'হুঁ'-তে পেয়ে….”

একচোট হাসিয়া লইয়া নিস্তারিণী ধীরে ধীরে আবার শান্ত হইলেন, বলিলেন—“বাবাঃ, এমন গেরোতেও পড়ে মানুষে! যাই হোক; লোকটাতো ওকে নিজের বাড়িতে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে আদরের ধুম! উনি বলেন সে আর এক বিপদ। তারপর দিন সকালে তো বেরুতে দিলে না, ভাবগতিকে বোধ হ'ল যেন আরও ক'দিন আটকে রাখতে চায়। উনিতো বিষম দুর্ভাবনায় পড়লেন। ভাষা না জানার ব্যাপারটা তো সামলে নিলেম, বললেন—একেবারে ছেলেবেলা নবদ্বীপে গিয়েছিলেন কাকার সঙ্গে, তাই নিজের ভাষা মৈথিলীটা জানে না মোটেই। কাকা মারা যেতেই চলে এসেছেন। এদের সঙ্গে সংস্কৃততেই কথাবার্তা চালাতে লাগলেন, বড় ভাইয়ের কাছে সংস্কৃতটা খুব ভালো করেই পড়া ছিল। অবস্থা-গতিকে পাকা মিথ্যোবাদী হ'য়ে যেতে হ'ল আর কি।…ওদের বাড়িটাতে কিন্তু তেমন পণ্ডিত কেউ ছিল না; এতটা সুবিধে হ'ল সংস্কৃত ছাড়া বলে না দেখে কেউ কথাবার্তা বেশি কইতে চায় না, শুধু আগলে আগলে থাকে, আর যত্নের তো হিসেবই নেই। যাওয়ার নাম করতেই কিন্তু কেমন-কেমন ভাব—'হ্যাঁ ক'রছি ব্যবস্থা, রাস্তা বড্ড খারাপ, একটা গাড়ি আর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে কতকগুলো লোক জোগাড় করছি।'….সমস্ত দিনটাতো কেটে গেল এই করে। সন্ধ্যে যত ঘনিয়ে আসতে লাগলো, ভয়ে, দুশ্চিন্তায় উনি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলেন। একটা দিন তো এরা দিলেই আটকে, মতলবখানা কি? সমস্তদিন বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দেয় নি, একটু যে লুকিয়ে খোঁজ নেবেন কি রকম লোক সে উপায় রাখে নি। দেশে এরকম অনেক ডাকাতের গপ্প শুনেছেন, সে-ধরণেরই না কি? তাহ'লে

ওঁর কাছে কি নেবে? আর সেরকম হ'তো তো প্রথম রাত্তিরেই কেন ছেড়ে দিলে? আজ তো নিশ্চয় একটু বেশি জানাজানি হ'য়ে গেল তাঁর আসার কথাটা? ··একবার ভাবছেন ডাকতের গাঁ-ই নয় তো?—অনেক সময় আবার লোক আটকে তাদের বাড়ি থেকে টাকা আদায় করে, এরকমও শোনা গেছে। না জানেন ভাষা, না চেনেন দেশ, তার ওপর কতকগুলো মিছে কথা ব'লে এক কাণ্ড করে বসে আছেন—যেন অকুল পাথারে পড়লেন। উনি বলেন—'বার-বাড়িতে আমাদের বড় ঘরটার চেয়ে একটু বড় দালান, তার পাশেই একটা খুবরি, তাইতে শুতে দিলে ওঁকে রাত্তিরে। সমস্তটা মাটির দেয়াল, তবে দালান আর ঘরের মাঝখানে যে দেয়ালটা সেটা ছ্যাঁচা বেড়ার। খেয়ে দেয়ে তো শুলেন, কিন্তু ঘুম কি আর হয়? খানিকটা যখন রাত হয়েছে, একবার বাইরে বেরুবেন, দেখেন দোরের সামনেই একটা লোক দোর আগলে খাটুলি পেতে শুয়ে আছে। ওঁর দোর খোলবার আওয়াজ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।—'কি পণ্ডিতজি?' বললেন—'এই একটু বাইরে যেতে হবে।'...'ওরে বাপরে! কক্ষণও একলা বাইরে যাবেন না এখানে, ভয়ঙ্কর গোখরো সাপের ভয়। বেশি দূরে যাবেন না; চলুন, আমি লাঠি নিয়ে দাঁড়াই।'

পাহারার গতিক দেখে ওঁর আরও আক্কেল গুম হ'য়ে গেল। বলেন—"তখন প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছি একেবারে, কিন্তু বুদ্ধিটা লোপ পায় নি। ঘরে যখন আবার ঢুকলাম, দোরটা আর দিলাম না। দিলাম না বটে, কিন্তু হুড়কো যেন লাগাচ্ছি এইভাবে বেশ জানিয়ে একটা শব্দ করলাম। তারপর ভেজান দোরটা যাতে না খুলে যায় সেইজন্যে খুব আস্তে আস্তে আমার খাটের একটা পায়ার নীচে থেকে ইটটা বের করে নিয়ে নিঃসাড়ে দোরের গায়ে লাগিয়ে দিলাম। খাটেও

যেন শুলাম এইভাবে একটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করলাম, তারপরে নীচে বসে সে যে কী ভাবে কাটাতে লাগলাম তা এক ভগবানই জানেন। কি ব্যাপার? কেন এমন ভাবে আগলাচ্ছে? পুঁজি তখন পনেরটি টাকায় এসে ঠেকেছে; একবার মনে হচ্ছে সেটা এই ঘরের মধ্যে কোনখানে পুঁতে টুতে রাখি, টাকার জন্যেই তো ভয়? একবার ভাবছি, ডেকে দিয়েই দি টাকাটা, ওদের কাড়তে আসবার আগেই। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করে, একটা মতলব খুব লাগসই মনে হ'ল, ঠিক করলাম দোরের কাছে যে লোকটা শুয়েছে তাকেই টাকাটা ঘুস দিয়ে বেরিয়ে যাব। লোকটাকে দিনে কয়েকবার দেখেছি, বাড়ির লোক নয়, এদের চাকর বা মুনিস বলে বোধ হোল। গরীব মানুষ, পনেরটা টাকা পেলে পথ ছেড়ে দিতে পারে। না দেয়, যা হবার ঐ ভাবেই হোক, আর উপায়ও নেই তো।"

হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না, করতে করতে অনেকটা রাত হ'য়ে গেল। উনি বলেন—"রাত যখন আন্দাজ বারোটা কি একটা, ঘুস খাওয়ানই ঠিক করে উনি মনে মনে দুর্গা-শ্রীহরি বলে আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন। দোরের ইটটি আস্তে আস্তে তুলেছেন, কি পাশের দালানে হঠাৎ একটা ফিস্‌ফিসিনি আওয়াজ উঠল। উনি বলেন শুনেই বুকটা এমন ধড়াস করে উঠলো যে ইটটা যে পড়ে যায় নি সে-ই আশ্চর্য্য। খুব আস্তে আস্তে ইটটা আবার ঠেকিয়ে রেখে পা টিপে টিপে এসে উনি ছ্যাঁচা বেড়ার মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। মিটমিটে একটা ডিবে জ্বলছিল, দেখলেন জন তিনেক লোকে কি পরামর্শ করছে। বুড়োকে আর একটা লোককে চিনলেন; একজন একেবারে নতুন, একমুখ দাড়ি। উনি বেড়ায় কান পেতে দাঁড়ালেন। একে ভাষা জানেন না তায় ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে, প্রথমটা তো কিছুই বুঝতে পারলেন

না। তারপর খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ কান পেতে থেকে কতকগুলো ভাঙা ভাঙা কথা ধরতে পারলেন—'এই ঘরমে....ষোল-সতর বরস.... ব্রাহ্মণ....পাণ্ডুল...নবদ্বীপ....সন্দেহ ছিলই না, পাকা হয়ে গেল যে ওঁকে নিয়ে যেন কি পরামর্শ হচ্ছে। শরীর তো ওঁর একেবারে ঝিমিয়ে এলো। তারপর একটা কথা ওঁর কানে গেল; দাঁড়িয়ে শুনছিলেন, শরীর একেবারে আলগা হয়ে বসে পড়লেন—কে একজন কী কথার উপর বলে উঠল—'কালী মাইকে কৃপা'।

উনি বলেন—'আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি ঃ মুঙ্গেরের সেই ভদ্রলোকটি বলে দিয়েছিলেন—তিরহুতের ব্রাহ্মণেরা বাঙালীর মতোই তান্ত্রিক, মাছ মাংস খায়, কোন কষ্ট হবে না। তান্ত্রিকেরা তো সুবিধে পেলে নরবলিও দেয় শোনা গেছে, আমার আর সন্দেহ রইল না যে এরা তারই ব্যবস্থা করছে। আমার যে তখন কী অবস্থা বলতে পারি না, ভয়ে গলা কাঠ হ'য়ে এসেছে, নৈলে ইচ্ছে করছে ডাক ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি, পাড়ার লোক জড়ো করি।'

ফিস্‌ফিসিনিটা আরও একটু চলল, তারপর সবাই উঠে যেন বাইরে গেল। একটু পরে দু'জন আবার যেন ফিরে এসে শুয়ে পড়লো। উনি প্রাণটি হাতে করে চুপটি করে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন,—এই বুঝি ফিরে এল, এই বুঝি ঠেললে দোর। এই করে যখন প্রায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল, নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রথমটা মনে হ'ল, দালানের লোকেদের আওয়াজ বুঝি, তারপর একটু ঠাওর করে টের পেলেন—না, দোরের কাছের লোকটারই। উনি বলেন—'তখন আর আমার ভাববার সময় নেই'। একবার শুধু কান পেতে বুঝে নিলেন—এরা ঘুমুচ্ছে কি না; শুনতে পেলেন এদেরও বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। আর দেরি করলেন না; উঠে গামছায় জড়ান কাপড়ের

পুঁটুলিটা নিয়ে, ইট সরিয়ে খুব আস্তে আস্তে দোরটা খুলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার, কোন্‌দিকে যাবেন কিছুই জানেন না, তবুও বেরিয়ে পড়লেন। দু'পা এগোন আবার পেছনে তাকান; দু'পা এগোন আবার পেছনে তাকান; এই করে করে বাড়িটা আড়াল করে ফেললেন, তারপরেই হন্‌হন্‌ করে পা চালিয়ে দিলেন। কিন্তু কপালে যার ..'

গিরিবালা শেষের দিকে লুচিবেলা থামাইয়া একেবারে উৎকণ্ঠিত হইয়া শুনিতেছিলেন, চোখ-মুখ অন্ধকার করিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—দিলে না কি বলি মা?

এঁরা তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন, ননদেরা একটু বেশি করিয়াই; বিরাজমোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ঠিক এই না হোক, এই ধরণেরই একটা কথা শুনেছিলাম কোথায়,—জামাই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আর অন্য কোন কথা না পেয়ে শ্বশুরকে জিগ্যেস্‌ করছে—'মশায়ের বিবাহ হয়েছে?'...বাবাকে বলি যদি দিতই তো তুমি কোথা থেকে আসতে বৌদি?'

হাসিটা আর একচোট আলোড়িত হইয়া উঠিল, গিরিবালাও লজ্জিত-ভাবে যোগ দিলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—'ওরকম হয় কখনও কখনও ভয়ের গল্প শুনলে, বিশেষ করে নিজের কেউ যদি থাকে তার মধ্যে।....'কপাল', বলছিলাম এইজন্যে যে খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে আবার দেখেন—সে-ই বাড়ির সামনে। যাই হোক, গুরুবল, কেউ আর উঠল না..."

গিরিবালা লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আবার এই রকম বেফাঁস বলিয়া ফেলিবার ভয়ে বলিলেন—"আর থাক মা গল্পটা, সত্যিই যেন ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে বাপু। খুন-ডাকাতির গল্প শুনতে..."

বিরাজমোহিনী আবার হাসিয়া উঠিলেন—"দেখো! মা এদিকে বিয়ের গল্প বলছেন, বৌদির কানে খুন ডাকাতির…"

আবার বেলন থামাইয়া গিরিবালা "অ্যাঃ!" করিয়া বিস্মিতভাবে শাশুড়ির মুখের পানে চাহিলেন। মোতিবালা বেলনটা চালাইতে চালাইতে হাসিতে লাগিলেন। নিস্তারিণী দেবীও হাসিয়াই বলিলেন—"বিয়ের কথাই। সেটা টের পেলেন তার পরদিন প্রায় দুপুরের কাছাকাছি।…গ্রামের বাইরে বেরিয়েই তো ছুটতে আরম্ভ করলেন। তারপর দুপুর পর্যন্ত ঐরকম,—কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকলেই পা থামিয়ে দেন, তারপর বেরিয়েই আবার ছুট! প্রাণের ভয়, সোজা নয় তো? শেষকালে যখন দুপুর হয়ে এল তখন একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। সহজ তো নয়,—সমস্ত রাত ঘুম নেই, তারপর ঐ ভয়, তারপর ঐ মেহনত। পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে গাছতলায়…."

গিরিবালা উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিলেন—"খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নি?"

বিরাজমোহিনী বেলার হাতটা একটু ত্রস্ত করিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"লুচিবেলাই শেষ হয় নি তো…"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"কেন শুধু শুধু ওঁর সব কথায়…"

বিরাজমোহিনী বলিলেন—"আচ্ছা, বলবো না মা? বাবার কি তখন খাবার দিকে মন আছে না ফুরসৎ আছে? বৌদিদির যেমন…"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়াই বলিলেন—"নিজের লোকের কষ্ট দেখলে হয় ওরকম মনে।…পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে একটা গাছতলায় শুতে যাবেন, একটা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ি যাচ্ছিল, ভেতরের লোকটা জিগোস করলে—'কোথায় যাবে তুমি বাপু?

আবার পাণ্ডুলের নাম করে?—উনি অন্য একটা জায়গার নাম করে

দিলেন; শিখেছিলেন তো কতকগুলো নাম এর মধ্যে? লোকটা জিগ্যেস করলে—'আসবে এই গাড়িতে? আমিও ঐ পথেই যাব।'

বলে—হ্যাংলা ভাত খাবি না আঁচাব কোথায়? ··উনি আবার যাবেন না! তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা কাঁখে করে তো গিয়ে উঠলেন। উঠেই চক্ষু চড়কগাছ!"

গল্পটা জানা থাকার দরুণ—ইহারা দুইবোনে অল্প অল্প হাসির সহিত বলিয়াই চলিলেন, গিরিবালা বেলা থামাইয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—"কেন মা!"

নিস্তারিণী দেবী নূতন লুচি ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—"যাঁদের বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন তাঁদেরই লোক।"

গিরিবালা বেলনটা একেবারে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওরে বাবা! তারপর?"

"গুরুবল এই যে ও লোকটা ওঁকে দেখেনি, উনি ছ্যাঁচাবেড়ার মধ্যে দিয়ে ওঁকে দেখেছিলেন; একমুখ দাড়ি, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, এদেশের পণ্ডিতেরা যেমন পরে। প্রথম ভয়ের ভাবটা কেটে গেলে উনি বুঝতে পারলেন—ও চিনতে পারে নি। পরে অবিশ্যি কথাবার্তায় বুঝলেন—চিনতে পারবার কথাও নয় ওর। কথাবার্তা গোড়া থেকেই সংস্কৃতে হ'ল। উনি পাণ্ডুলের নামটা বাদ দিয়ে এবার আসল পরিচয়ই দিলেন, বাঙালী, এদিকে একজন আত্মীয় আছেন, তারই ওখানে যাচ্ছেন। বেশ ভাব করবার ক্ষমতা বরাবরই ছিল, খুব জমিয়ে নিলেন। তারপর ওর পরিচয় জিগ্যেস করলেন।

বললে—'আমি হ'চ্ছি পুরুতব্রাহ্মণ মুঙ্গের জেলায় অনেকগুলি যজমান আছে, তাদেরই একটির মেয়ের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে যচ্ছি।'

ওঁর কি রকম মনে হ'ল, জিগ্যেস করলেন—'ছেলে?'

'একটি বেশ ভালো ছেলে পাওয়া গেছে।'

'পাওয়া গেছে মানে?'

পণ্ডিত একটু হেসে বললে—'সে একটু গোপনীয় কথা। তা, আপনি বিদেশী, আপনার কাছে আর গোপনীয় কি?—ছেলেটি মধুবাণী-পাণ্ডুলের খুব বড় এক পণ্ডিত বংশের ছেলে। নবদ্বীপে পড়া শেষ করে ফিরছিল, তাকে আটকে ফেলা হয়েছে।'

যদিও পালিয়ে এসেছেন তবুও কথাটা শুনে যেন ওঁর কাল-ঘাম ছুটে গেল। কি বিপদেই পড়েছিলেন ভেবে গলা শুকিয়ে এল, জিগ্যেস করলেন—'জোর ক'রে বিয়ে দিত?'

পণ্ডিত বললে—'ঠিক যে বলব জোর করে তা নয়, লোভ দেখিয়ে। গঙ্গার ধারে ধারে যে জায়গাগুলো দেখছেন সেখানে ছোট ছোট জমিদার গোছের অনেক ব্রাহ্মণ আছে—মৈথিলীই, কিন্তু ওদিককার ব্রাহ্মণদের তুলনায় ছোট, তা ভিন্ন বিদ্যার চর্চাটাও ওদিককার ব্রাহ্মণদের তুলনায় ঢের কম। এরা বেশির ভাগ চাষবাস নিয়েই থাকে। এরা যদি এই রকম ছেলে পায় তো আটকে ফেলে বিয়ে দিয়ে দেয়। এই আমার অবস্থাও ঐরকম। আমার বাড়ি নিজ মিথিলায় মধুবাণীর কাছে, এদিকে বিয়ে করেছি, অনেক জমিজমা দিয়েছে টোল করে দিয়েছে, যজমান আছে বিস্তর, বেশ আছি।'

উনি জিগ্যেস করলেন—"ও করবে না আপত্তি?" বললে—'না বাবু, এমন ভুজংভাজং দিয়ে ঠিক করে নেবে,—লোভ মস্ত বড় জিনিস যে। আর ওর বাপ মা তো টের পাবে না। টের পাবে বিয়ে হয়ে গেলে, তখন আর কি করবে? এই আমি যাচ্ছি, ভেতরে ভেতরে সব খোঁজ নোব—কেমন বংশ, ছেলের গোত্র, রাশি, গণ—তারপর ফিরে এসে বলব, বিয়ে হ'য়ে যাবে ....কেন, তোমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে

তো এরকম হয়। আমি ছিলাম কিনা নবদ্বীপে বহুদিন—এইরকম ক'রে ঘরজামাই ক'রে রাখে।'

ওঁর কিরকম ঝোঁক চেপে গেল—জিগ্যেস করলেন—"যদি না মেলে?"

বললে—'ওদের বাড়িতে অনেকগুলি মেয়ে, নিজের, ভাইয়েদের, দৌহিত্রী—একটা না একটার সঙ্গে মিলে যাবেই তো; মোটের ওপর ওছেলেকে তো আর পাণ্ডুলে ফিরে আসতে হবে না।'

দুইজনেই খুব হাসতে লাগলেন। উনি বলেন—'হাসছি তো এদিকে ভয়ও লেগে রয়েছে—কি জানি, ধরবার জন্যে যদি ঘোড়া দৌড় করিয়েই দেয় ওদিকে।'....বিকেল পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়ে ওর সঙ্গ ছেড়ে দিলেন।'

গল্প শেষ করিয়া নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"এই কাণ্ড মা, বলেন বিয়ের ভয়ে আর কারুর বাড়িতে উঠি নি সেই থেকে।"

ত্রিনয়নী ঝড়ের মত না হ'ক বাতাসের বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল, চাকরানীদের ভাষায় প্রশ্ন করিল—"পুরি ভেলেই হে দুলহীন" (লুচি হ'ল গা গিন্নি?)

নিস্তারিণী দেবী বিয়ের কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিলেন—"হয়ে এল।...দাও তো বৌমা, এবার পটলগুলো ভেজে ফেলি।...তাই উনি বলেন না মাঝে মাঝে?—একালের ছেলেরা ঘর থেকে এক পা বেরুতেই হেদিয়ে পড়ে তা মানুষ হবে কোথা থেকে? আমরা সব....।"

বিপিন আসিলেন, বলিলেন—"হ'ল লুচি?"...একালের ছেলেদের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে মা?"

নিস্তারিণী দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কিছু বলি নি, যাও।... মোহনাকে পাঠিয়ে দাও, পটলভাজাটা হলেই দিয়ে দিচ্ছি"

ত্রিনয়নী প্রায় সমস্তটাই আওড়াইয়া দিল—তীক্ষ্ণ কান আছে

বলিয়াই তো আট বছরে অমন পাকা গিন্নি, দাদার ডান হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া টান দিতে দিতে বলিল—"বলেছেন, খুব করেছেন, আজকাল ছেলেরা ঘর থেকে এক পা বেরুতেই হেদিয়ে পড়ে, তা মানুষ হবে! আমিও বলছি, উঠতে বসতে বলব⋯"

৬

পরদিন সকাল বেলায় বিপিন এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

মধুসূদন বাড়ি ছিলেন না। পাণ্ডুলের অধীনে চৌদ্দটা কুঠি, পালকি করিয়া প্রায়ই তদারকে যাইতে হয়, সকালেই বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিপিন বাহিরের ঘরে নির্জনে বসিয়া নীচের পত্রখানি লিখিলেন—

কল্যাণীয়াসু—

বিরাজ, তোমার হাতে যখন এই পত্র পৌঁছুবে তখন আমি আর পাণ্ডুলে নেই। কোথায় যে আছি তা জানি না, কেন না আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় যিনি ডাক দিলেন সেই ভগবান ভিন্ন কেহই জানে না কবে কোথায় কি ভাবে থাকব। নিরাপদে থাকব কি না তাই কি জানি? শুধু ভরসা, বাবাকে যিনি সহস্র বিপদের মধ্যেও পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি আমাকেও কখন ভুলবেন না। ভোলেন, তাঁর ইচ্ছা;—বাবাও তো তাঁরই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁর সন্তান, আমি আর কার ভরসা করব?

ভাববে, দাদার হঠাৎ কেন এরকম মতিগতি হ'ল। তোমরা যেটাকে একটু বেঁকিয়ে, কদর্থ করে 'মতিগতি' বলছ, সেটাকে আমি বলব সুমতি। তোমরা এই ভাবছ, এদিকে আমি ভাবছি এতদিন আমার এ

সুমতি হয় নি কেন! তার কারণটা তলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মনে হল আমি মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। কিসের মায়া?—বাবার মায়া, মার মায়া, তোমাদের মায়া। মায়াকে তো চেনা যায় না? সে নিতান্ত অলক্ষ্যেই তার মোহ বিস্তার করে। আমাকে একটি পর একটির বাঁধনে কি করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল, টেরও পাইনি। কাল হঠাৎ যখন টের পেলাম তখন শিউরে উঠলাম। আজ সে-সব বাঁধন ছিঁড়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছি, তবুও লুকবনা, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির একটা আনন্দও আছে।

জিগ্যেস করবে হঠাৎ টের পেলাম কি করে মায়ার এ মোহের কথা? উত্তর—কাল মার কথায়—রাত্রে লুচি হল কিনা জিগ্যেস করতে যখন ভেতরে যাই। সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমার ধমনীতে বাবার দেহের রক্ত দোল খেয়ে উঠল, তেমনি কুনো-ছেলেকে নিয়ে মার মনের এই দুঃখের কথা ভাবতে আমার বিবেক যেন শত বৃশ্চিক একসঙ্গে দংশন করে দিলে। বিরাজ, মাকে এ-চিঠি দেখিও না, তাঁর বোধ হয় কষ্ট হবে। মার দোষ নেই, সব মায়েই চায় তার সন্তান স্বামীর সদগুণের অধিকারী হ'ক। তোমায় বলে বোঝাতে হবে না যে এই করেই রাজপুতদের বংশের ধারা বজায় থাকত। কিন্তু মা তো রাজপুতের মেয়ে নয়, প্রাণ ধরে মনের কথাটা বলতে পারেন নি। উনি কিন্তু বড় ভুল করেছিলেন—ইচ্ছাটা যে একটা মস্ত বড় শক্তি, এক সময় না এক সময় ঠেলে বেরিয়ে পড়বেই। সব কথা ভেবে দেখতে গেলে মা যদি কিছুদিন আগে মনের এই ইচ্ছাটা প্রকাশ করে বলতেন তো ভাল হত; কেন, তা আর বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। যাক্, আগে বা পরে যখনই প্রকাশ হোক মায়ের ইচ্ছাটা সন্তানের পক্ষে আশীর্ব্বাদ! আমি সেই আশীর্ব্বাদকে মাথায় করে বেরুলাম আজ। তাঁকে বলবে

তাঁর মুখোজ্জ্বল করে ফিরতে পারি ভালই, না পারি সেও তাঁরই আশীর্ব্বাদ।

তুমি যখন চিঠিটা পড়বে তখন আমি কোথায়? ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছে, সেই সঙ্গে এও দেখে শিউরে উঠছি যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি! পাণ্ডুলের জন্যে বড় মন কেমন করছে, জন্মভূমি! আবার কি ফিরতে পারব?…আশ্চর্য্য হচ্ছি যে বাবার বুকে কত শক্তি যে তিনি সতের বৎসর বয়সে সাঁতরা ছাড়তে পেরেছিলেন। পাণ্ডুল একরকম বিদেশ, তবুও জন্মভূমি বলে এত আপনার, আর বাবার কাছে সাঁতরা ছিল জন্মভূমি, তার ওপর স্বদেশ! আশ্চর্য্য হচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও পাচ্ছি মনে, আমি না এই বাপের সন্তান!

আমার যাওয়ার সময় বিশেষ কিছু বলবার নেই; বলবার শুধু এইটুকু যে ত্রিনয়নীটাকে তোমরা একটু দেখো। ও বড় হেদুবে, আমি আবার শীগ্‌গিরই ফিরে আসব বলে ওকে ভুলিয়ে রেখো। ও একটু চঞ্চল, সেইজন্যে আমায় সর্বদা ওকে আগলে আগলে থাকতে হ'ত। বাবাকে আর মাকে বোলো ওকে যেন কেউ কিছু না বলেন, তা হ'লে যেখানেই থাকি মনে বড় কষ্ট হবে আমার।

আর বেশি লেখার প্রয়োজন নেই, মনের ভাব সংক্ষেপে সবই জানালাম। বাবা এলে চিঠিটা দেখিও, মুখে যাই বলুন, তিনি ভেতরে ভেতরে যে উৎফুল্ল হবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাবাকে আর মাকে আমার প্রণাম জানিও, তোমরা সকলে আশীর্বাদ নিও। মাকে বোলো তাঁরই আশীর্বাদের জোরে যেন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ফিরে আসতে পারি। এবার বিদায়।

ইতি

তোমাদের দাদা

পুনশ্চ।

তোমার বৌদিদির বড় ইচ্ছা ছিল জীবচ্ছ্‌নদীর ধারে একখানি পর্ণকুটীর রচনা করে থাকে। বাবার, মার যদি মত হয় তো একটু ব্যবস্থা করে দিতে বোলো। চণ্ডী যদি সঙ্গে থাকতে চায়, থাকতে পারে।

ইতি

চিঠিখানি মুড়িয়া একখানি খামের মধ্যে বন্ধ করিলেন, তাহার পর লুকাইয়া রাখিয়া ত্রিনয়নীকে ডাক দিলেন।

আসিলে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা তিনি, বল্‌—কতগুনো গোলাবজামুন খেতে পারিস ?"

গুলাবজামুনটা ক্ষীরের শুকনো পানতুয়া, তখন এসব অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। ত্রিনয়নী একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"একশোটা।"

"একশোটা খেলে মরে যাবি, 'তিনি কোথায়'—'তিনি কোথায়'—বলে কেঁদে বেড়াতে পারবো না আমি।"

"চারে শূন্য চল্লিশটা।"

"লোটন ঝা তাহ'লে পাগুল ছেড়ে পালাবে, বলবে কোথা থেকে রাক্ষুসী এসেছে তুলহানের পেটে, আমায় শুদ্ধ খাবে।···লোকে আর তামাসা দেখতে পাবে না।"

ত্রিনয়নী রাগিয়া গেল; মাথা নাড়িয়া, দাদাকে এলোধাবাড়ি চড় মারিতে মারিতে নাকি সুরে বলিল—"যাঁও, দেঁবেন না, খাঁলি খাঁলি····"

বিপিন বলিলেন—"দেখো! আমি দেবো নাকি ?—একটা পিরেতকে (ভূতকে) মন্ত্র দিয়ে বশ করেছি; তাকে ব'লে দেবো সেই রেখে যাবে তোর জন্যে।"

"যাঁও, পিঁরেত না হাঁতি খাঁলি খাঁলি..."

হ্যাঁ রে সে এসেছে ঘরে; দেখনা তোর নাক দিয়ে খোনা খোনা কথা কইছে, নইলে তুই কি লছমনের বৌয়ের মতন গোঙা ?"

ত্রিনয়নী একটু ভাবিবার জন্য চুপ করিল, বিপিন বলিলেন—"বলে দিচ্ছি, পাঁচটার ব্যবস্থা করে দেবে, বেঁচে থাকলে আরও অনেক গোলাব-জামুন খাবি।...দেখ, কটা বেজেছে ঘড়িতে।"

"দশটা।"

"আমি খেয়ে দেয়ে ঘোড়ায় চড়ে অফিস চলে যাচ্ছি। ঠিক যখন দুটো কাঁটাই এই এক দাঁড়ির উপর এসে দাঁড়াবে—যাকে আমরা বলি একটা বেজে পাঁচ মিনিট আর পিরেতরা বলে ঘড়ি ধ'রে একটা—সেই সময় ঐ র‍্যাকেই—ঘড়ির ঠিক পেছনে একটা বাটি ক'রে পাঁচটা গোলাবজামুন আর তার উপর একটা চিঠি থাকবে; ঠিক ঐ সময় টেবিলে উঠে..."

ত্রিনয়নী বিস্মিতভাবে শুনিতেছিল, দাদার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি পারব না পিরেতের গোলাবজামুন খেতে, আমার ভয় করে।"

বিপিন বলিলেন—"খেতেই হবে যখন একবার বলে ফেলেছ; নইলে ভূতে ঘাড় মটকাবে,—দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে সে তো আর কালীঘাটের কুকুর হ'তে পারে না ?"

"আমার ভয় করবে। লক্ষ্মীদাদা, সোনাদাদা; বিপিন হম্মর, ভাইয়া হম্মর " (বিপিন আমার, ভাই আমার)

—কোমরটা জড়াইয়া ধরিল।

শেষের এগুলি একেবারে চরম অবস্থার আদর। বিপিন বলিলেন—"আচ্ছা, মোহনাকে দাঁড় করিয়ে রাখস ঘরে; বেশি ভয় করে, না হয়

তাকেই পেড়ে দিতে বলিস। কিন্তু ঠিক একটার সময়,—ভুতের একটা; মনে থাকবে তো?"

বিনয়না একটু নিরুৎসাহভাবে ঘাড় নাড়িল।

আর, একটার আগে দেখতেও যেয়ো না, আর ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানিও না। মনে থাকবে তো?"

বিনয়ন আবার বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িল।

"না মান্‌ছ্‌ কে আমার ব'য়েই গেল, পিরেতে বুঝবে।"

বেলা প্রায় দেড়টা হইবে, কি আরও কয়েক মিনিট বেশি, মোহনা এক রকম নিঃশ্বাসেই ছুটিয়া আফিসে প্রবেশ করিল। কৈলাসচন্দ্র সেরেস্তায় কাজ করিতেছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—বাবু শীগগির চলেন, বাড়িতে ভয়ানক কান্নাকাটি প'ড়ে গেছে।"

কৈলাসচন্দ্র হাতের কলম রাখিয়া দিয়া বিমূঢ় ভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"কান্নাকাটি। কেনরে?"

মোহনা যেন আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল, গুছাইয়া কিছু বলিতে পারিল না। অসংলগ্ন খানিকটা বকিয়া গিয়া বলিল—বোধ হয় 'পিরেতে' কিছু করিয়া—দিয়াছে সবাইকে, তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল—অবস্থা বড়ই খারাপ—নতুন 'বহুমা' মূর্চ্ছা গিয়াছেন, কে কাকে দেখে তাহার ঠিক নাই।

সেরেস্তার সকলে আসিয়া প্রশ্নে, অভিমতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

'পিরেত' এদের একটা মুখের বুলি—সাপে কামড়াইলেও বলে—পিরেতে কামড়াইয়াছে, গাছ থেকে পড়িয়া গেলেও বলে 'পিরেতে' ফেলিয়া দিয়াছে; কৈলাসচন্দ্র উঠিয়া কোটের বোতাম দিতে দিতে কসিয়া একটা ধমক দিলেন, বলিলেন—"গুছিয়ে বল্ কি হয়েছে; চল আয় ...কি হয়েছে বলতে বলতে চল্।"

ত্রস্তগতিতে অগ্রসর হইলেন। মোহনা বলিতে বলিতে চলিল—এই একটু আগে তিনি-দিদি আসিয়া তাহাকে বলে যে ভূতে ঠিক একটার সময় ঘড়ির পেছনে একটা বাটি করিয়া পাঁচটা গোলাব-জামুন আর একটা চিঠি রাখিয়া যাইবে। মোহনা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, জিজ্ঞাসা করে কে একথা বলিয়াছে।" তিনি-দিদি বলে, সে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছে; মোহনার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। মোহনা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, কিন্তু তিনি-দিদি জোর করিয়া ঠেলিয়া টেবিলে চড়াইয়া দেয়। মোহনা তখনও বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, নামিয়া আসিতেছিল এমন সময় হঠাৎ ঘড়ির পেছনে নজর পড়িয়া যাওয়ায় দেখে সত্যই একটা কাঁসার বাটি চকচক করিতেছে। বাহির করিয়া দেখে—সত্যই পাঁচটা গোলাবজামুন আর তার উপর একটি চিঠি। তখন মোহনার সন্দেহ হইল এবং চণ্ডীচরণকে ডাকিল। চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল—বিরাজদিদির চিঠি।....বিরাজদিদিকে চিঠি দিতেই 'ভূত পড়িয়া ও দাদা গো'! বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে অন্দর থেকে সবাই ছুটিয়া আসেন—বড়মা আসিতে আসিতে পড়িয়া মূর্চ্ছা যান—আর কালবিলম্ব না করিয়া মোহনা ছুটিয়া আসিয়াছে—তিনি দিদিকে পিরেতের খাবারগুলা খাইতে মানা করিয়া.....

কৈলাসচন্দ্রের শেষের কথাগুলার দিকে মন ছিল না, বিপনের উল্লেখেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, উৎকণ্ঠিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"বিপিন!—সে আজ কুঠিতে আসে নি?"

দারুণ উদ্বেগে তাঁহার কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অথবা অবচেতনার কোন স্তরে একটা ধারণা থাকিয়া গিয়াছিল,

বিপিনবিহারী বাসাতেই আছেন। একটা আরদালিকে হুকুম করিলেন দেখতো, বিপিন কুঠিতে কোথাও আছে কি না।

এমন সময় চণ্ডীচরণ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—চেহারা প্রায় উন্মাদের ন্যায় বলিল—'কৈলাসদা, দাদা পালিয়েছেন, দিদিকে একটা চিঠি দিয়ে। বৌদি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।'

কৈলাসচন্দ্র কোনদিকে যাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া যেন একটু দোল খাইলেন তাহার পর আবার আফিসের দিকে পা বাড়াইলেন—একরকম ছুটিলেনই বলা চলে। চণ্ডীচরণকে বলিলেন—'তুই শিগগির ফিরে যা আমি ঘোড়াতে করে ছুটে আসছি।"

আফিসে প্রবেশ করিয়াই বিপিনবিহারীর নাম ধরিয়া জোরে হাঁক দিলেন। আফিসের আমলারা একটা বড় হলঘরে বসে। হলের পিছন দিকে একটা লম্বা বারান্দা আছে তাহার একদিকে একটা মাঝারি সাইজের ঘর মধুসূদনের দপ্তর অন্যদিকে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর কিছু কাগজপত্র থাকে। বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে আসা অবধি প্রায়ই আফিসে আসিতেছেন, বারান্দাতেই বসেন, কাজকর্ম দেখেন। কোন উত্তর পাওয়া গেল না, আমলাদের তরফ থেকে শুধু অপরাধ কতকগুলা উৎসুক প্রশ্ন উত্থিত হইল। কৈলাসচন্দ্র বারান্দার দিকে পা বাড়াইয়া আবার একটা হাঁক দিলেন; ছোট ঘর থেকে উত্তর আসিল—'কি বলছ দাদা?'

কৈলাসচন্দ্র থতমত খাইয়া মুহূর্তখানেক দাড়াইয়া পড়িলেন, তখনই অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"কি বলছ'। ওদিকে ."

পাশের একটি কেরানিকে বলিলেন—'ঘোড়াটা ধ'রে ছুটে গিয়ে খবর দে বিপিনবাবু আছে।"

হল অতিক্রম করিয়া বারান্দায় আসিয়া গেছেন, পিছনে

আফিসের কেরানিরা আসিতেছিল, তাহাদের নিজের নিজের কাজে যাইতে বলিয়া ছোট কামড়াটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বিস্মিতভাবে বলিলেন—"কি চিঠি দিয়েছ ? বাড়িতে খবর তুমি নাকি পালাচ্ছ ?"

বিপিন বলিলেন—"হাঁ, এই ঠিক্‌টা দিয়ে পালাব দাদা।"

এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও কৈলাসচন্দ্র হাসিয়া ফেলিলেন, সামলাইয়া লইয়া রাগতভাবেই বলিলেন—"এখনও তুমি ঠাট্টাই করছ ! এই ঠাট্টার জন্যে একদিন যে মারা যাবে কেউ না কেউ। যাও শীগ্‌গির বাড়ী যাও, সেখানে হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে।"

বিপিনবিহারী যখন বাড়ি আসিলেন, তখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। পাড়ার ব্রাহ্মণীরা অনেকে জড়ো হইয়াছিল, কামার, ছুতার পাড়া থেকেও অনেক আসিয়াছিল ; উনি যখন বাহির বাড়িতে আসিয়াছেন তখন অনেকে ফিরিয়া যাইতেছে ; দুলারমনের ঠাকুরমা বুড়ি খুব একচোট হাত নাড়িয়া ব'লল—"রে বিপিন, তোঁহু হদ্দ্‌ ক দেল্যা···ছি —ছি—ছি...আইকাল্‌কে লড়কা ! হিন্‌কা সবকে হাতসে আব লউৎ ভগ্‌বান হমসব বুঢ়িয়া-টুয়র্‌কে।" (তুইও হদ্দ করে দিলি বিপিন—আজকালকার ছেলে !—ভগবান এদের হাত থেকে আমাদের মতন বুড়ো হাবড়াদের টেনে নিন)

বাড়িতে প্রবেশ করিতে আবার একচোট গঞ্জনা হইল, পাড়ার বর্ষীয়সীদের কাছে। মোতিবালাকে লইয়া নিস্তারিণী দাওয়ায় বসিয়াছিলেন, চুপ করিয়া রহিলেন। দুঃখে অভিমানে ভার হইয়া আছে। বিরাজ বাহিরে আসিলেন—"দাদা !····"বলিয়াই চোখে অঞ্চল দিয়া আবার হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ! মোতিবালাও চোখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। নিস্তারিণী থামে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, একটু পরে শুধু আঁচলটা দিয়া দুইটা চক্ষু মুছিয়া লইলেন।

রসিকতা এতদূর গড়াইবে বিপিনবিহারী সেটা আন্দাজ করিতে পারেন নাই ;—ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া লইবার জন্য বলিলেন—"ফিরে এসেই দেখছি বেশি ফ্যাসাদ। তিনিটাকে দেখছিনা যে ?—গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে কোথায় সরল' ?"

ত্রিনয়নী গোলাবজামুনের লোভে গোড়াতেই কথাটা না বলিয়া দেওয়ার জন্য একচোট খুব বকুনি খাইয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে। ইহারও কেহ কিছু উত্তর দিলেন না। বিপিন আর একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—"বাবার মতন হ'তে গিয়ে কি বোকামিটাই করেছি।—ভাবলাম মা দুঃখ করে বলছেন..."

নিস্তারিণী দেবী মুখ খুলিলেন, একটু ঝঙ্কার দিয়াই কহিলেন—"হ'গে যা না, কাকে ভয় দেখাচ্ছিস ? যেমন গাছ তার তেমনি ডাল হবে তো ? আমি বুক বেঁধে আছি, আমায় ভয় দেখাতে হবে না। তবে এই সবই মতলব আছে পেটে পেটে তো আগে বীরত্ব দেখালেই পারতিস—রাজপুত বীর। এখন যে ঐ একটা পরের মেয়ে তিন-তিনবার মুচ্ছো গেল, যদি ..."

বিপিন একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন বলিলেন—"আবার মূর্চ্ছা গেছল। কী ফ্যাসাদ!—সেবারে জাহাজের তলায় পড়লাম, তাতেও মূর্চ্ছা গেল।"

অত দুঃখের মধ্যেও সকলে হাসিয়া উঠিলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"রঙ্গ ভালো লাগে না, উনি গোঁয়ারতুমি করে প্রাণ দিতে বসলেন, দোষ হ'ল না, যত দোষ হ'ল মুচ্ছো যাওয়ায়।"

বিপিন আস্তে আস্তে গিয়া নিস্তারিণী দেবীর পায়ের কাছে বসিলেন, পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার এমন এক-চোখোপনা ভালো দেখায় মা ?"

নিস্তারিণী দেবী একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এক-চোখোপনা ?"

বিপিন বলিলেন—"প্রাণ দিতে বসার কথা বলছ,—মূর্ছা যাওয়া কি আরও বেশি করে প্রাণ দিতে বসা নয় ? তাও তিন-তিনবার করে ! কার বকুনি খাওয়ার কথা আর কে খেয়ে মরছে—এক-চোখোমি বলব না ?"

রাগের মুখে হাসি আসিয়া পড়িলে রাগটা আরও বাড়িয়াই যায় ; উদ্গত হাসিটাকে চাপা দিয়া নিস্তারিণী দেবী বলিলেন,—"নে সর, আমার কাজ আছে ; উনি এসে একটা বিহিত করুন, আমার আর সয় না"।

৭

পরদিন মধুসূদন আসিলেন, সব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তা তুমি একালের ছেলের অপবাদ দিয়ে ওকে ঠাট্টা করতে গিয়েছিলে কেন ? তুমিই বলো না।"

নিস্তারিণী দেবী মুখ নাড়া দিয়ে উঠিলেন—"অমনি বাপে-বেটায় একদিকে হ'য়ে গেলেন। কলিতে বিচার তো নেই' আসকারা দিয়ে দিয়ে যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটাবেন সেদিকে হুঁস নেই। আমি না হয় একটু ঠাট্টাই করেছিলাম, কথার মাথায় এক-আধটা ও রকম বলে না লোকে ? তাই বলে⋯"

মধুসূদন স্মিতদৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতে-ছিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—"ও ও তো ঠাট্টাই করেছে।"

নিস্তারিণী দেবীর' হুঁস হইল ; নিজের তর্কের দুর্বলতায় ক্ষণমাত্র থতমত খাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন, তাহার পর আবার রাগিয়া বলিলেন—"আমার ঠাট্টা আর ওর ঠাট্টা সমান হ'ল ?—বিদকুটে ঠাট্টার চোটে বাড়িতে হুলুস্থূল...."

মধুসূদন আবার সেই ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"তার মানে ওর ঠাট্টাটা তোমার ঠাট্টার চেয়ে ভালো হয়েছে ; তুমিই ভেবে দেখো না।"

"বেশ, হয়েছে তো থাক্, আর বলতে যাচ্ছি না কারুর কাছে।"

—রাগতভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। ফিরিয়া বলিলেন—"কিন্তু কথাটা তো আমার নয়, তোমারই ; তুমিই তো আপশোষ কর—আজকালকার ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরুতে চায় না, অথচ আমি সতের বছর বয়সে..."

হঠাৎ মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"আহা, কি পৌরুষই হয়েছিল।—বাপ, মা, ভাই, বোন,—সবাইকে কাঁদিয়ে..."

মধুসূদন বেশ ভালোভাবেই হাসিয়া ফেলিলেন ; নিস্তারিণী দেবী আবার চলিয়া যাইতেছিলেন, বলিলেন—"শোনো।"

ফিরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন—"তেতেপুড়ে এলাম আমি, মাথা গরম হ'ল তোমার,—কাল যে কথা নিয়ে একালের ছেলেদের ঠাট্টা করেছ, আজ ঠিক সেই কথা নিয়ে একালের বুড়োকে ধমক দিচ্ছ।... ঠাট্টা থাক্, কথাটা যখন তুললে তখন বলি,—আজকালকার ছেলেদের দোষটা জানি বলেই আমি বিপিনকে অন্যভাবে তোয়ের করেছি। যা যা দোষ অন্যের মধ্যে দেখেছি সে-সব যাতে বিপিনের মধ্যে না এসে পড়ে সেদিকে আমার কড়া নজর আছে,—ও আজকালকার ছেলেদের মতন দুর্বল নয়, প্যান্‌পেনে নয় ; মুখচোরা নয় ; কুনো তো ওর অতি বড় শত্রুও ওকে বলতে পারবে না, সেদিকে ওকে আমি অবাধ মুক্তি দিয়ে দিয়েছি।

আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার দরকার ছিল: বেরিয়ে পড়েছিলাম। ...টিফিনের সময় স্কুল থেকে এলাম ভাত খেতে, সময়ে তো প্রায় জুটত না। ভাত কমই ছিল, অন্য দিনও যে রোজই বেশি থাকতো তা নয়, অবস্থা বুঝে চাওয়ার অভ্যেসটা আর হতে পারে নি। সেদিন কিন্তু ক্ষিদেটা বেশি পেয়েছিল, হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আর দু'টি আছে মা?" জিগ্যেস করেই ভুলটা বুঝতে পারলাম যে আমায় দিতে হলে মা'র আর একমুঠোও থাকবে না। কিন্তু তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কথাটা—চেয়ে দেখি মা'র মুখ যেন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এখনও সেই মুখটা মনে পড়ছে মায়ের, ছেলের কাছে এমন লজ্জার ভাব দ্রোণাচার্যের মায়েরও বোধ করি হয় নি। কী যে বলবেন ঠিক করতে না পেরে একটু এদিক ওদিক চাইলেন, তারপর বললেন—"অ আমার পোড়া কপাল, তোর আজ বড্ড দেরি হ'ল দেখে ওঁকে খাইয়ে আগেই আমি খেয়ে নিয়েছি। তোর বোধ হয় পেট ভরলো না; ওবেলা সকাল সকাল বেঁধে দো'বখন"।...মা মুখে মোটা করে পান রেখে আগে থাকতেই প্রমাণ সাজিয়ে রেখেছিলেন, মুখের ভাবটা সামলে নিয়ে ভালো করে পান চিবুতে লাগলেন।...এত বড় দুঃখের প্রবঞ্চনা কেউ কখনও বোধ হয় করে নি,—ছেলে খায় নি, মা খেয়ে বসে আছে—মা আমায় এইটে বিশ্বাস করাতে চাইলেন। ওঁর মুখের পানকে আমি খুবই চিনতাম—ওটা ছিল ওঁর প্রতিবেশী ঠকানে, সেদিন মাকে আমাকেও ঐ দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করতে হ'ল ....আমি ভেবেছিলাম এনট্রেনসটা পাশ করেই বেরুব; তখন আর মাস-পাঁচেক আছে। কিন্তু আর উৎসাহ রইল না, তার পর দিনই বেরিয়ে পড়লাম।"

হঠাৎ কি কথা বলিতে যেন কি কথা আসিয়া পড়িল, মধুসূদন একটু অন্যমনস্ক হইয়া নিজের মনেই বলিলেন—"লক্ষ্মী যদি নিজে গরীব হয়ে

পড়েন তো যে রকম হওয়া সম্ভব, মা ছিলেন ঠিক তাই,—তাঁর সংসার ছিল—স্বামী, দুই ছেলে, এক মেয়ে; কিন্তু সংসারের জন্যে ভাড়ার ছিল না; যাও বা একটু ছিল, তাও একরকম নেড়েচেড়ে লোকঠকানোর জন্যেই। কিন্তু মা পরের কাছে কখনও দুঃখ করতেন না, বলতেন তাহলে লক্ষ্মী ছেড়ে যাবেন। দারিদ্র্যের গণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্মীকে এরকম-ভাবে আটকে রাখতে আর কেউ কখনও পেরেছে কিনা জানি না। লক্ষ্মী আর কারুর ঘরে এরকম করে পূজো পেয়েছেন কিনা তাও জানি না। লক্ষ্মীর অমর্যাদা হবে বলে মা যে কারুর কাছে হাত পাতেন না, কারুর কাছে দুঃখের কথা বলতেন না, শুধু এইটুকুই নয়—মা ছিলেন পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে আমুদে মানুষ। পানটা ছিল মায়ের বড় প্রিয় জিনিস, পেটে ভাত পড়ুক না পড়ুক, মুখে পান দিয়ে উনি পাড়াপড়শি-দের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন...হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম?"

গিরিবালার কাছে শোনা শৈলেনের, প্রসঙ্গক্রমে যখনই মায়ের কথা আসিয়া পড়িত, মধুসূদন তাহার পুণ্যস্মৃতিতে ডুবিয়া যাইতেন। কতকটা অবান্তরভাবেই তাঁহার জীবনের কোন-না কোন একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া খানিকটা বকিয়া যাইতেন—যেন একটা কিসের ঘোরে পড়িয়া গেছেন। গিরিবালা বলিতেন—"মা দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বাবা উঠোনে একটা চেয়ারে বসে বলে যাচ্ছেন, আমি ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি। দিদিশাশুড়ীর কথা শুনতে বড় ভালো লাগত। বাবাকে জিগ্যেস করতে পারতাম না, জানতাম তাঁর মনে কষ্ট হয়,—নিজের হতে যখন বলতেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতাম।" কি বলছিলেন মনে করবার জন্যে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—"হাঁ ঠিক কথা, বলছিলাম—আমার দরকার পড়েছিল, বেড়িয়ে পড়েছিলাম; মায়ের আশীর্বাদে বিপিনের ওরকম দরকার পড়ে নি।

ভগবান না করুন, যদি পড়ে কখনও দরকার, ও আজকালকার ছেলেদের মতন যাতে ঘরের কোণে না পড়ে থাকে সেইরকম ভাবেই তো গড়েছি ওকে। শুধু তাই বা কেন?—দরকার জিনিসটা মানুষের মেজাজের কথা—আজই হ'ক পরেই হ'ক, ও যদি মনে করে, আছে দরকার ওর, —পাণ্ডুলের মতন একটা ছোট জায়গায় পড়ে থেকে, নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পাচ্ছেনা, তো প'ড়বে বেরিয়ে, ওতে বারণ করবারই বা কি আছে? পুরুষ হচ্ছে আগুন, তাকে বেঁধে রাখতে যাওয়া মিছে, বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে য'দি পড়ে বাঁধা তো বুঝতে হবে সে মাটির ঢেলা।"

গিরিবালা বলেন—যতক্ষণ শাশুড়ীর কথা হচ্ছিল, মা চুপ করে দাঁড়িয়ে বেশ শুনছিলেন, শেষের কথাগুলো শুনে আবার মুখ ভার হয়ে উঠল, বললেন—'বেশ, তোমাদের সংসার নিয়ে তোমরা থাকো, আমায় বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দাও; ছেলে তোমার থাকে, চলে যায় দেখতে আসব না আমি। তোমার মনের জোর আছে, আমার নেই'; বিশেষ করে একটা পরের মেয়ে ঘরে এনে পর্য্যন্ত আমার যেন সদাই বুক ধড়ফড় করে—'কবে কি হয়ে বসবে।'

মা আর না দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে এসে আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

আমারও মনের অবস্থা যে কি হ'ল বলতে পারি না। বাবা ওঁকে এই রকম ভাবেই মানুষ করেছেন। কাজে-অকাজে শক্ত শক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতেন ওঁকে—কথা কইতে শিখুন, লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ক, ভালো-মন্দ অবস্থায় প'ড়ে বুদ্ধি খুলুক—এই ছিল বাবার ইচ্ছে। কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করবার শিক্ষা হয় নি ওঁর, এমন কি রোদে কখনও ছাতা পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে দিতেন না। ওঁর মুখেই শোনা—একবার কোথায় গেছেন, ফেরবার সময় যেমন রোদ তেমনি জোর পশ্চিমে

হাওয়া। একটা মস্ত বড় মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, জিরুবার একটু জায়গা নেই। বলেন—'আগুনের হল্কার মতন পশ্চিমে হাওয়া বুকে এসে লাগছে, তার ওপর তেমনি রোদ—তেষ্টার চোটে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে মাঠটা পেরিয়ে গ্রামে ঢুকতেই দেখেন কতকগুলো মাগী একটা ইঁদারায় জল ভরছে; আর দাঁড়াতে না পেরে তাদের কাছে জল চেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে গলগল ক'রে ঘাম হয়ে একেবারে অজ্ঞান। কাছেই একটা বটমস্থান ছিল, তাড়াতাড়ি পাড়া থেকে লোক ডেকে ওঁকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুললে—মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, হাওয়া করে অনেকক্ষণ পরে চাঙ্গা ক'রে তুললে। তারপর ছায়া পড়লে একটা গাড়ি ক'রে পাঠিয়ে দিলে। যখন পৌঁছুলেন তোর ঠাকুরদাদা বাইরেই ছিলেন, শুনে শুধু বললেন—"সদ্দিগর্মি হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি জল খেতে গিয়ে; যাক্‌ ও ভুলটা আর কক্ষনো করো না। যাও, ভেতরে গিয়ে ঠাণ্ডা হও গে।"

এই ধরণ ছিল বাবার,—ছেলের কিছু নিয়ে যে হেদিয়ে পড়া—তা ওঁর ধাতেই ছিল না। ছেলেও তেমনি হয়েছিলেন,—আমি এসেও দেখেছি, ঘোড়ায় কখনও জিন দিয়ে চড়তেন না। মার কাছে শোনা সাঁতরায় যাবার আগে পর্যন্ত ঘোড়ার খালি পিঠের ওপর চড়ে এক হাতে লাগাম আর এক হাতে ছিপটি নিয়ে তীর বেগে হাঁকিয়ে গেছেন ঘোড়াকে, বাবা বসে বসে দেখছেন। কুঠিতে কোনও বদমাইস ঘোড়া এলে সাহেব বলত সরকারের ছেলের কাছে দিয়ে এস। মা বলেন—'সামনে ঐ জিরাতে সেই সব বদমাইস ঘোড়া ছুটিয়ে সায়েস্তা করবার কি ধুম।—ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে দেখে আমার যেন বুক শুকিয়ে যেত, কম ভুগেছি ওকে নিয়ে?

গিরিবালা বলিয়া যান—"সে সব আমার আসবার আগেকার কথা,

আমায় দেখতে হয় নি। মাঝে মাঝে গল্প শুনতাম,—ভয়ও হ'ত, আবার মন্দও লাগত না,—ভাবতাম যাক কেটে তো গেছে সে সব ঝোঁক, তা ভিন্ন পাণ্ডুলে গঙ্গাও নেই যে সাঁতরার ব্যাপারটা হওয়ার ভয় আছে। সে দিন কিন্তু দরজার আড়াল থেকে বাবার মুখে কথাগুলো শুনে, আমারও যেন ভয়ে হাত পা গুটিয়ে আসতে লাগল—বাপই যদি এইরকম ভাবে বলেন তো, আজ যেটা ঠাট্টা, কাল সেটা সত্যি হতে কতক্ষণ? সমস্ত দিনটা যে আমার কি করে কাটল আমিই জানি। একে মনের এই অবস্থা, তার ওপর আর এক কাণ্ড হ'ল। মার মনটা খুবই খারাপ ছিল, ওঁকে বললেন—ঐরকম ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন, বাবাকে বললেন —বাবার ঐ কথা। রাগটা শেষকালে আমার ওপর এসে পড়ল।"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"ঐ যে কি কুক্ষণে ঠাকুরপোকে বলেছিলাম—জীবছ নদীর তীরে সবাই মিলে ঘর করে থাকতে ইচ্ছে করছে।...খুব যে বকাঝকা করলেন তা নয়, সবে নূতন এসেছি তো?—চুল বাঁধবার সময় বললেন—'বেহাই বেয়ানের শিক্ষার তো প্রশংসা করতে পারলাম না বাছা, মেয়েছেলের মুখে এইরকম কথা কখন বের করতে আছে, না মনেই কখনও ভাবতে আছে? কথায় বলে মন না, মতি ভ্রম। সীতা কি সাধ করে নদীর তীরে কুঁড়ে বেঁধেছিলেন না তাঁর অবস্থা কেউ কামনা করে?'...এইরকম আস্তে আস্তে বিনিয়ে বিনিয়ে বেশ খানিকটা বকে গেলেন।

গিরিবালা শৈলেনকে সাক্ষী মানেন—"হ্যাঁরে, নদীর তীরে কুঁড়ে বেঁধে থাকতে যাব কেন বল দিকিন? একঠায় তিন দিন পথ চলে চলে জায়গাটা বেশ ভালো লেগেছিল—ঠাকুরপোকে একটা কথার কথা বললাম—তাই নিয়ে উঠতে বসতে নাকাল হতে হবে জানলে কি তাও বলি? ভয় লেগেই ছিল মার কথা শুনে যেন আরও কাঁটা হয়ে রইলাম।

মেয়েছেলের ননদ আর শাশুড়ী নিয়ে একটা আতঙ্ক থাকেই, যার কাছে এ-কটা দিন আদরই পেয়ে এসেছি,—ভয় হ'ল—এইবার কি আসল শাশুড়ীর রূপ ধরলেন? ভয়টা জানিয়ে কারুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করি তারও উপায় নেই। অনেক ভেবে ঠাকুরপোকেই হাত করা ঠিক করলাম। দুপুরবেলা সবাই যখন ঘুমিয়েছে খজনীকে দিয়ে বাইরে থেকে ডেকে পাঠালাম, তারপর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—'তুমি গুলাবজামুন খেতে ভালবাস ঠাকুরপো?' জিগ্যেস করলেন 'কেন বল দিকিন?...বললাম—'এই এমনি, যদি খাও তো ব্যবস্থা হয়।'... ঠাকুরপো ঠায় আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর একটু হেসে বললেন—"তোমাদের দু'জনের কি হয়েছে বলো দিকিন? পরশু দাদা ভুতকে দিয়ে গুলাবজামুন আনিয়ে তিনিকে ফ্যাসাদে ফেললেন, তোমার হাতে কি পেত্নী আছে নাকি? না বাপু, দরকার নেই।'...আমার আঁচলেই একটা চার-আনি বাঁধা ছিল, খুলতে খুলতে বললাম—"ঠাট্টা নয়, এই নাও, কিনে খেও।" বললেন—'কি ব্যাপার বল তো?—এই দুপুরে গুলাবজামুন!—তোমার নিজের খেতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি?' আমি তখন ওঁর কাছে আসল কথাটা ভাঙলাম, বললাম—"তোমাকে সেই জীবছ্ নদীর তীরে ঘর করে থাকবার কথাটা তুলে নিতে হবে ঠাকুরপো, আমার ভয়ানক ভয় করছে, মা ভয়ঙ্কর চটে গেছেন; লক্ষ্মীটি, বলবে আমি বলি নি, তুমি নিজে বানিয়ে বলছ, ওঁকেও সে কথাটা বলে দেবে।"...

ঠাকুরপো চোখ দু'টো বড় বড় করে আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন—"ওরে বাবা! আমি প্রাণ গেলেও পারব না, দাদা আর মার কাছে একথা বলতে, তুমি এই বিদ্যে শেখাচ্ছ আমায়?"...দুড়্ দুড়্ করে পালিয়ে গেলেন।

একেবারে উল্টো-ফল হ'ল দেখে আমি তো আকুলপাথারে পড়লাম।

—যা হবার তা তো হয়েই ছিল, এখন ভয় হ'ল· ঠাকুরপো আবার এই কথাটা বলে দেবে। তাহলে আর আমার কিছু বাকি থাকবে না এ বাড়িতে। সে যে আমার মনের অবস্থা কি হ'ল তোকে কি বলব। সমস্ত দিন ঠাকুরপো আমায় এড়িয়ে এড়িয়ে চললেন—একবার সুবিধে মত দেখা পেলাম না যে অন্তত এবারের এ-কথাগুলো বলতে মানা করে দিই। বুকে কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছে, কাঁদতেও পারছি না; এদিকে আতঙ্ক রয়েছে—হ'ল ব'লে বাড়িতে আর একটা হৈচৈ, বাবা থাকতে থাকতেই।

বিকেলবেলা কাঁদবার একটু সুবিধে হ'ল, যেন বাঁচলাম। বেলেতেজ-পুর থেকে একটা চিঠি এল। হরিচরণের লেখা—আর সব খবরের মধ্যে খবর—বাবার ঘুড়ীটা ক'দিন থেকে খাচ্ছে না, বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচবে না।"

গিরিবালা আবার সজোরে হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"চিঠি পড়ে আমার সে কী কান্না! ত্রিনয়নী ঠাকুরঝি চিঠিটা এনে দিয়েছিলেন, অমন করে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখে দৌড়ে গিয়ে খবর দিলেন, মা, বড়ঠাকুরঝি, মেঝঠাকুরঝি ছুটে এলেন। চিঠিতে কিছু মন্দ খবর আছে কিনা দেখবার জন্যে বিরাজ ঠাকুরঝি একবার চিঠিটা মনে মনে প'ড়ে জোরে মাকে প'ড়ে শোনালেন। কাঁদবার যুগ্যি কিছু না দেখে মা আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করতে লাগলেন—'কাঁদছ কেন বৌমা, চিঠিতে কিছু তো নেই—চিঠি পেয়ে সবার জন্যে মন কেমন করছে?' মাথা নেড়ে বললাম—না, তার জন্যে নয়! মা কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বুঝিয়ে বললেন—'ঠিক তাই করছে, মন ওরকম উথলে ওঠে কখনও কখনও; তা দুঃখু কি? শীগগিরই তো যাবে মা।'

এই সময়ে বাবা আফিস থেকে এলেন, বললেন—ওকি, মা আমার

কাঁদছেন কেন ?' তিনি চিঠির কথা শুনে নিজে একবার পড়লেন, তারপর হেসে উঠে বললেন—'ধরেছি, ঘুড়ী খাওয়া ছেড়েছে বলে ঘোড়-সওয়ারের বেটির আমার শোক উথলে উঠেছে।' মা'র কাছ থেকে আমায় নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—'ঠিক করে বলবে, লুকোলে আমি রাগ করব।' আমি মুখটা বাবার বুকে লুকিয়ে মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম—'বড্ড ভালো ঘুড়ী ছিল।'

খুব একচোট হাসি প'ড়ে গেল, বাবাও একটু না হেসে পারলেন না, তারপর পাছে বেশি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি, সবাইকে একটু ধমক দিলেন। জামা জুতো যখন ছাড়াতে লাগলাম নানারকম গল্প ক'রে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন আমায়। সে-ঝোঁকটা তো সামলালাম, কয়েকদিন ধরে কিন্তু খ্যাপান উঠে গেল।"

গিরিবালা আবার হাসিয়া বলিলেন—"তা দোষও দিতে পারি না কারুর বাপু,—কোথায় চারশ কোশ দূরে ঘুড়ী খাওয়া ছেড়েছে বলে অমন হাপুসনয়নে কাঁদা—অন্য লোক হলে আমিও খ্যাপানিতে যোগ দিতুম। একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই তো মানুষের ?"

বেশ খানিকটা হাসেন গিরিবালা, তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া যান, কি একটি প্রীতির রসে সমস্ত মুখটি নরম হইয়া আসে, বলেন—"সেইবারে তোর কাকার মন দেখেছিলাম—আমায় তো—'এই বিদ্যে শেখাচ্ছ ?'—বলে অমন করে চলে গেলেন, তারপর আমার কান্না দেখে, খ্যাপানির মধ্যে ঐরকম অপ্রস্তুত হয়ে যেতে দেখে উনি ঠিক কখন মাকে গিয়ে বলেছেন যে জীবছ্ নদীর কথা উনি নিজে বানিয়ে বলেছিলেন। বোধ হয় দিন দুয়েক পরের কথা, রান্না ঘরে কি করছিলাম, মনে হ'ল যেন মা রেগে কাকে কি বলছেন। বেরিয়ে দেখি ওদিককার দাওয়ায় ঠাকুরপো দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,

আর মা বকছেন ; আমার কানে গেল—'তুই তাহ'লে বানিয়ে বলতে গেলি কেন ?—সবার কাছে মিছিমিছি নাকাল হচ্ছেন ছেলেমানুষ ..."

আমায় দেখে ঠাকুরপো প্রথমটা আরও যেন কিরকম হয়ে গেলেন, তারপর একটু ঝেঁজেই বললেন—বা-রে ঠাট্টা করব না ?—মাংনির বৌদি হতে এসেছেন !'

—বলেই লাফিয়ে মেঝে দুড়্ দুড় করে বাইরে পালিয়ে গেলেন।

পুরান কথা বলতে গিয়া গিরিবালা মাঝে মাঝে একটু করিয়া থামিয়া যান, বিশেষ করিয়া সেইসব জায়গায় যেখানে দরদটা একটু ঘন। যে প্রসঙ্গটা শেষ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে একটু ছোট্ট মন্তব্য করেন, তাহার পর আবার নূতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। বলিলেন—"মনটা ঠাকুরপোর বরাবরই এই রকম, দেখলাম কিনা এই এত বচ্ছর। বাক্, খুড়ীর দোহাই দিয়ে আর ঠাকুরপোকে মিথ্যে ও ঝোঁকটাতো এক-রকম সামলে ওঠা গেল, কিন্তু কপালে যার দুর্ভাবনা লেখা তার কোথা থেকে এসে যে জোটে বলা যায় না তো। এক ভাবনা যদি বা গেল, ভাবনা হ'ল—ঘর-পালানের বংশ—তোরা যখন হবি তখন তোদের আবার এরকম ঝোঁক হবে না তো ? মা কড়া মানুষ, তাঁরই এত ভয়, তোরা যদি আবার ওরকম হ'স তো আমার দশা কি হবে।...মাথা নেই মুণ্ডু নেই সে যে আবার কি ভাবনা ব'লে বোঝাতে পারি না. তাই কি এক আধ দিন রে ? প্রায়ই হত ভাবনা, বাইরের দিকের ঘুলঘুলিটার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবতাম।"

শৈলেনের জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়িয়া যায়, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলেন—"গেলোও কি শেষ পর্যন্ত ফলে রে ! কী যে বংশের ধারা !"

মাতা-পুত্র উভয়েই হাসিতে থাকেন।

মাসখানেক পরে বিরাজমোহিনী চলিয়া গেলেন।

বয়সে একটু বড় হইলেও সম্বন্ধে ছোট। বয়স আর সম্বন্ধ—এই দুয়ের মধ্যে একটা রফা করিয়া লইয়া উনি বাড়িতে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সাথী হইয়াছিলেন, ওঁর যাওয়ায় গিরিবালার কাছে বাড়িটা যেন অর্ধেক খালি হইয়া গেল। বাকি রহিলেন মোতিবালা, বাহিরে রহিল দুলারমন।

—দুলারমন এক একদিন দুপুরেও আসে, সেদিন নিদ্রা ছাড়িয়া বাঘ-বন্দী খেলা হয়, মোতিবালাও থাকেন, রাঙা বেড়ালটাও আসিয়া কোল দখল করে। সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলে, মাঝে মাঝে ছড়াযোগে মোতিবালার বেড়ালের আদর। একটু রঙ্গ করিবার ইচ্ছা থাকিলে খঞ্জনীকে ডাকিয়া লওয়া হয়। পালের মত মোটা কাপড়ে একটা খসখসে আওয়াজ করিতে করিতে এবং কাঁসার মল বাজাইতে বাজাইতে খঞ্জনী অভ্যাকে লইয়া উপস্থিত হয়। ঘুমের ঘোর লাগিয়া আছে, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়াই একটা হাই তোলে।

একদিন বাঘবন্দী খেলার মধ্যেই গিরিবালা বলিলেন—"এবার খঞ্জনী চলল আমাদের কাঁদিয়ে।"

খঞ্জনী উঁচু দাঁতের উপর ঠোঁট দুইটা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"হে কাহা হে কনিয়া?" (কোথায় গো কনে-বৌ!)

"শ্বশুরবাড়ি, আর কোথায়? এবার শুনছি তারা দলবল নিয়ে আসবে—তোকে বেঁধে নিয়ে যাবে।"

খঞ্জনী শাদা শাদা চোখ পাকাইয়া শরীর দুলাইয়া কতকটা ভ্যাংচাইয়া

বলিল—"হঃ, বেঁধে নিয়ে যাবে! গায় ছি কি মহিষ ছি হে?" (আমি গরু কি মহিষ গো!)

মোতিবালা ঘুরিয়া বসিলেন, ঝাঁজিয়া বলিলেন—"যাবি নি পোড়ার-মুখী?—বুড়ো বয়স পর্যন্ত পালিয়ে পালিয়ে আসবি? এদিকে আবার গুমর করা চাই—আমার শ্বশুর সমস্ত জেতের মোড়ল, বাড়িতে দুটো ধানের মড়াই, দুটো হাল, গাই, মহিষ—"

"যেনা ঝুট বজেইছি!" (যেন মিছে কথা বলি!)

"কিন্তু তোর তাতে কি—যদি রাজাই হয় তোর শ্বশুর?"

"মানা করেইছি?—রাজা হউৎ উজীর হউৎ, হাম্‌রা ছোড় দেথন্।" (মানা করছি? রাজা হোন, উজীর হোন, আমায় ছেড়ে দিন কিন্তু)

তাহার তর্কের ঢং দেখিয়া তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন, মোতিবালা বলিলেন—"কেন ছাড়বে? খরচ করে বেটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, বাপের বাড়িতে ফেলে রাখতে চাইবে কেন শুনি?"

খঞ্জনী নাক সিঁটকাইয়া আকাশে তুলিল, বলিল—বাঃ, তাহার বাপও তো খরচ করিয়াছে, সেই বা কেন বাপের বাড়ি ছাড়িতে যাইবে?

আবার হাসি পড়িয়া গেল, মোতিবালা বলিলেন—"শুন্‌ছে দুলারমন!"

দুলারমন গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞের মতো মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া কহিল—ঠিকই তো বলিয়াছে খঞ্জনী, বাপ পয়সা দিয়া জামাই কেনে, শ্বশুর পয়সা দিয়া বৌ কেনে, গায়ে গায়ে শোধ হইয়া গেল, যে যার বাড়ি বসিয়া থাকুক। দুলারমনও তো যাইবে না এবার লইতে আসিলে। যদি জবরদস্তি লইয়া যায় তো সেও পলাইয়া আসিবে।

খঞ্জনীকে প্রশ্ন করিল—"কেনা ভাগৈছে গে খঞ্জনী, বাতা দে ত।" (কি রকম করে পালাস ব'লে দেতো খঞ্জনী)

—হাসি চাপিয়া মনোযোগের ভঙ্গীতে খঞ্জনীর সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া বসিল। খঞ্জনী বলিল—"ইঃ, ছিন্‌কা বুতে হোত্যান্!" ("ইঃ, এঁর দ্বারা হবে!")

ডুলারমন বলিল—"তু কহিত" (তুই বলইতো)

খঞ্জনী বলিল—একরকম উপায় করিলে হয় না কি—উহারা সাবধান থাকে না? একবার তো টের পাইয়া রাস্তা থেকে ধরিয়া লইয়া যায়। একবার পলাইযাছিল শেষরাত্রে, বেটাছেলের মতো কাপড় পরিয়া, 'মরদাবার' (বরের) পাগড়ি আর পিরান চড়াইয়া,—হাতে তাহার লাঠিটা লইয়া। একবার পলাইতে তাহার কিছু বেগ পাইতে হয় নাই। ওর বাবা এখান থেকে ওকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া লইয়া গেল। ওর শ্বশুর খুব খুশি, 'সম্‌ধি'কে (বেহাইকে) একদিন ধরিয়া রাখিল। তাহার পরদিন রাত্রে 'সম্‌ধির' খাতিরে একটা ভোজের আয়োজন হইল। নেশারও ব্যবস্থা ছিল। যখন সবাই খাইতে বসিয়াছে, শাশুড়ি ননদ, জা—এরা সব সদরদরজা থেকে তামাসা দেখিতেছে, খঞ্জনী খিড়কি দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর বন, বাদাড়, ক্ষেত ভাঙ্গিয়া ছুট—ছুট—ছুট....

খঞ্জনী হাতটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমনভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল যে ইঁহারা সব হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া গেলেন। গিরিবালা বলিলেন—"কি গেরো বাবা। আরও অনেকদিন পরে গেছে বলেই সে বেচারারা মনের ফুর্তিতে ভোজের জোগাড় করেছে!..."

মোতিবালা বলিলেন—"যার জন্যে জোগাড় সেই রাত দুপুরে খানা খন্দর ডিঙিয়ে বাড়ি পালাচ্ছে!....মর কালামুখা—উঃ!"

—হাসি সামলাইয়া ওঠা দায় হইয়া পড়িয়াছে।

খঞ্জনী একটু চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, হাল্‌কাভাবেই কথা হইতেছিল,

কিন্তু হঠাৎ যেন স্বরটা তাহার একটু ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল—"তোঁ নেই কহ হে মোতি।"

মোতিবালা তর্কের ঝোঁকে রুখিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"কেন বলবো না আমি? তুই পালাবি আর আমার বলতেই যত দোষ?"

খঞ্জনী বলিল—পালায় সে কি নিজের জন্যে? মোতিবালা এখন বড় হইয়াছে, মাতব্বর হইয়াছে, দু'দিন পরে নিজেই শ্বশুরবাড়ি যাইবে, গরীব খঞ্জনীকে ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে, তাহার কথা না তোলাই ভালো; তবে আজ ত্রিনয়নীকে, অভয়া-বউয়াকে খঞ্জনীর সঙ্গে করিয়া দিক, সে যদি আবার পলাইয়া আসে তো তাহাকে যেন ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। মোতিকে কেন সে বলিতে যাইবে?—আর তো খঞ্জনীকে দরকার নাই তাহার; কিন্তু যখন হামাগুড়ি দিতে শিখে নাই তখন থেকে এই খঞ্জনীর কোলেই মানুষ হইয়াছে।...দুলারমন বড় হাসিতেছে এখন; শ্বশুরবাড়ি গিয়া যখন কোলের ভাইটির কথা মনে পড়িবে তখন কেমন এই হাসি মুখে লাগিয়া থাকে দেখা যাইবে; খঞ্জনীর বেলায় হাসিতে তো আর পয়সা খরচ হয় না। খঞ্জনী তো যাইবে মধুবাণী দুলারমনের শ্বশুরবাড়িতে, গিয়া বলিবে 'বউয়া'—(খোকা) —'গে দুল্‌রি, গে দুল্‌রি' বলিয়া হেদায়, খায় না, রোগা হইয়া গেছে,—খঞ্জনী দেখিবে সেসব শোনার পরও শ্বশুর-শাশুড়ির আদর কত মিষ্টি লাগে দুলারমনের...

বলিতে বলিতে খঞ্জনী হঠাৎ গিরিবালার পানে চাহিল, শাদা শাদা চোখ নাচাইয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"আর, আঁহা বড়ে হসৈছি হে কনিয়া, পরশু খিড়কি লগ কে সুগুক্ সুগুক্‌ক কনৈলইছেলেই—দুপহরিয়ামে?" (তুমি আজ বড় হাসছ গো কনে-বৌ,—পরশু দুপুরে জানলার কাছে কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল?)

সুর কাটিয়া যায় ; সবাই মেয়েছেলে,—যাহার বিবাহ হইয়াছে তাহারও, যাহার হয় নাই তাহারও বুকে ধক্ করিয়া লাগে। তবুও সহজভাবটা বজায় রাখিবার চেষ্টাই করিতে হয়, গিরিবালা একটু ধমকের সুরে বলিলেন—"তুই দেখেছিলি আমি কাঁদছিলাম!—আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!"

খঞ্জনী উত্তর দিল—"নই, কাঁহা দেখ্‌লি?" (না কোথায় আর দেখেছি?)

মোতিবালা বলিলেন—"কেঁদেছিল, এবার বাপের বাড়ি পালাবে তোর মতন।"

দুলারমন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—সে তো বলিলই, শ্বশুরবাড়ি যাইবে না ; খঞ্জনী যে মধুবাণীতে যাইবে, তাহাকে পাইবে কোথায় সে বিনাইয়া বিনাইয়া খোকার কথা বলিতে যাইবে?

খঞ্জনী চোখ নাচাইয়া বলিল—"ইঃ, যাইবে না। বর দেওর ছুটিয়া আসিয়া চ্যাং-দোলা করিয়া লইয়া যাইবে—একজন হাত ধরিবে; একজন পা ধরিবে..."

দুলারমন বলিয়া উঠিল—"গোড় ধরৈং ত তোঁহু যৈত্যা।" (পায়ে ধরলে তো তুইও যেতিস্।)

সকলেই আবার একটু হাসিয়া উঠিলেন।

কিছুদিন গেল ; বিরাজমোহিনীর অভাবটা গা সওয়া হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একদিন বামনটুলিতে মেয়েদের ঐক্যসঙ্গীত উঠিল। মোতিবালা বলিলেন—"দেখতোরে খঞ্জনী, কারুর বিয়ে নাকি? রামপিয়ারীর ছোট বোনটার হবার কথা হচ্ছিল।"

খঞ্জনী বামনটুলি পৌঁছিবার পূর্বেই ত্রিনয়নী লঘুভাবে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার স্বাভাবিক মুক্ত কণ্ঠে

বলিল—"বৌদি, তোমার দুলারমন চললেন শ্বশুরবাড়ি; দ্বিরাগমন হচ্ছে!"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিরাগমন সম্বন্ধে একটা চলতি এদেশী ছড়া সুর করিয়া আওড়াইতে আওড়াইতে আবার বোধ হয় বামনটুলির দিকেই ছুটিয়া গেল। গিরিবালা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, দাওয়ার খুঁটিটা ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিনদিন ধরিয়া জোর গান চলিল। আসন্ন বিচ্ছেদের পূর্বে দুলারমনকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। খজনীকে বলেন—"একবার ডেকে আন না খজনী? যাওয়ার আগে দেখাটা একবার হবে না?"

খজনী নিদারুণ বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করিয়া নিজের গালে একটি লঘু করাঘাত করে, বলে—"আহি গে দইয়া! হে, দুলাহ্ য়্যাল্ ছথিন্, কোনা অব্‌থিন্ দুলারমন?" (মাগো মা! ওর বর এসেছে—কেমন-করে আসবেন দুলারমন?")

"কেন,—এসেছে তো কি হয়েছে? আমাদের দেশে তো বেড়িয়ে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসে।"

খজনী এত কৌতুক বোধ করে, আর এত আশ্চর্য বোধ হয় তাহার যে মোতিবালাকে না ডাকিয়া পারে না, বলে—"শুনুহে মোতি, দুল্‌হাকে দেখা-দেখা ক' মত ঘুমৈছেই হিন্‌কা দেশমে! কহিও ন শুন্‌লে ছলি।" (একবার শোন গো মতি, বরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় এঁদের দেশে! কক্ষণও শুনিনি এমন কথা!")

—বসিয়া পড়িয়া দুলিয়া দুলিয়া এত হাসে যে চিকিৎসার দরকার হইয়া পড়ে। গিরিবালা কতকটা রাগে, কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলেন —"দাওতো পোড়ারমুখীর পিঠে গোটা কতক কিল বসিয়ে ঠাকুরঝি। মরণ!—বুড়ো মাগি, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে আসতে দোষ

নেই, কেউ যদি দু'পা হেঁটে দেখা করে তাইতেই যত দোষ হ'ল!"

অবশ্য দুলারমন আসিল দেখা করিতে, কিন্তু যে ভাবে আসিল তাহাকে চেনা দায়। একা নয়, একটী সঙ্গীতমুখর দলবেষ্টিত হইয়া, —মা আছে, কাকি আছে, পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়সী আছে, পাশে পাশে কয়েকজন সঙ্গিনীও আছে। দুলারমনের সমস্ত অঙ্গটি গোলাপী রেশমের শাড়ি, পিড়ান আর রূপার ভারী ভাড়ী গহনায় মোড়া। চোখে গাঢ় করিয়া কাজল টানা! কপালের মাঝখানে ছোট ছোট চুমকি বসান একটি ডাগর গোছের টিকুলি। কানে বেশ বড় দুইটি রূপার ঝুমকা। বেশ জবজবে করিয়া তেল মাখাইয়া এদেশী পদ্ধতিতে চুল বাঁধা; সামনের কতকগুলা চুল নামাইয়া তেল আর কি এক-রকম মসলা সহযোগে কপালের উপর অর্ধবৃত্তাকারে সাঁটিয়া বসান; মাঝখানে বিভক্ত করিয়া মেটে সিঁদুর।...অতিরিক্ত অলঙ্করণের মধ্যে এমন একটা পুতুল-পুতুল ভাব ফুটিয়াছে, দুলারমনকে যেন অনেক ছেলেমানুষ দেখাইতেছে। গিরিবালার বড অদ্ভুত বোধ হইতেছিল। এ তাহাদের রোজকার সাথী হাস্যচপলা দুলারমন নয়। একটি যেন শিশু-বধু। হঠাৎ কি মনে হইল, গিরিবালা নিস্তারিণী দেবীর কাছে সরিয়া গেলেন, চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন—"মা, সীতাও কি এই রকম ছিলেন নাকি?"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"শোন কথা বৌমার!"

দুলারমনের মা প্রশ্ন করিল—"কি হে দুলহীন?"

নিস্তারিণী দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—বৌমা জিজ্ঞেস কচ্ছেন —সীতাও এইরকম ছিলেন নাকি?...হাঁ গা, এই দেশেরই মেয়ে অন্যরকম হবেন? দেখো জ্বালা!"

দুলারমন সঙ্কুচিত হইয়া ছিলই, আরও যেন গুটাইয়া গুটাইয়া গেল। চারিদিকে যে একটা মৃদু হাসির তরঙ্গ উঠিল তাহাতে গিরিবালাও একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। সে ভাবটা কিন্তু শীঘ্রই কাটিয়া গিয়া মনটা আবার কৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠিল; এই তাহা হইলে আসল সীতার রূপ! কত তফাৎ যাত্রার দলে দেখা তাহার পরিচিতা সীতা হইতে!...অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঈষৎ তির্যক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন,—নূতনে-পুরাতনে, জানায়-অজানায় মিশিয়া কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার যেন চোখের সামনে ঘটিয়া চলিয়াছে—যাত্রার অশোকবনের কি বাল্মীকি আশ্রমের পরিচিতা সেই মা-জানকী—বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদার সুর কানে ভাসিয়া আসিতেছে....আর, সামনের এই অভিনব বেশ, অভিনব সজ্জায় দুলারমন,—এ যেন কতযুগ পূর্বে এদেশেরই প্রথায় সংঘটিত একটি বিদায় দৃশ্যকে একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়া প্রাণের কাছে আনিয়া দিল।...যেন এই সামনেই হইতেছে,—একটা বিপুল বিচ্ছেদ আর বিরহের জীবন সামনে করিয়া, দুই বিন্দু অন-পনেয় অশ্রু চক্ষুপুটে বহন করিয়া এমনি নববধূরূপে মা-জানকী পা বাড়াইলেন...স্থিতি নাই, শান্তি নাই, শুধুই চলা, শুধুই কাঁদা...মা-জানকী সরিয়া আবার দুলারমন স্পষ্ট হইয়া ওঠে, কিন্তু মা জানকী যেন বিদায়ের অশ্রু বিন্দু দুইটি দুলারমনের চক্ষে ভরিয়া একটি চিরবিষাদময় জীবনের উত্তরাধিকার দিয়া যান।....এ অশুভ কল্পনা কেন? গিরিবালার মনটা হঠাৎ টন টন করিয়া ওঠে। বেশ তো দেখিতেছিলেন—কাপড়ে-গহনায় ঢাকা তাঁহাদের প্রতিদিনের সাথী দুলারমনের নূতন রূপ কেমন অদ্ভুত লাগিতেছিল,—অদ্ভুত অথচ কত সুন্দর একটা ছবি! হঠাৎ এ অমঙ্গল চিন্তা কেন?...

নিস্তারিণী ভিতরে গেলেন, বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা আনিয়া

দুলারমনের আঁচলটি তুলিয়া ধরিয়া বলিতেছেন—"যা কেনবার ইচ্ছে টিচ্ছে কখনও হবে, কিনবি দুলারমন। তুই চললি, মোতির বৌমার…"

নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই কী যে হইল, গিরিবালা হঠাৎ চক্ষে অঞ্চল তুলিয়া একেবারে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সকলে বিস্মিতভাবে চাহিয়াই অবস্থাটা বুঝিয়া যেন কিরকম হইয়া গেল। দুলারমন আঁচলটা নিস্তারিণী দেবীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া আরক্তমুখে নতনয়নে দাঁড়াইয়াছিল। ক্রন্দনের শব্দ কানে যাইতেই একবার চোখ তুলিয়া গিরিবালার পানে চাহিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া মাকে জড়াইয়া গিরিবালার মতোই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"তোরা সববে ছৈড়্‌ক' কোনা রহ্‌বৈ গে মাইয়া ?" (তোদের সবাইকে ছেড়ে কেমন করে থাকব গো মা ?)

কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একজন বর্ষীয়সী বলিল—দুলারমন বাড়িতে এ পর্যন্ত কাঁদে নাই—সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া যাওয়া আরও কষ্টকর যে! ক্রমাগতই মুখে এক কথা ছিল—'নয়কী দুলহীন—নয়কী দুলহীন'…প্রথম দিনকতক মনটা থাকিবেই যে ভার ভার….

নূতন জীবন; যাহারা ছিল একেবারে পর, অচেনা তাহারা আপন হইয়া গিয়া নূতন বেদনার সৃষ্টি করিতেছে। বিরাজমোহিনী গেলেন, দুলারমন গেল। চণ্ডীচরণের সাঁতরার স্কুল থেকে নাম কাটাইয়া আনা হইয়াছিল; অত দূরে থাকিয়া পড়াশুনা করার অসুবিধা ছিল, তবে এতদিন উপায় ছিল না। এবার একটু সুবিধা হইয়াছে, বিরাজমোহিনীর শ্বশুরালয় ভাগলপুর, স্থির হইয়াছে চণ্ডীচরণ দিদির কাছে থাকিয়াই পড়াশুনা করিবে। কয়েকদিন পরে বিপিনবিহারী গিয়া তাহাকেও রাখিয়া আসিবেন। পাণ্ডুল যেন মরুভূমির মত

বিরস হইয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্তটি গুণিয়া গুণিয়া দিন কাটান,—কবে কাহার দু'ছত্র চিঠি আসিবার কথা, কবে বাড়িতে একটি ছোট উৎসব হইবে, কবে আবার নূতন করিয়া বাপের বাড়ি যাওয়ার দিন হইয়াছে—এইসব সামান্য সামান্য অবলম্বনগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা,—একটা যেন অপরিসীম ক্লান্তি আসিয়া পড়িয়াছে জীবনে।

একদিক দিয়া এই। আবার আশ্চর্যের কথা—এই বিরস জীবনেই কোথা থেকে আসিয়া পড়িতেছে মাধুর্য; নিতান্ত অলক্ষ্যে জীবন তাহাতে ধীরে ধীরে সিঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। জীবনের তো ধর্মই এই,—অতৃপ্তির পাশে কখন কিভাবে যে তৃপ্তি আসিয়া দাঁড়ায় বুঝা যায় না; কিন্তু দাঁড়ায়, আর দাঁড়ায় বলিয়াই শত দুঃখের মধ্যেও থাকে একটা সান্ত্বনা, বাঁচায় থাকে একটা আনন্দ, জীবনের গতি থাকে অটুট।

মেয়েদের জীবনে এ-ধর্ম আরও প্রবল। তাহার মধ্যে যে লতার নমনীয়তা বর্ত্তমান, অল্পকেও বেশ জড়াইয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে!...তবুও যাদের জড়ান গেল, তারা যখন যায়, তখন অনেক গুলি তন্তুই ছিন্ন করিয়া যায়। বিরাজমোহিনী আব দুলারমনের যাওয়ার মধ্যে বেদনা আরও গভীর এইজন্য যে ওঁরা দু'দিনের জন্য গেলেন না, গিরিবালা বুঝিলেন ওঁরা পাণ্ডুলের জগৎ ছাড়িয়া নিজের নিজের জগৎ রচনা করিবাব জন্য, দিনদিন সুদূর হইতে সুদূর হইয়া চিরতরেই গেলেন, পর হইয়া গেলেন; গিরিবালা যেমন আসিয়াছেন তেজপুর থেকে।...ওঁদের স্মৃতি থেকেই কি করিয়া তেজপুরের কথা সব মনে আসিয়া জড়ো হয়,—সেই থেকে মেয়েমাত্রেরই অদ্ভুত জীবনের ধারার কথা।—এই তো তিনি তেজপুর ভুলিতে বসিয়াছেন—কবার মনে পড়ে তেজপুরের কথা?—বাবা, জেঠামশাই, মা,

জেঠাইমা, সাতকড়ি; পুতি, হরিচরণ, খোকা—ক'বারই বা ভাবেন এদের কথা দিনের মধ্যে ?

আবার ভাবেন না বলিয়াই, কর্মচঞ্চলতার মধ্যে পাগুলই মনটা পরিপূর্ণ করিয়া থাকে বলিয়াই অলস মধ্যাহ্নের মুহূর্তগুলি এরা আসিয়া ভরাট করিয়া ফেলে, মধ্যাহ্নের পাণ্ডুল যেন আরও হইয়া ওঠে অসহ্য। এদিকে জীবনটাকে আরও দুর্বহ করিয়া যাওয়ার দিন যাইতেছে ক্রমাগতই পিছাইয়া। একমাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, সে একমাস তো বহুদিনই পিছনে পড়িয়া গেছে। ক্রমাগতই একটা না একটা বাধা। প্রথম প্রথম দু'একবার যাওয়ার দিন কোন কারণে বাতিল হইয়া গেলে কাছাকাছি দিন স্থির হইত। এখন সে ভাবটাও গিয়া ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে যাওয়ার দিনটা জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। দুর্গাপূজার পরেই হইল না বলিয়া শীতেও হইল না। নূতন দেশ থেকে আসিয়াছেন, এদেশের হাড়ভাঙ্গা শীতের মধ্য দিয়া চারশ' মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিবেন না। বাস্তবিক, শীত যখন পড়িল তখন মনের অভিমানকে ধরিয়া রাখিবার আর অবসরই দিল না গিরিবালাকে। রাত্রিগুলো তো এত ঠাণ্ডা যে মনে হয় ঘর ছাড়িয়া একবার বাহিরে গেলে আর ফিরিতে পারিবেন না। একদিন একটা জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ির সামনে বসিয়া নিজের মুখেই বলিয়া ফেলিলেন—"ভাগ্যিস মা এসময় যাওয়ার দিন করোনি, ইচ্ছে করে না যে এই আগুনটুকু ছেড়ে এক পা নড়ি। আবার মাঝখানে অতবড় গঙ্গা পেরোন—ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।"

শীত এখানে ফুরাইতে না ফুরাইতে দেশ হইতে পত্র আসিল যে সেখানে বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

ফাল্গুন-চৈত্রের মাঝে যাওয়া না হওয়ায়, দিন ধার্য হইল একেবারে আষাঢ়ের গোড়াগুড়ি চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে জৈষ্ঠ্যের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এদিকের সমস্ত দেশটার উপর দিয়া অতিশয় রুক্ষ পশ্চিমে হাওয়া চলে; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ঠিক 'লু' না হইলেও কাছাকাছি একটা ব্যাপার। গিরিবালা বাংলা দেশ হইতে নূতন আসিয়াছেন, অভ্যস্ত নয়, সহ্য হইবে না। দু'একবার বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত যাওয়ার কথা স্থগিত রহিল।...যখন গরম পড়িল, বাস্তবিক সে এক নূতন ধরণের গরম, দ্বিপ্রহরে দুয়ার জানালার ছিদ্রপথেও যে টুকু হাওয়া প্রবেশ করে যেন আগুনের হলকা. উত্তাপ কমিতে কমিতে রাত্রি অনেকখানি গড়াইয়া যায়। একদিন শীতকালের মতোই গিরিবালার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"ভাগ্যিস এই সময় যাওয়ার দিন ঠিক হয় নি মা।"

ওদিকে বেলেতেজপুর মনের পথেও অনেকদূর হইয়া পড়িতেছে। বাড়িব চিঠি আর মাসে একটা ক'বয়া আসে কি না আসে, অভিমান হয়, যখন মনে পড়ে; কিন্তু মনের এটা খেয়াল নাই যে তাঁহার নিজের চিঠি লেখাও কমিয়া গেছে।

সমস্ত বর্ষাটা যাওয়া হইল না। কয়েক পসলা বৃষ্টি পড়িতেই গরমটা একটু কমিল বটে; কিন্তু পাহাড়ের দিকে অতি বৃষ্টির দরুণ কমলা আর জীবছে এমন দারুণ বন্যা মামিল যে, সে দেশটাকে তো ভাসাইষা দিলই, রাস্তার কয়েকটা পুল পর্যন্ত ভাঙিয়া দিল। কমলার খাত গভীব নয়, বন্যাটা একটুতেই নামে এদিকে, কিন্তু এবার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইল। বাড়ীর উঠানে পর্যন্ত জল প্রবেশ করিয়া কয়েকদিন সবাইকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। গিরিবালা গুমর করিয়া ওঁদের 'বড়নদী' দামোদরের বন্যার গল্প করিতেন কখন কখনও,

মোতিবালা বলিতে লাগিলেন—"তুমিই সঙ্গে করে এনেছ এ বঙ্গে বৌদি।"

বন্যার জল সরিয়া গিয়া পথ-ঘাট একটু শুকাইতে না শুকাইতেই, এদিককার জল নামিল। একদিন সজল অপরাহ্নে গিরিবালার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বৌমার আসার ঠিক একবছর হ'ল।"

গিরিবালা আর মোতিবালার মধ্যে বামনপাড়ার নূতন বিবাহের কথা লইয়া গল্প হইতেছিল, তাহারই একটি ছোট বিরতির মধ্যে কতকটা অবান্তর ভাবেই নিস্তারিণী দেবী বলিলেন কথাটা।

গল্পটা ক্ষানিকক্ষণ থামিয়া গেল। হঠাৎ কথাটা বলিয়া যে ভুল হইয়া গেছে, সেটুকু বুঝিয়া নিস্তারিণী দেবীও চুপ করিয়া রহিলেন। গিরিবালা আনমনা হইয়া গেছেন, মোতিবালার দিকে চাহিয়া গল্প করিতেছিলেন, দৃষ্টিটা বিপরীতমুখী হইয়া গেছে। মোতিবালা সেই-দিকে একবার চকিতে চাহিয়া লইয়া একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া মা'কে বলিলেন—"কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে কী উবগারই করলে বৌমার!"

কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত নিস্তারিণী দেবী উত্তর দিতে পারিলেন না তাহার পর বলিলেন—"কেন, জলে তো পড়েনি। আমিও যখন প্রথম আসি দু'বছর নড়তে পারি নি। আর তখনকার কথা আর এখন-কার কথা? পাণ্ডুল তখন বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডা ছিল বললেও ভুল হয় না, এত বন-জঙ্গল . "

মোতিবালা বলিলেন—"তুমি কত বড় বীর-পুরুষের মেয়ে!"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা মুখ ঘুরাইয়া যে দু'বিন্দু জল কোন রকমে চোখে এতক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, ঝর ঝর

করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া আঁচল তুলিতে হইল। মায়ে-মেয়েতে একটু দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"যাবেন এবার; পুজোর সময়টা আর হোল না, অঘ্রান মাসে বিপিন গিয়ে রেখে আসবে, ফেরবার সময় বিরাজকে নিয়ে আসবে। তারও তো একবছর হয়ে গেল। আসল কথা করাই বা যায় কি? দেশ নয় তো, কাউকে পাঠিয়ে দিলাম, গরুর গাড়ি কি নৌকো করে নিয়ে এল—আজকাল গাড়ি হয়ে আরও সুবিধে। এখানে লোকেরও তো অভাব, কৈলেশ নিয়ে যেতে পারবেই না; এক উনি কি বিপিন। ওঁর কথা ছেড়ে দাও—নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না; এই চারবছর পরে গেছলেন দেশে, তাও বছর খানেক থেকে ভেবে ভেবে আর নিতান্ত জিদ করে যে বিয়েটা এবার দিয়ে আসবোই…

মোতিবালা বলিলেন—"ওঁরাও তো নিয়ে গেলে পারেন,—তালুই-মশাই, কি বৌদির জেঠামশাই…."

নিস্তারিণী দেবী বধূকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কথাবার্তার ছলে আসল অবস্থাটা বর্ণনা করিয়া যাইতেছিলেন, কৃত্রিম রোষের সহিত একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"কেন বল দিকিন তখন থেকে ওঁর যাওয়ার কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিস? তাড়াতে পাড়লে বাঁচিস্ নাকি? —পাঠাব না আমাদের বৌ, তা যত বড় মদ্দসবই নিতে আসুন।"

রাঙী আসিয়া মোতিবালার কোলে লুটাইয়া শুইল। কিছু তুক আছে বোধ হয়, বিড়ালটার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে পারিলে মোতিবালার কৌতুকবৃত্তিটা প্রবল হয়। একটু হাসিয়া বলিলেন—"দিদিকেও ওরা পাঠাবে না; আমিই চুপি চুপি বারণ ক'রে লিখে দেব।"

"তা দিস্, ইস্ ভয় দেখাতে এসেছে! থাক 'দিদি' তা'দের ওখানেই। তোর বিয়ে হলে তোকেও আনব না, তিনির বিয়ে হলে তিনিকেও না, অভির বিয়ে হলে তাকেও না,—পর-ভালানী মেয়ে, তার আবার গুমর! যারা আমার ঘর আলো ক'রে রাখবে, বড় বৌমা, চণ্ডীর বৌ, তাদের...."

"—ঘরে বেঁধে রাখবে।"

"রাখবোই তো।"

"শেকল দিয়ে।"

কথার রেশারেশিতে বেশ একটু হাসি পড়িয়া যায়—তিনজনের মধ্যেই। নিস্তারিণী দেবী বলেন—"হ্যাঁ, শেকল দিয়েই নয় তো কি—একটি একটি করে সোনার শেকলের পাব্ আমার হাতে আসবে; বেঁধে রাখবার জন্তেই তো এনেছি ঘরে আদর করে..."

রাঙী আরামে ঘড়্ ঘড়্ করিতেছে, গায়ে একটা লম্বা টান দিয়া মোতিবালা বলেন—"কি সর্বনেশে আদর বাবা।—ভেতরে ভেতরে এই মতলব, আর...."

এবার তিনজনে বেশ জোরেই হাসিয়া ফেলেন।

কিন্তু হাসি এক আধবারই, আর সে হাসিও একটা বেদনারই বিকৃত রূপ। দিন দিন বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রুই জমিয়া আসিতেছে। আরও একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। বসন্ত রোগও ছিল না, বন্যার বাধাও না, তবে অন্য অন্য বাধা বেশ সহজেই আসিল। একবার যাওয়ার ঠিক কয়েকদিন এদিক-ওদিকে বিপিনবিহারী অসুখে পড়িয়া গেলেন। বছর দু'একের মাথায় মাথায় একবার যাওয়া লইয়া বেহাইয়ে-বেহাইয়ে খুব চিঠিপত্র চলিল দিনকতক,—সাতকড়ির পৈতা, তা

ভিন্ন বহুদিন যান নাই গিরিবালা, সকলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ঠিক সেই সময় এখান থেকে কাহারও যাওয়া সম্ভব হইল না। ওদিককার মুশকিল হইতেছে যে কন্যার সন্তানাদি না হওয়া পর্যন্ত রসিকলাল বা অন্নদাচরণের বেহাইবাড়ি আসা চলিবে না। তখনকার দিনে এ-নিয়ম খুব কড়াকড়িভাবেই প্রতিপালিত হইত। আরও কিছু চিঠিপত্র বিনিময়ের পর স্থির হইল গিরিবালার মামা অখিলচন্দ্রই আসিয়া লইয়া যাইবেন।...একটী উৎকট প্রতীক্ষায় আর আনন্দে কতকগুলা দিন কাটিয়া গেল গিরিবালার—একটা অদ্ভুত আনন্দ—তাঁর সংসারে আসিবেন মামা—মামাকে আলাদা করিয়া নিজের সংসারে দেখা, যত্ন করা, সেবা করা...

দিন যখন সন্নিকট, আশায় আশায় মনটা উদগ্র হইয়া আছে, খবর আসিল, সাতকড়ির পৈতা আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল, তাহার মাতামহের স্বর্গলাভ হইয়াছে।

বধূর এ নিদারুণ আশা-ভঙ্গের আঘাতটুকু শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েরই বুকে খুব বাজিল। ঠিক ঐ দিনটা আর হইল না, তবে দিন দশ বারো পরেই একটা দিন ধার্য হইল, ঠিক হইল বিপিনবিহারী গিয়া রাখিয়া আসিবেন।

বিপিনবিহারী চাকরিতে এপ্রেনটিসি করিতেছিলেন, কয়েকদিন হইল মধুসূদন বাহিরের কুঠি তদারকে গেছেন; একদিন বিপিনবিহারী কুঠি থেকে একটু সকাল সকাল ফিরিয়া নিস্তারিণী দেবীকে প্রণাম করিলেন, তিনি চিবুকস্পর্শেই চুম্বন করিয়া স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে বলিলেন—"সায়েব আমায় কাজ করবার হুকুম দিয়ে দিলে মা, আসছে মাসের গোড়া থেকেই, আজ এ-মাসের হ'ল সাতাশ তারিখ, আর দিন চারেক বাকি।"

নিস্তারিণী দেবী বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করাইয়া দিলেন পরদিন হইতেই। এক সপ্তাহ পাঠের পর সত্যনারায়ণ পূজা হইবে। বাড়ীতে একটু বেশ মৃদুগোছের আনন্দগুঞ্জন উঠিল। তৃতীয় দিনে মধুসূদন ফিরিলেন। সন্ধ্যার খাওয়ার আয়োজনটা একটু বর্ধিত আকারেই চলিল কয়েকদিন। একদিন বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া মুখহাত ধুইয়া উঠানে একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। গিরিবালা জলযোগের আয়োজন করিয়াছেন, মোহনা তাওয়াদার-তামাকের বন্দোবস্তটাকে যথা-সাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে; নিস্তারিণী দেবী দাওয়ায় মোতিবালার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গিরিবালার যাওয়ার কথা তুলিলেন।—আর দিন নাই বেশী, প্রথমবার বাপের বাড়ী যাওয়া, একটু হাঙ্গাম আছে তো?....

মধুসূদন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন, মুঠায় মুখটা চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিস্তারিণী বলিয়া চলিয়াছেন—"সঙ্গে কে যাবে, একলা বিপিন কি?....

ত্রিনয়নীও ছিল! দুই বছরে তাহার মুখের বুলি আরও পাকা হইয়াছে, কপালে ভ্রূযুগল তুলিয়া বলিল—"খবরদার, খবরদার;—বিপিন তোমায় মাঝ পথে ফেলে কোন দেশে উধাও হবে!"

সকলেই তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"তুই বড় ডেপো হয়েছিস, মরবি আমার কাছে ঠ্যাঙানি খেয়ে কোন দিন।"

দুই বছর আগের ঘটনা উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দাদাটি যেন না পারে তা করতে!—কিন্তু সে কথা তো বলছি না, বলছি প্রথম বাপের বাড়ী যাচ্ছেন, কিছু জিনিষপত্তর সঙ্গে থাকবে তো, ভালো করে একটা তত্ত্ব

পর্য্যন্ত করা হয় নি এ পর্যন্ত বেহাইবাড়িতে, তার ওপর তিনদিনের পথ—একটা লোক না সঙ্গে থাকলে....”

মোহনা তাওয়ার টিকা বসাইয়া ফু দিয়া অগ্নিসঞ্চার করিতেছিল, এ-সব ব্যাপারে সেই হক্‌দার বলিয়া নিতান্ত অভ্যাসবশেই কাঁচাপাকা গোঁফে একবার হাতটা বুলাইয়া একটু গলাখাঁখারি দিল। মোতিবালা একটু হাসিয়া চাপিয়া বলিলেন—“মা, শুনলে তো?”

নিস্তারিণী দেবীও একটু মৃদুহাস্য করিলেন। বিপিনবিহারী সদরের দিকে ছিলেন, রেওয়াজ মত নামের সঙ্গে একটা গালগালি জুড়িয়া ত্রিনয়নীকে ডাক দিতে সে ছুটিয়া একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল—“বড়্‌কী যাবে বাপের বাড়ি সঙ্গে যাবে কে? বাড়িতে আছে মোহনা-হুলো কোমর বেঁধেছে—এ-এ-এ...”

‘বড়্‌কী’ এ প্রান্তে বড় বউয়ের সাধারণ নাম, বড়কী, মেজলী, ছোটকী—এই পর্যায়ে চলে; রহস্যের মতো মনের অবস্থা হইলে ত্রিনয়নী বৌদি ছাড়িয়া এই নামটি ব্যবহার করে।

গিরিবালা তেপাইয়ের উপর জলযোগের সরঞ্জাম রাখিয়া গেলেন। একটু পরেই মোহনা গড়গড়াটা পাশে রাখিয়া নলটা চেয়ারের হাতলে জড়াইয়া দিয়া বাহিরে বিপিনবিহারীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল,—যাওয়ার কথাটা উঠিয়াছে, তাহারই ষোল আনা সম্ভাবনা, তবুও তুলসীদাস বলিয়াছেন—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে হাতের মুঠার জিনিসও ফসকাইয়া যাইতে পারে!

নিস্তারিণী দেবী চুলবাঁধার সঙ্গে যাত্রার ব্যবস্থার কথাই বলিয়া চলিয়াছেন। জলযোগ একটু আধ-ঘ্যাচড়া করিয়াই সাঙ্গ করিয়া মধুসূদন গড়গড়ার নলটা উঠাইয়া লইলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—“ওকি একেবারে ছুঁলে ন যে!”

কোন উত্তর না দিয়া মধুসূদন গড়গড়ায় গোটাকতক টান দিলেন, তাহার পর নলটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"বলছ বটে, কিন্তু ভাবছি এই নতুন চাকরিটা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি নেওয়াটা কি ঠিক হবে?"

আবার নলটা অধর-সংলগ্ন করিলেন।

নিস্তারিণীদেবীর হাত বন্ধ হইয়া গেল, স্বামীর মুখের পানে বিস্মিত-ভাবে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এযে আবার নতুন কথা শুনছি!"

মোতিবালার বিড়ালকে দোল খাওয়ানো বন্ধ হইল, গিরিবালা ঘরে কি একটা করিতেছিলেন, উৎকণ্ঠিতভাবে দুয়ারের পিছনটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মধুসূদন সটকায় গোটাকতক টান দিয়া বলিলেন—"নতুন কথাই তো, কিন্তু নতুন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে। দাসত্বের ধারাই এই, কি করা যায় তুমিই বল? এখন সায়েবের কাছে যদি ছুটির কথা তুলি, মুখটা গম্ভীর হয়ে যাবে। তাও এক আধ দিনের কথা নয় তো, খুব কম করে ধরলেও হপ্তা-তিনেকের কমে হবে না। তুমিই ভেবে দেখো না।"

নিস্তারিণী দেবী একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলেন—"দেখেছি ভেবে। একটা মত দু'টো দিন কায়েম থাকে না। ঐ যে একটা কচি মেয়ে ঝাড়া দু'বছর বাপ মায়ের মুখ দেখলে না—ওর কথা ভাববার কেউ নেই। মুখটি শুকিয়ে শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কাউকে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু নিজেদের তো আক্কেল হওয়া চাই...."

মধুসূদন মন্থরভাবে গড়গড়া টানিয়া চলিয়াছেন।

নিস্তারিণী দেবী একটু বিরক্তি দিয়া বলিলেন—"বেশ, বিপিন না যেতে পারে অন্য ব্যবস্থা করো।"

"অন্য ব্যবস্থা আর কি হবে? কৈলেশ তো নিয়ে যেতে পারে না।

আমার কথা ছেড়েই দাও, সালতামামির সময়, যমে ডাকলেও এখন যাবার উপায় নেই। আর কি বন্দোবস্ত হতে পারে, তুমিই ভেবে বলো না হয়।"

কথাটার মধ্যে এতটুকু অযৌক্তিকতার সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং পাওয়া যায় না বলিয়াই নিস্তারিণী দেবীর উষ্মাটা আরও বাড়িয়া গেল। মোতিবালার বেণীটাকে যা তা করিয়া একটা খোঁপার আকার দিয়া তাড়াতাড়ি গোটাকতক কাঁটা গুজিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"আমার ভেবে বলবার দরকার নেই। আমি শুধু এইটুকু বলব যে এ প্রবঞ্চনার মধ্যে থাকতে চাই না। তোমাদের বৌ তুমি যা ব্যবস্থা হয় কর।"

উঠিয়া কার্যান্তরে বা কোন বিশেষ কার্য উদ্দেশ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

মধুসূদন সন্ধ্যার পর হইতে বাহিরেই থাকেন, সেদিন একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিতর বাড়িতেই প্রবেশ করিলেন। বাহিরের জন্য লুচি-ভাজা হইতেছিল, বলিলেন,—"বৌমা, তুমি একটু আমার তামাকটা সেজে দাও তো মা, ওরা ততক্ষণ চালিয়ে নিচ্ছে।"

জামা জুতা ছাড়িয়া, ঘর থেকে খানিকটা দূরে তুলসীমঞ্চের কাছে একটা চেয়ার লইয়া বসিলেন। একটু পরে গিরিবালা তামাক সাজিয়া আনিলে হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলেন—"তুমি এই দিকটায় এস তো মা, আমাদের মায়েবেটায় একটু সংসারের কথা হোক, ওরা লুচি নিয়ে থাক ততক্ষণ।"

গিরিবালা আসিয়া ডানদিকে চেয়ারের পাশটিতে দাঁড়াইতে পিঠে ধীরে ধীরে কয়েকবার হাতটা টানিয়া বলিলেন—"যাওয়াটা বন্ধ হোল, মনটা খারাপ হয়েছে, না?"

গিরিবালা একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—না....

"হয়েছে। আমরাও মা'কে মিছে কথা বলছি, মা'ও আমাদের মিছে কথা বলছে।"

গিরিবালা আরও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"মিছে কথা কেন বলবেন বাবা ; হয়ে উঠছে না, অনেক দূর…"

মধুসূদন কোন কথা না বলিয়া তামাক টানিয়া গেলেন খানিকক্ষণ, হাতটি গিরিবালার পিঠে মৃদু সঞ্চারিত হইতেছে। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—"তোমাদের তেজপুরের পণ্ডিতমশাইকে মনে আছে মা ?"

গিরিবালা মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, আছে।"

"আমার সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছিল গাড়িতে। মস্তবড় পণ্ডিত আর সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তিনিই সম্বন্ধটা ঠিক করলেন, দুঃখের বিষয় বিবাহের সময় তিনি থাকতে পারেন নি।"

একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—"তোমার ওপর তাঁর মস্তবড় একটা আশীর্বাদ আছে, মা ; আশীর্বাদই বল বা তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীই বল।"

গিরিবালা লজ্জায় আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। মধুসূদনের হাতের টান স্নেহে যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে ; বলিলেন—"ফলবে, অমন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মুখের কথা ফলতে বাধ্য। ফলবে বলেই তোমায় একটা কথা আজ বলে রাখি মা, চিরদিন তো থাকব না ; মনে করে রেখ বুড়ো ছেলেটা একদিন বলেছিল। শুধু সুখ নিয়েই কেউ কখনও বড় হয় না, যে বড় হবে তাকে অনেক বেদনা, অনেক আশাভঙ্গ সহ্য করতে হবে। বড় হওয়া মানে নিজের চারিদিকে একটা বড় জিনিস গড়ে তোলা—সে গড়ার ক্ষমতা ভগবান তাকেই দেন যে ছোট বড় ক্ষতি-বৃদ্ধি, দুঃখ-নিরাশা—এই সবের মধ্যে অটল হয়ে থাকতে পারে। সে ক্ষমতাও দেন ভগবানই। তবে একেবারে দেন না, প্রতিদিনের

ছোট সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিতে থাকেন।—যার একটু একটু করে সওয়া নেই, সে একেবারে একটা বড় ঝাপটা সইবে কি করে?"

দুইজনেই একটু চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু হুঁকার মন্থর শব্দ হইতে লাগিল। মধুসূদন আবার বলিতে লাগিলেন—"তাঁর উদ্দেশ্যটা আমরা আমাদের সামান্য বুদ্ধি নিয়ে বুঝে উঠতে পারি না; সব চেয়ে ভালো কথা তাঁর বিধানটা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া।...যা নিয়ে আমাদের কথাটা উঠল—এই তোমার না যাওয়া—সেইটেই ধরা যাক। আমাদের বুদ্ধিতে কত একটা সহজ কথা আসে দেখো—বিপিনের চাকরির জন্যেই তো সেটা বন্ধ রইল আপাতত?—বেশ, দিন কুড়ি, কিম্বা হচ্ছে আর একমাস পরে, বিপিন সেই তোমায় রেখে ফিরত, তখন সায়েবের এই সুবুদ্ধিটুকু হলেই পারত তো। সমস্যার কত সহজ একটা সমাধান, একটা বালকের মাথাতেও আসে বোধ হয়, কিন্তু তিনি তা হতে দিলেন না। ওর চাকরিটার ব্যবস্থা মাসখানেক আগে করে দিয়ে এ-আনন্দটুকুর পাশে তোমায় বেশ একটু বেদনা দিলেন—আমাদেরও হয়েছে দুঃখ, কিন্তু সে-কথা না হয় ছেড়েই দাও;—ঠিক তোমাকে দিয়ে যেন একটি ব্রত করিয়ে নিচ্ছেন, নয় কি?"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা'বলে এ ভেবে মন খারাপ করো না যে আমি নিশ্চিন্দি আছি। যত শীগ্‌গির পারি ব্যবস্থা করছি তোমায় পাঠাবার। আমি তোমায় এতগুলো কথা বললাম এইজন্যে যে ভগবান আশীর্বাদের সঙ্গে যদি কখনও দুঃখ দেন তো সেই দুঃখটাকে যেন আশীর্বাদেরই অঙ্গ বলে চিনে নিতে পার।

দু'একটা বাধার মধ্যে দিয়া আরও প্রায় একটা বৎসর কাটিয়া গেল,—সাতকড়ির পৈতা, এমন কি পুতির বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।

অবশেষে বিচ্ছেদের বেদনা যখন এত গাঢ় সেই সময় ভগবানের নিকট হইতে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আসিল—প্রথম সন্তানের রূপ ধরিয়া।

গিরিবালা ছেলেদের কাছে গল্প করিতেন—"বাবাঃ, ঠিক তিন বচ্ছর এগার মাস, কী যে অবস্থা হ'য়েছিল প্রথমবার এসে। বাবা নিজের ছেলের বেলায় অমন দরাজ, নাতির বেলায় সে কী কড়াক্কড়ি। তখন প্রায় বাড়ির দরজা পর্যন্ত রেলগাড়ি এসে গেছে, তিন দিনের পথ গিয়ে দেড় দিনে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ কোনই কষ্ট নেই আর,—না, আর একটু বড় হোক, বড্ড কচি—না, আরও একটু বড় হোক, বড্ড কচি… শেষে শশাঙ্ক যখন এক বছর উৎরে গেল, তখন গিয়ে ছাড়পত্র পেলাম, বাবাঃ।…"

তৃতীয় পর্যায়

১

গিরিবালার পাণ্ডুল হইতে প্রথমবার বেলে-তেজপুরে আসার কথা বোধ হয় পূর্বে কোথাও বলিয়া থাকিব।

বৈকাল বেলা। দুই বাড়িরই পুরুষেরা বাহিরে। আশ্বিন শেষের পড়ন্ত রোদে কয়েকজন উঠানের মাঝখানে শানের উপর বসিয়া আছেন।—বসন্তকুমারী, বরদাসুন্দরী, নিকুঞ্জলালের স্ত্রী, পাড়ার আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক। গ্রামে একটা যাত্রার দল আসিয়াছে, হারাণের এক দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী তাহাতে দোয়ারকি গায়। তাহাকে আনিয়া হারাণের বৌ হাজির করিয়াছে, আগমনী ধরিয়াছে—

> মা, গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
> ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।

ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, 'মা কৈ মা কৈ' ব'লে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।
মাগো ত্রিভুবনে মান্সে, ত্রিভুবনে ধন্সে।
তোর মেয়ে সামান্সে নয় গো রাণি।

অতি সুমিষ্ট করুণ গলায় সুরটা টানিয়া তুলিয়াছে, চার বৎসরের দেশান্তরিতা কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনায় দুই জায়ের চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে "জেঠাইমা কই গো ?" বলিয়া শশাঙ্ককে কোলে করিয়া গিরিবালা সদর দুয়ার পারাইয়া উঠানে পা দিলেন। এত পরিবর্ত্তন, তাহার উপর আবার যোগাযোগটা এতই বিস্ময়কর যে প্রথমটা কেহই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সকলেই মুখে একটিমাত্র ভাব ফুটাইয়া চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিল প্রথমে হরিচরণ, সে উঠানের একপাশে বেড়ার ধারে কি একটা গাছ পু তিতেছিল, "দিদি যে গো, ওমা খোকা।"—বলিয়া ছুটিয়া আসিল।

গিরিবালা ততক্ষণে শিশুকে কোলে লইয়াই জেঠাইমাকে প্রণাম করিতে ঝু কিয়াছেন। একেবারেই মাকেও এবং গুরুস্থানীয়া আরও দু'একজনকে যতক্ষণে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, ততক্ষণে ইঁহাদের ঘোরটা কাটিয়াছে। রুদ্ধকণ্ঠে শুধু—"মনে পড়লো মেয়ের।"—বলিয়া গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বরদাসুন্দরী শশাঙ্ককে কোলে করিয়া—অশ্রু-সিক্ত-মুখে কয়েকটি চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কি চমৎকারটি হয়েছে রে।"

বিপিনবিহারী পালকী হইতে জিনিসপত্র দেখিয়া শুনিয়া নামাইতেছিলেন, এমন সময়, কাহার মুখে খবরটা শুনিয়া অন্নদাচরণ বারোয়ারিতলা হইতে দ্রুতপদেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা দুইজনেই ভিতরে আসিয়া পড়ায় কন্যার সঙ্গে প্রথম মিলনটা নীরব এবং উচ্ছ্বাসহীনই

রহিয়া গেল। বিপিনবিহারী অগ্রসর হইয়া শাশুড়িদের পদস্পর্শ করিলেন। "ওঁকে জিগ্যেস করো বাড়ির সব ভালো তো?—বেহাই, বেয়ান, ছেলেমেয়েরা ..."—স্বামীর আড়াল দিয়া বসন্তকুমারী নিজেই অস্ফুটস্বরে প্রশ্নাদি করিলেন। উত্তর দিয়া বিপিনবিহারী জ্যেঠশ্বশুরের সঙ্গে ঘরে গিয়া উঠিলেন।

ওঁরা সব জড়ো হইয়াছেন রসিকলালের ঘরের দাওয়ায়। উল্লাসটা কোন্ পথে যে আত্মপ্রকাশ করিবে যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। গিরিবালা বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন—"আর নন্তী।—নন্তীটা কত বড়ো হয়ে গেছে মা? কে বলবে যে..."

একে উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির মানুষ, তায় প্রথম ঝোঁকে বাধা পাইয়া বসন্তকুমারী হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন, উত্তর করিলেন—"ন, তুমি সব ভুলেভালে সেখানে মাথার চুল পাকাও, আর এখানে যে যার বয়েস আঁকড়ে ব'সে থাক্—। বাবাঃ, আজ গেছে?—পণ্ডিতমশাই যে বলেছিলেন—"ছুট বলতেই মেয়েকে দেখতে পাবে না, তা কি এমনি করেই ফলতে হয় কথাটা গা।...দে ছোটবৌ, দেখি তো..."

খোকাকে বরদাসুন্দরীর হাত হইতে লইলেন, চোখ বড় বড় করিয়া মুখের পানে চাহিয়া ঠাট্টার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু দুলাইয়া বলিলেন—"ইস্, বড় কত্তা কী হয়েছেন।—কী কেশের বাহার! কী রং!...কতো বয়স হ'ল নটবরের—এগার মাস না?"

গিরিবালা একটু লজ্জিতভাবে পুত্রের পানে আড়ে চাহিয়া বলিলেন—"জানি না বাপু এগার মাস কি এগার বছর—চিৎকারের চোটে মাথারই ঠিক থাকে না, তা বয়সের হিসেব রাখবে।"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"এগার মাসই হ'ল আমার ঠিক হিসেব আছে; গেল কার্তিকের সাতাশে...."

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—"ওরে বাস্রে, তুমি যে একটি একটি করে দিন গুণছিলে গো!"

এক ঝলক হাসি উঠিল। গিরিবালা আর একবার পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—"বাজে কথা রেখে কাজের কথা বলো দিকিন আগে, আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি;—পণ্ডিত ঠাকুরদা কেমন আছেন?—ঠাকুরমা, ঘোষাল-ঠাকুরমা, ও বাড়িব দামু পিসিমা—বাঃ, ও-বাড়ির পিসিমাকে তো দেখছিই না।"

মন্তুর মা বলিলেন—"তিনি তিথি করতে গেছেন।"

"কবে গেলেন?—বাঃ, আমি এদিকে এলাম, আর তাঁর তিথি করবার সময় হ'ল!...তারপর—চাটুয্যে খুড়ি কেমন আছেন?—আর—হ্যাঁ—হারাণের বৌ কেমন আছে মা?"

বরদাসুন্দরী বলিলেন—'ভালো আছে, দু'টি ছেলে হ'ল তার এদিকে।"

"অনেকদিন দেখিনি। বাবাঃ, সাঁতরায় আমার কি জ্বালানটাই জ্বালিয়েছিল পোড়ারমুখী! আর—আর..."

হঠাৎ বিরক্তভাবে মুখটা কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিলেন—"বাবার কি রুগী দেখা শেষ হবে না?" তাঁহার এই ব্যাকুল বিশৃঙ্খল ভাবটা সবাই স্মিতহাস্যের সহিত উপভোগ করিতেছিলেন, বসন্তকুমারী বলিলেন—"একটু গুছিয়ে বল দিকিন কার কথা আগে শুনতে চাস?"

বাপের প্রশ্ন কয়েকবারই হইয়া গেছে ইহার মধ্যে, গিরিবালার হাসি হাসি ভাবটা এক মুহূর্তেই অন্তর্হিত হইয়া গেল, চোখ দুইটি ডবডব করিয়া উঠিল, মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—" 'গুছিয়ে বল্!' ...চারবচ্ছর বিদেয় দিয়ে ভুলে থাকলে..."

পাশেই মন্তুর মা, কান্নাটা সামলাইতে না পারিয়া তাহার কাঁধে

মুখটা গুজিয়া চাপাকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, সবার মধ্যেই একটা থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। দুই জাও চোখে অঞ্চল দিলেন। সহানুভূতিতে আরও কয়েকজন অঞ্চল তুলিল, একজন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—"মা-জেঠাইয়ের কি সাধ যা? তায় আবার অনেক দূরে গিয়ে পড়েছ…"

আনন্দের মিলন, অশ্রু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। বসন্তকুমারী অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো এই এলেন বলে। খবরটা দেওয়া থাকত, তা'হলে কি বেরুত আজকে?"

গিরিবালা ধরা গলায় বলিলেন—"ব'য়ে গেছে খবর দিতে তাদের, পিঁজরেয় পুরে রাখতে পারলেই হল।"

আবার বুঝি ভেজে চোখ, বুদ্ধিমতী গোছের একজন প্রাতিবেশিনী বলিলেন—"সেখানকার কথাও একটু বল দিকিন শুনি, বেলে-তেজপুর তো আছেই,…ভয়ঙ্কর নাকি কড়াকড়ি পদার—বাইরে বার হবার জো নেই? আর বড্ড নাকি শীত—শীতকালে নাকি জল পর্যন্ত জমে যায়?"

"বাবাঃ, সে দেশের কথা আর তুলো না খুড়িমা, ভাবতেও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চারটি বচ্ছরের মধ্যে… কেউ না হয় জেঠামশাইকেও ডেকে দিক না, সাতু এরা কোথায় গেল?… নন্তী, তুই-ই না হয় যা না ভাই।"

নন্তীর মা বলিলেন—"জামাই একলা থাকবেন?"

"আর আমি যে…" -বলিয়া বেশ মুখ নাড়া দিয়াই গিরিবালা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হরিচরণ, সাতকড়ি, আর কিশোরকে লইয়া উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল; কখন ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া দুইজনকে খুজিয়া পাতিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে।

আরও চার বছর বয়স বাড়িয়াছে বটে কিন্তু সাতকড়ির মুদ্রাদোষটা

এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই ; সেকেণ্ড কয়েক বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিল—"উরে ব্বাসরে, দিদি।—দিদির ছেলেটাও এসেছে। কি টকটকে রং!…"

তাহার ধরণটা দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালা বলিলেন —'ওকে আমি কোথায় রেখে আসতাম বলতো জেঠাই মা ?—একটুও বদলালো না সাতকড়ি।"

এমন সময় বাহিরে ঘুড়িটা শব্দ করিয়া উঠিয়া রসিকলালের আগমন ঘোষণা করিল। তিনজনেই পড়ি তো মরি করিয়া খবরটা দিতে বাহিরে ছুটিয়া গেল। "দেখি, বাবা এলেন বুঝি।"—বলিয়া গিরিবালা উঠিয়া পড়িলেন। বসন্তকুমারী একটু চাপা গলায় বলিলেন—'ঘরে জামাই রয়েছেন।"

''থাক্, তাব'লে আমি এখানেও পা মুড়ে বসে থাকতে পারব না। আমি এদিকটা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি।"—বলিয়া সামনে দিয়া না নামিয়া দাওয়ার পাশ দিয়া নামিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া যান ছেলেবেলার মতো, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলেন পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেছে; এমন কি চৌকাঠের বাহিরেও যে পা দিবেন সেটুকুও হইয়া উঠিল না। পাগুলের অভ্যাসমতই চৌকাঠের কাছে গিয়াই গতিবেগটা আপনা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল। প্রতিপদেই উৎসাহে কুণ্ঠায় যেন ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে। কথা পর্যন্ত আগে রসিকলালই ক'হলেন—"গিরি!—তুই কখন এলি গো ?"

গিরিবালা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—''আজ নয়, তোমার রুগী দেখা আর শেষ হয় না বাবা। দাঁড়াও একটু।"

প্রণাম করিয়া উঠি'ত হারাণ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, বলিল—''দাঁড়াও দিদিমণি একটু পায়ের ধূলা নোব।''

গিরিবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওমা, শোন কথা বাবা, হারাণ বলে আমার পায়ের ধূলো নেবে।"

হারাণ ততক্ষণে ঝুঁকিয়া পদস্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে, বলিল—"তা নোব নি?—কি লক্ষ্মী প্রীতিমেব মত রূপ হয়েছে তোমার দিদিমণি!"

রসিকলাল হাসিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"তা তোর একটু কেমন ঠেকবেই, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, কিন্তু···দেখো, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি—আমার স্যাঙাৎ কোথায়? আগে তার সঙ্গে মোলাকাৎটা করি—তোর ছেলের কথা বলছি গো···"

সাতকড়ি প্রভৃতি 'স্যাঙাৎ' 'মোলাকাৎ' কোন কথাটাই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় ভাবে চাহিয়াছিল, ছেলের উল্লেখেই আবার হুড়াহুড়ি করিয়া তাহাকে লইয়া আনিতে ছুটিল। গিরিবালা লজ্জিতভাবে একটু দৃষ্টি নত করিয়া অভিমানের সুরে বলিলেন—"আমি যে এতদিন পরে এলাম খোঁজই নেই,—নাতির জন্যে ·· যাও বাবা·· "

একটু চাপা হইলেও বসন্তকুমারীর গলাটা স্পষ্টই শোনা গেল—"ঠাকুরপোব আগে মেয়ের সঙ্গে শলা পরামর্শ ক'রে নিয়ে তবে বাড়ির চৌকাঠ টপকাবার পুরনো অব্যেসটা গেলনা নাকি এখনও গো?"

মেয়েদের মধ্যে একটু হাসির শব্দ উঠিল। লজ্জিত হইয়া গিয়া রসিকলাল প্রকৃতই এমনভাবে কন্যার পাশে পাশে প্রবেশ করিলেন যে সত্যই পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বেকাব কোন একটি দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সাতকড়ি আনিয়া খোকাকে হাজির করিল, স্পর্শ-গৌরবের জন্য হরিচরণ তাহার একটা পা ধরিয়া আছে। একটা কিছু বলিবার গৌরবটা কিন্তু অর্জন করিল কিশোর; চোখ বড় করিয়া বলিল—"ছ'টা দাঁতও হয়েছে।"

কোলে লইতে রসিকলাল বলিলেন—"তবে আর কি, এবার আমার ঘুড়িটাকে বিদেয় করে দি..."

বসন্তকুমারী ঠোঁট চাপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মরছি না, কে কাকে ঘোড়া করে দেখতেই পাব।"

আবার একটু চাপা হাসি উঠিল। খোকাকে একবার একটু দূরে ধরিয়া দেখিয়া লইয়া রসিকলাল বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—"কি সুন্দরই হয়েছে গো, আর শান্তও তো!"

কোলে লইয়াই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াইলেন, বলিলেন—"আয় গিরি গপ্প করি...বিপিন কোথায় বৌদি?"

নূতন মায়ের অনুভূতি, মনের কোন গভীরে গিয়া যে দোলা দেয় কে বুঝিবে? খানিকক্ষণ সে-অনুভূতিকে চাপা দিবার কোন কথাই যোগাইল না গিরিবালার, তাহার পর রসিকলাল ঘরের দিকে খানিকটা আগাইয়া গেলে একবার একটু ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইয়া, মাথায় ছোট্ট একটি ঝাকানি দিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন—"হ'ল, গিরির আদর উঠল বাড়ি থেকে। এমন জানলে যাঁদের ছেলে তাঁদের কাছেই রেখে আসতাম আমি, আনতাম নাকি ঘাড়ে করে বয়ে?"

২

স্বপ্ন অনেক সময় প্রত্যক্ষের ঠিক বিপরীত গতি লইয়া চলে। সকাল বেলার দিকে গিরিবালা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন শ্বশুর পাণ্ডুল থেকে লইতে আসিয়াছেন। খঞ্জনীর পরামর্শেই গিরিবালা পালঙ্কের পায়াটা জড়াইয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছেন, শ্বশুর অনেক চেষ্টা করিয়া হার মানিয়া খোকাকে

লইয়া চলিয়া গেলেন। ·· তারপর খোকাকে ব্যাকুলভাবে খোঁজাখুজির একটা অত্যন্ত গোলমেলে আর কষ্টকর ব্যাপারের পর গিরিবালা পাণ্ডুলে আসিয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়াইলেন। ....পাণ্ডুলের দেয়ালগুলি কী উঁচুই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। —যেখানটা দুয়ার ছিল সেখানটা পর্যন্ত দেয়াল। ··

ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গিয়া খানিকটা পর্যন্ত মাথাটা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাস্তব জাগিয়া উঠিল—বেলে তেজপুর, —মোটে কাল তো আসিয়াছেন, থাকার এখনও সমস্তটাই বাকি। আর এ থাকার সমস্তটাই মুক্তি, বলার মুক্তি, হাসার মুক্তি···এখনও সমস্ত জিনিস দেখিতে বাকি আছে, চার বৎসর পরে কত পরিবর্তন হইল?

ঘুমন্ত খোকার মুখে জানালা দিয়া নূতন রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। ....কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।···গিরিবালা খোকার কেশবহুল মাথাটা ধীরে ধীরে ডান হাতে চাপিয়া চুমু খাইলেন; ভিতর থেকে যেন কান্না ঠেলিয়া ওঠে, মনে মনে বলেন—"হে ঠাকুর, আর যেন খোকাকে হারাবার এরকম স্বপ্ন দেখিনা কখনও, তাহ'লে ঘুমের মধ্যেই মরে থাকব ··হে মা সিংহবাহিনী ···"

প্রভাতের স্মিতমান আলোয় রাত্রের ভয়টা কিন্তু একটু একটু করিয়া একেবারে কাটিয়া যায়। এই কয়েকমাস লইয়া যে মায়ের জীবন সেটা যেন আর সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাদের দুইটিকে ঘিরিয়া ফেলে—কালকে খোকার নূতন আদরের ছবিগুলি সুদ্ধ। বুকে খোকাকে চাপিয়া নিঝুম ভাবে পড়িয়া থাকেন। তন্দ্রায় একটা অদ্ভুত মিষ্ট আর ফিন্‌ফিনে হালকা গোছের স্বপ্ন স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে—তিনি খোকা—কি এক অদ্ভুত ধরণের আলো—শুধুই আদর এমন সময় তন্দ্রাটা ভাঙিয়া গেল,

কিশোর দরজায় অল্প ঘা দিয়া ডাকিতেছে—"দিদি, দিদি, তোর খোকা ঠাকুর দেখতে যাবে না ?"

খোকাকে কোলে লইয়া গিরিবালা বাহিরে আসিলেন, কিশোরের কোলে দিয়া বলিলেন—"যা ইচ্ছে কর ভাগনেকে নিয়ে, মস্তবড সম্পত্তি হয়েছে ! আমি দায়ে খালাস বাপু। তুই যখন পারবিনি সামলাতে কিশোর, জেঠাইমার কাছে দিয়ে দিস—বেশ তো ? আমার অনেক কাজ আছে ভাই।"

দাদাদের আওতায় থাকিলে কিশোর মুখ খুলিবার তত সুযোগ পায় না। এখন একা, খোকার মাথাটা নিজের কাঁধে একটু চাপিয়া বলিল—"হুঃ, একে সামলানো ভারী তো শক্ত !"

গিরিবালা মাথা একটু দোলাইয়া বলিলেন—"এখনও নিজরূপ ধরেন-নি ভাই ; খজনীর অমন গতর তো ? হিমসিম খাইয়ে দিত।"

কিশোর চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; কৌতুকদীপ্ত চোখে চাহিয়া ব'লল—"খজনী কে ? ওমা ; কী নাম তোর শ্বশুরবাড়িতে সবার দিদি !—খজনী !—খঞ্জনী বাজায় নাকি বসে বসে ?"

"ওর দাসী। বাবুর পেছনে একটা গোটা দাসী আছে—নবাবি কত !"

খোকার গাল দুইটা টিপয়া ধরিয়া—"নবাবি কত !"—নবাবি কত !" বলিয়া চোখ পাকাইয়া নিজের মাথায় ঝাঁকানি দিতে খোকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। "যাই, তোমার সঙ্গে হুকুদ্দম করলে চলবে না আমার।"....বলিয়া গিরিবালা চলিয়া গেলেন।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত খোওয়া সারিয়া, আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ার হইয়া বাহিরের দিকে যাইতেছেন, বরদাসুন্দরী প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় চললি এত সকালে ?"

"দেখো পেছনে ডেকে দিলেন।"

"মায়ে ডাকলে দোষ নাই। কিন্তু চললি কোথায় শুনি?"

গিরিবালা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"অনেক জায়গায়; নন্তীকে সঙ্গে করে।"

"শোন, দু'দিন পরে দেখাশোনা ক'রে বেড়াবিখ'ন; জামাই রয়েছেন, কোথাও দেখে ফেলবেন—পথে ঘাটে...."

"বেরুতে দিও না মা।"—কাতরভাবে একবার ঘাড় কাত করিয়া আবার অগ্রসর হইলেন।

"শোন কথা মেয়ের! ওর জন্যে জামাইকেই বেরুতে দোব না।"—বলিয়াই ব্যবস্থাটার অপরূপত্বে বরদাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"কিছু মুখে দিয়ে বেরো গিরি, নৈলে দিদি উঠে আমায় আর কিছু..."

"নন্তীদের বাড়িতেই খেয়ে নোব"

বরদাসুন্দরীকে সদর পর্য্যন্ত যাইতে হইল। বলিলেন—"আর ফিরবি শীগ্‌গির, রোদ কড়া না হতেই; বেশি দূর যাবি নি।"

গিরিবালা ঘাড় নাড়িয়া নিকুঞ্জলালের বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন। পৌঁছিয়া দরজার বাহির হইতেই ডাকিলেন—"কি লো নন্তী, কি কচ্ছিস?"

চার বৎসর পরে এই প্রথম মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ, বিপিনবিহারী থাকায় বাড়িতেও ততটা সম্ভব হয় নাই। ভরাট আওয়াজটা নিজের কানেই যেন অপূর্ব ঠেকিল গিরিবালার, যেন হারাইয়া যাওয়া একটা জিনিস হঠাৎ ফিরিয়া পাইয়াছেন। একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর কণ্ঠের আনন্দের জন্যই আবার ডাকিলেন—"জেঠ'ইমা উঠলে নাকি গো?"

নন্তী ওঠে নাই এখনও, জেঠাইমা খিড়কির দিকে, কাহারও উত্তর পাওয়া গেল না।—"এঁদের এখনও রাত দুপুর নাকি?"—বলিতে বলিতে চৌকাঠটা পার হইয়াছেন, পাশের পড়ো জমিটার পরেই চাটুয্যেদের বাড়ি থেকে গিন্নির গলার আওয়াজ আসিল—"কে গো, আমাদের গিরির গলা না?"

দেখা যায় না, একটু দূরেই পড়ে, কথা হইতে লাগিল কিন্তু—"হ্যাঁ গো ঠাকুরমা, গিরি।"

"শুনলাম কাল এয়েছিস; কাল আর হয়ে উঠল না, আজ যাব বিকেলে পাট-সাট সেরে; আছিস কেমন?"

লোক জাগার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীটা ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিতেছে—মুক্ত-কণ্ঠের পরিচিত বাংলা কথা—কেউ ডাকে, কেউ উত্তর দেয়, কেউ বকে, কাহারও বাড়িতে শিশু বোধ হয় কী অনিষ্ট করিয়াছে—একটি কিশোরীকণ্ঠে টানা ভর্ৎসনার স্বর উঠিল—"ও—মা—গো!"—বোধ হয় বোন, রাগের কথায় স্নেহের ঝঙ্কার ছিটকাইয়া পড়িতেছে।....বিদ্যুত-ছবির মতো চার-পাঁচটি অর্ধবাক্ অন্তপুরিকা লইয়া পাণ্ডুলের বাড়িটি একেবারে মনে পড়িয়া গেল।

গিরিবালা বলিলেন—"আছি ভালো ঠাকুরমা, আমিও আসছি একটু পরেই।"

"আয়; কতদিন দেখি নি যে তোকে।"

নন্তীর মা রাইমণি বাড়ীর মধ্যেই কাহার প্রশ্নে উত্তর করিলেন—"আমাদের গিরি গো, কাল এল যে।"

গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—"বোস গিরি, উঠ্‌ল না নন্তীটা এখনও? কাল রাত্তিরে বলা হ'ল সকালেই গিরিকে নিয়ে..."

একেবারে ও-প্রান্তের ঘর থেকে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্তী বাহির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া রাগের ভান করিয়া বলিল—"ওর সকাল যে কাক-কোকিল না ডাকতেই হয় কে জানবে বলো ?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"না, মাথার ওপর সূর্য্যি এলে হবে! দু'চোখ বোজ ভালো ক'রে, সক্কালবেলা একচোখ দেখিয়ে ঝগড়া করতে করতে উঠল দেখো না !...ঝট করে নে।"

নন্তী উঠানে নামিতে নামিতে বলিল—"হবে না ঝগড়া ? নিজের মুখেই এই স্বীকার করছিল সক্কালবেলা উঠলাম, আবার ওদিকে দুপুর হয়ে গেছে বলে বদনাম..."

"যা শীগ্‌গির—নয় তো..." বলিয়া গিরিবালা ধমকাইয়া উঠিলেন।

নন্তীর তৈয়ার হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না, কিন্তু যাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই হইল না। এইবার দুইজনে বাহির হইবেন, রান্নাঘর থেকে নন্তীর মায়ের আওয়াজ আসিল—"গিরি, একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবি, রোস।"

গিরিবালা—"ওমা।" বলিয়া বিস্মিতভাবে নন্তীর পানে চাহিলেন। তাহার পর গলা তুলিয়া বলিলেন—"আমি যে খেয়ে বেরুলাম।"

উত্তরটা কি হয় শুনিবার জন্য মাথাটা একটু ঝুঁকাইয়া কান পাতিয়া রহিলেন। রাইমণি বলিলেন—"মিছে বকিস নি। ...এখুনি হয়ে গেল আমার।"

গিরিবালা নিম্নস্বরে নন্তীকে বলিলেন—"শুনে ফেলেছেন রে!"

রান্নাঘরের সামনে আসিয়া রাইমণিকে বলিলেন—"শুনে ফেলেছ বুঝি ? আমি রেহাই পাবার জন্যে মাকে বললাম, কে জানে বাপু তুমি খিড়কির দোরে কান পেতে আছ !...আর একি কাণ্ড !"

"না শুনলে যেন দু'টো ভেজে দিতে নেই!...নে, হাতেনাতে সেরে নে দিকিন। তুই পটল ক'খানা কুটে ফেল, নন্তী ময়দাটা মাখ।...দাঁড়া, দুটো কেলেজিরে এনে দিই; এই সঙ্গে গোটাকতক নিমকিও করে দিই, গিরি ভালোবাসে। তোরা নে আমি ততক্ষণ হালুয়াটা ক'রে নিই..."

"তবেই বেড়ান হ'য়েছে! আমার ওদিকে পা নিস্‌পিস্‌ করছে।"

রন্ধন-আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে গল্প হইতে লাগিল। নন্তীর বিবাহাদির কথা কাল শুনিয়াছিলেন, তাহারই জের তুলিলেন,—"হ্যাঁগা জেঠাইমা, দুই বোনের কি সব উল্ট হতে হয়? একি বিধেতার অবিচার! আমায় সেই কোন্‌ ধাড্‌ধাড়া গোবিন্দপুর পাঠিয়ে দিয়ে, নন্তীর শ্বশুরবাড়ি করলেন কিনা ঠিক বাড়ির কানাচেই...."

নন্তী মুখ তুলিয়া টিপ্পনী করিল—"হিংসে হয় গিরিদির।"

গিরিবালা বেলন থামাইয়া বলিলেন—"ওমা, হবে না? দু'বেলা মায়ের আদর খাচ্ছিস, আর মা বাপ যে কি জিনিস আমি এদিকে ভুলে যেতেই বসেছি।"

রাইমণি খন্তিসুদ্ধ মুঠাটা কপালে চাপিয়া ফিরিয়া বলিলেন,—"সুবিধে আছে বৈ কি, নেই কেমন করে বলি। কোশ দু'য়েকও নয়; খবরটা আসটা নিত্যই পাই, পাঠানতেও তেমন কড়াক্কড়ি নেই। কিন্তু ঐ মস্ত বড দোষ—খোকাটাকে কোনমতেই পাঠাতে চাইবে না। নেহাৎ যদি পাঠালে তো দু'য়েক দিনের বেশি রাখবে না... "

গিরিবালা বলিলেন—"শুনলাম, তাইতো ভাবছিলাম—থাকে কেমন ক'রে নন্তীটা...."লজ্জিত হইয়া মাঝখানেই চুপ করিয়া গেলেন।

নন্তী বলিল—"ওর ঠাকুরমা যে ভয়ঙ্কর ভালবাসে, একদণ্ডও চোখের আড়াল..."

রাইমণি মৃদু ধমক দিয়া উঠিলেন—"চুপ কর, শাশুড়ির হ'য়ে আর ওকালতি করিস নি তুই।...."হ্যাঁরে গিরি, ঠাকুরমাই সব, দিদিমা কেউ নয়? একটু কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে না তার?.... 'বড় হয়েছে—দু' বছরের হয়েছে—এখন আর তার মা ছেড়ে থাকার কষ্ট কি?'.. শুনে রাখিস গিরি,—দু' বছরের শিশু, সে হল মস্ত বড়, তার আর মা ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবার কথা নয়।..."

গিরিবালার মনে একটা অন্তঃসলিলা বহিতেছিল—কথাগুলো ভাসা ভাসা কানে আসিতেছে; তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিতেছে—খোকা, শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরের অসম্ভব রকম আদর...খোকা বড় হইলে তাহারও নন্তীর অবস্থা করিবেন নাকি?—নন্তীর তবুও তো হাতের কাছেই, তাহার যে একবার গেলে চার বৎসরের ব্যবধান হইয়া যায়..."

রাইমণি শুনিবার লোক পাইয়া বেহানের উপর কতকটা আক্রোশেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"হক্ কথা বলব বাপু, তা যেই যাই মনে করুন; নিজেকেও কিছু বাদ দিয়ে বলছি না;—হাজার বলি আমি দিদিমা, আমার বাড়া কেউ সোহাগ করতে পারে না, —তুমি হাজারই বল—তুমি ঠাকুরমা, বাপের মা, গুরুর গুরু,— নাতি তোমার নয়নের পুতুল—হ্যানত্যান—কিন্তু মায়ের কাছে কেউ নও বাপু;—তুমিও নয়, আমিও নয়। তার কাছ থেকে কি আলাদা রাখা উচিত কাচ ছেলেকে?...কিগো গিরি মিথ্যে বলছি?"

ওদিকে অন্তঃসলিলা বহিতেছে—ভোরে অমন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কেন গিরিবালা? সত্যিই শ্বশুর নাতির জন্য ছুটিয়া আসিবেন না তো?—বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি ফলে...অন্যমনস্কতার মধ্যে রাইমণির কথার সবটা ধরিতে পারেন নাই, গিরিবালা কোনরকম একটা উত্তর দিবার জন্যই বলেন—"লোক কি রকম্ এদিকে?"

"লোক যে নিতান্ত মন্দ বলব তা নয়। তবে ঐ আমি হচ্ছি শাশুড়ি, আমার কথার কাছে কার কথা? দিদি থাকলে তবুও মাঝে মাঝে আনে ছেলেটাকে—রাশভারি মানুষ তো?...আমায় তো গেরাহ্যির মধ্যেই আনে না। এই দেড়মাস গেছেন দিদি, একটি-বার পাঠিয়েছিলেন এর মধ্যে।....কে জানে বাপু,—বৌয়ের শাশুড়ি হবার ভাগ্যিও হল না...."

নন্তী হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

রাইমণির হুঁস হয়—বেহানের প্রতি মনের রাগ আর ঈর্ষাটা একটু বেশি করিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, প্রশ্ন করেন—"হাসলি যে ?"

হাসার কারণটাও ওই। আসলে শাশুড়িটি তাহার বড় ভালোই—আর যাই দোষ থাক শাশুড়িগিরি ফলাইবার দোষটা মোটেই নাই। নাতি লইয়া একটু দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে এও আছে যে নাতি ঠাকুরমা ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না। নাতির এ দোষটা ভুলিয়া সুবিধা পাইলে রাইমণি তাহার ঠাকুরমাকে লইয়া পড়েন। অশোভন হয় বলিয়া নন্তী অনেক কষ্টে হাসি চাপিবার চেষ্টা করে, না পারিলে একটা মনগড়া জবাবদিহি দিয়া দেয়। বলিল—"হাসব না গিরি দি? মার এখন ইচ্ছেটা আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, উনি ঘরে বৌ এনে খুব শাশুড়িগিরি ফলাতেন—ছেলে আটকে রেখে, বৌকে বাপের বাড়ি যেতে না দিয়ে..."

রাইমণি কৃত্রিম রাগের সহিত অল্প হাসি মিশাইয়া বলেন—"তাই করতাম।—সবাই তোর শাশুড়ির মতন কিনা।...তোর শ্বশুরবাড়ির গল্প বল গিরি—হ্যাঁরে, সত্যিই বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে দেয় না? ...কোথায় যাব মা!—এমন দেশও আছে ভু-ভারতে?"

ভাসমান লুচির উপর ঝাঝরা দিয়া গরম ঘি ছড়াইয়া ঝাঝরা তুলিয়া ঘুরিয়া বসেন।

জলখাবার শেষ হইতে, আহার করিতে দেরি হয়, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলের গল্প চলে। বাইমনি মাঝে মাঝে এক একটা প্রশ্ন করেন—"হ্যাঁলা, সত্যি মা জানকীর দেশ তবে অমন কেন? তাঁর কেউ আছে বেঁচে ব'তে এখনও?...পঞ্চাশটা ঐ আম খেয়ে ফেললে। তোর শ্বশুর পাঠিয়েছিল, খেলাম কিনা, একটা সামলাতেই হিম সিম খেযে যেতে হয়...

ছুতোর পাড়ার ভূত-খেলান, খঞ্জনীর শ্বশুরবাড়ি থেকে পালান, নীলকুঠির মেমসাহেবের ঘোড়ায় চড়া, একবার কুঠির একটি হাতী ক্ষেপিয়া কি দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, এই সব অনেক কথাই হয়। গল্পের ঝোঁকে খাওয়ার পরও অনেকটা সময় গড়াইয়া যায়।

আঁচাইতে আঁচাইতে গিরিবালা হঠাৎ একবার উৎকর্ণ হইয়া ওঠেন। নন্তী প্রশ্ন করে— কি হ'ল?"

'না আমি ভাবলাম খোকাটা বুঝি কাঁদছে।"

"না, চাটুয্যে গিন্নির নাতি।"

তাই দেখছি। উনি কান্না ধরলে পাড়া মাথায় করতেন। কী চিলের মত চিৎকার ভাই। পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়ে দেয়।"

আসল কথা খোকা মনটা জুড়িয়া বসিয়াছে। এগার মাসের মধ্যে এই প্রথম এক নূতন ধরণের অনুভূতি উদয় হইয়াছে গিরিবালার মনে—খোকা যে বরাবর তাঁহার কোলে কোলেই রহিয়াছে এমন নয়, বরং শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, ননদ—এদের আদর কুড়াইয়া মায়ের কাছে খুব কম সময়ই থাকিতে পায় খোকা—তাহার উপর খঞ্জনী আছে, একবার যদি বাহির হইতে পারিল তো ঘণ্টা দু'য়েকের কমে বাড়ি ঢুকিতে জানে না—।

কাজের মধ্যে এক একবার উদ্বিগ্নও হইয়া উঠেন গিরিবালা; কিন্তু সে সবই এক অন্য ধরণের ব্যাপার। রাইমণির গল্প শোনার পর থেকে আজ যেমন হঠাৎ একটা হারাই-হারাই ভাব উঠিয়াছে, আর কখনও এমনটা হয় নাই। একটা অব্যক্ত বেদনা, কোন কারণ নাই, তবুও আয়োজন, আহার, গল্প—সব ঠেলিয়া প্রাণটা মাঝে মাঝে যেন আই-ঢাই করিয়া উঠিতেছে। কুণ্ঠার বশে পারিতেছেন না; তবুও এক একবার মনে হইতেছে—দেখিয়া আসি খোকাটাকে।...আতঙ্কে, অনুকম্পায়, বেদনায়, বুক-নিঙড়ান স্নেহে—একটা মিশ্র অনুভব—তাহার মধ্যে ভোরের স্বপ্নটাও আছে, নন্তীর মা-ছাড়া দুই বৎসরের শিশুটি আছে, এই নূতন জায়গায় আসিয়া কতকটা বিহ্বল ভাবাপন্ন খোকাও আছে। একটা কথা মনটাকে যেন আরও ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে—এর আগে তিনি থাকিতেন বাড়িতে, খোকা দূরে দূরে থাকিলেও যেন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিত,— আজ তিনিই খোকাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন...

নন্তী পান সাজিতেছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া গিরিবালা ধারণাটাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন—খোকাকে ছাড়িয়া আসা—কি করিয়া সম্ভব হয় সেটা? —খোকা রহিল বাড়িতে পড়িয়া, আর তিনি রহিলেন বাহিরে—কত দূরের দৌড়—ঘোষাল ঠাকুরমার বাড়ি, আর দূরে পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি...হাজার চিৎকার করিলেও সেখানে খোকার আওয়াজ পৌঁছিবে না....

খোকার কান্নার জন্য কানটা উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তায় যেন ভয়ের জোয়ার আসিয়া কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে—কত মায়ে তাদের খোকাদের ছাড়িয়া মরিয়াও তো যায়, যদি....

নন্তী আসিয়া পান দিল, প্রশ্ন করিল—"যা দেরি করলি তুই, জেঠাইমা

আবার তাতে যোগ দিলেন। বেলা ওদিকে আবার চচ্চড় ক'রে বেড়ে উঠল ..."

"তবে ?"

"তবে আর কি ?—বেশি দুর এবেলা আর যাওয়া চলবে ?"

"কাজ নেই তা'হলে। আর মুখুজ্জেমশাই রয়েছেন, ভালও হবে না বেশি দেরি করাটা ; কাছেপিঠে একটু দেখাশোনা করে বরং ফিরে চল্।"

সমর্থন পাইয়া গিরিবালা অন্তরে অন্তরে খুশি হইলেও, বাহিরে কপট রাগ দেখাইয়া বলিলেন—"থাম্, দেরি করিয়ে দিয়ে এখন গুরুঠাকরুণ হয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।"

কাছেপিঠে থাকিলেও একটু একটু করিয়া দলে পুষ্ট হইয়া এ বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরিতে বেশ অনেকখানি বেলা হইয়া গেল। বসন্তকুমারী একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন "কদ্দুর গেছলি গো ? যে দুটো দিন জামাই আছেন..."

গিরিবালা বলিলেন—"এইখানেই তো ছিলাম বাপু, না বিশ্বাস হয় নন্টুকে ডেকে জিগ্যেস্ করো।...না, দু'দিন আর কারুর কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই।"

বসন্তকুমারী হাসিয়া বলিলেন—'তুই ঘুরিস না কত ঘুরবি, মায়ে-ঝিয়ে ঐ কাজই করব শুধু এর পর। মে চুল খুলে চানটা করে নে তাড়াতাড়ি, বেলা হয়ে গেছে। কচি ছেলে, মাকে শুকিয়ে থাকতে নেই।"

গিরিবালা খোকাকে খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিতে পারিতেছিলেন না, প্রসঙ্গটা ওঠায় অবহেলার স্বরে বলিলেন—"সেটা কোথায় ? বাড়ি যে এখনও মাথায় করে নি ?"

"কিশোরকে বোধ হয় বাইরে নিয়ে গেল, তুই নি গে যা নেয়ে গিরি··· !"

অল্প ঘোরা হইলেও অভ্যাসের অভাবে একটু অবসাদ আসিয়াছে, তায় আশ্বিনের দিন, এমনই একটু অবসাদ লাগিয়াই থাকে। বিপিনবিহারী, সাতকড়ি, হরিচরণ আরও পাড়ার কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া ঘড়া-পুকুরে স্নান করিতে গেছেন, ফিরিতে বিলম্ব আছে, জেঠাইমার তাগাদা সত্বেও গিরিবালা শিথিলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—নূতন-পুরাতন জিনিস সব দেখিয়া,—এটার কাছে দাঁড়াইয়া, ওটা পরীক্ষা করিয়া—কোনটাতে পুরাতন কোন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে, কোনটা এই চার বৎসরের বেলে-তেজপুরের জীবনের নূতন ধরণের পরিচয় দিয়া কেমন একটা কৌতুক মিশ্রিত বিস্ময় জাগাইতেছে।···সাতকড়িকে লেখা তাঁহার একটি চিঠি হাতে পড়িল। পড়িতে লাগিলেন, পাণ্ডুল থেকে তাঁরই লেখা চিঠি বেলে-তেজপুরে আসিয়া তিনিই পড়িতেছেন—এমন অদ্ভুত ঠেকিতে লগিল। কবে লিখিয়াছিলেন? মনে পড়িতেছে একটু একটু,—দুপুরবেলা মেঝেয় বসিয়া লিখিতেছেন—পাশে খজনী নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে—খোকা আসিয়া দোয়াতটা উল্টাইয়া দিল—এই চিঠির কোণটায় খানিকটা কালির ছাপ রহিয়াছেও।

লেখাপড়ার কথা থেকে মনটা কি করিয়া বাবার পত্র লেখার কথায় গিয়া পড়িল, এখনও লেখেন নাকি বাবা? সেই পেতেটা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। সহজেই যে পাওয়া গেল এমন নয়, যখন পাওয়া গেল তখন তাহার বাহুশ্রী দেখিয়া গিরিবালার মনটা বিষণ্ণ হইয়া গেল; ধূলায়, মাকড়শার জালে সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে পোকায় কাটিয়া এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়াছে, একটা সস্তা তালা লাগান, বোধ হয় তিনিই যে শেষবার লাগাইয়া গিয়াছিলেন আর খোলাও

হয় নাই এই চার বৎসরে। মরিচা ধরিয়া একেবারে জীর্ণ হইয়া গেছে, একটু নাড়া পাইতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের অবস্থা দেখিলে যেন চোখ ফাটিয়া জল আসে—বাবা কি এ পাট একেবারেই উঠাইয়া দিয়াছেন?

অন্তরের সমস্ত দরদ ঢালিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন, একটা পদ্যে চোখ দুইটা হঠাৎ আটকাইয়া গেল। সেই বর্ষার পদ্যটা গিরিবালা মনে মনে পড়িতে লাগিলেন—

অম্বর ঘিরি একি গম্ভীরে বাজে আজি
শাখে শাখে কদম্ব শিহরে,
শঙ্কর হর বুঝি ডম্বরু করে লয়ে
ভূতসাথে সদম্ভে বিহরে।
তাণ্ডবে ক্ষিতিতল টলমল টলমল…

সেইদিনটি সর্বসমেত আসিয়া তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিতেছে—সেই অবিশ্রাম বর্ষা, বাবার হাঁটু দুই হাতে জড়াইয়া তিনি ঘুমের উপর চোখ ফেলিয়া পদ্য শুনিতেছেন—বাবার মুখে যেন একটা নূতন আলো আসিয়া পড়িয়াছে—মার হঠাৎ সেই রান্নাঘর থেকে আসিয়া—বকুনি, মুখের দীপ্তি যেন এক ফুৎকারেই নিবিয়া গেল—তাহার পর গিরিবালার সেই কান্না…

"কৈগো গিরি!" গিরিবালা বাল্যস্মৃতির ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিয়া গ্রীবা ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। জেঠামশাইয়ের ছোট একটি ছেলে, আপাদমস্তক রঙ্‌চঙে সাজে বোঝাই, সমস্ত উঠানটা যেন ঝলমল করিতেছে। "ওমা, কাদের ছেলে—কী চমৎকারটি দেখতে জেঠাইমা!"—বলিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে গিরিবালা চৌখাটের কাছে লজ্জিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দুয়ারের আড়াল হইয়া পড়িলেন। অন্নদাচরণ ডাকাডাকি করিতে কুণ্ঠিতপদে

দুয়ারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে বসন্তকুমারী রান্নাঘর থেকে বাহির হইয়াছেন, বরদাসুন্দরীও দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে নাতির পানে চাহিয়া আছেন। বসন্তকুমারী বলিলেন—"আমাদের বড়কর্তা! আমি বলি—কাদের চমৎকার ছেলের কথা বলে উঠল গিরি।....বাপরে, একবার দেমাকটা দেখো সায়েবের!"

গিরিবালা নতদৃষ্টি দু'একবার তুলিয়া দেখিলেন, গরবে লজ্জায় কী যে একটা অসহ্য অবস্থায় পড়িয়াছেন স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না। ঘরের দিকেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, অন্নদাচরণ প্রশ্ন করিলেন—কিগো, পছন্দ হল কিনা জিনিসগুলো বললি না তো।"

গিরিবালা ভিতরে যাইতে যাইতে একটু ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন—"ওকে ঐসব ভালো ভালো জিনিস দেয় নাকি জেঠামশাই?—তোমারও যেমন হয়েছে।....নিত্যি ছিঁড়ছে—মিছিমিছি কতকগুলো খরচ . "

আড়াল হইয়া যেন বাঁচিলেন, কাগজগুলা গুছাইতে গুছাইতে কেবলই আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল—সেই খোকাই আজ সকাল থেকে চারিদিক দিয়াই নূতন হইয়া উঠিল কি করিয়া?...এতদিন কি তাহা হইলে তাহাকে চোখ মেলিয়া দেখাই হয় নাই?

৩

বৈকালে অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল সকালই রোগী দেখা থেকে ফিরিয়া রসিকলাল উঠানে পা দিতে দিতেই বলিলেন—"কী যে বাই দাদার, সমস্ত দিন গিরির ছেলেটাকে একরাশ রংচঙে জামা কাপড় পরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কী যে..."

ভাজ ছিলেন না, বরদাসুন্দরী ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"আজ সকাল সকাল যে বড়?"

"ফিরলাম একটু সকাল সকালই। দাদার বাইয়ের কথা বলছিলাম,—নাতিকে একরাশ রংচঙে জামাকাপড় পরিয়ে...."

"না, নাতিকে কেন? তোমায় পরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে বেড়াবেন।...নাতি হবে, মানুষের কত বড একটা সাধ;—কথায় বলে আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।"

"মিষ্টি তো, কিন্তু খরচের দিকটাও তো আবার দেখতে হবে; খুব কম করে ধ'রলেও ঐ একটি কচি ছেলের পেছনে..."

বরদাসুন্দরী চোখ টিপিয়া হাত নাড়িয়া থামিতে ইসারা করিলেন, কি একটা বলিবার মতো করিয়া মুখ নাড়িয়া ওদিককার ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। রসিকলাল কথা বন্ধ করার সঙ্গে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, কাছে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—জামাই আছেন নাকি?"

"গিরি।"

রসিকলাল অপ্রতিভ হইয়া নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বরদাসুন্দরীও পিছনে পিছনে আসিয়াছেন, হাত দুইটা পিঠের দিকে ঘুরাইয়া ওয়াবে ঠেস দিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—"শুধু খরচ দেখলেই চলে? তোমারও তো দেওয়া উচিত।"

রসিকলাল মুখটা গোঁজ করিয়া জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন।

"উত্তর দিলে না যে?"

"দোব যে বোলছ..."

—গিরিবালার কথা ভুলিয়া ঝাঁজিয়াই উঠিতেছিলেন, সামলাইয়া লইয়া চাপা বিরক্তিতেই হাত নাড়িয়া গলা নামাইয়া বলিলেন—"দোব যে বোলছ—দেবার জায়গা রেখেছেন একটু?—পায়ে জুতো তার ওপর মোজা, তার ওপর নেকার-বোকার, তার ওপর টুপি, তার ওপর আবার...."

এতক্ষণে রাগের কারণটা বুঝিতে পারিয়া; আর সেটা প্রকাশ করিবার ভঙ্গিতে বরদাসুন্দরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রসিকলাল বলিলেন—"হাসছ তুমি? হাতে চারগাছা করে চুড়ি পর্যন্ত উঠেছে, গোবিন্দ কাকার ওখানে দেখলাম যে। যেন খুঁজে খুঁজে কোথায় একটু খালি আছে কোন রকমে ভরতি করে দেওয়া। বলো না, বেটাছেলের হাতে চুড়ি পরায়?"

মুখের ভাবটা বদলায় না দেখিয়া বরদাসুন্দরী মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আর একবার হাসিয়া উঠিলেন, তাহার পর "কি জ্বালা বাবাঃ।" বলিয়া হাসিটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"বড্ড আনন্দ হয়েছে—গিরির ছেলে, গিরি-অন্ত প্রাণ একেবারে। তা, তুমি একসেট দিও না হয়।"

"থামো, তাহ'লে আর রক্ষে থাকবে না। বকুনির ধুম পড়ে যাবে—একসেট হ'য়েছেই, তার ওপর আবার একসেট কিনবার দরকার কি ছিল?—টাকা হয়েছে, ওদিকে সংসারের··"

বরদাসুন্দরী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—"তাই কি পারেন কখনও বলতে?"

রসিকলাল নিঃশব্দে জুতাজামা খুলিলেন। মুখের ভাবটা নরম হইয়া আসিয়াছে। সোজা হইয়া একটু চুপ করিয়া বসিলেন; বরদাসুন্দরী স্বামীকে ভালো রকমেই চেনেন, বলিলেন—"কি যেন বলবে বলবে মনে হচ্ছে?"

"নাঃ, বলছিলাম—বিপিনকে দেখছি না, কোথায় গেলেন?"

"সাতকড়ি আর হরিচরণকে সঙ্গে করে বারোয়ারি তলার দিকে গেলেন।"

উত্তরটা দিলেন, কিন্তু বেশ বুঝিলেন স্বামীর মনে যে কথাটা তোলাপাড়া করিতেছে তাহা এ নয়। একটু আড় চোখে মুখের

পানে চাহিয়া রহিলেন। রসিকলাল যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"ভাবছিলাম একটা কাজ করলে কেমন হয়—স্যাকরার দোকানে একটু কিছু ফরমাস দিয়ে আসলে?…"

—যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন। বরদাসুন্দরী বলিলেন—"ভালোই তো, তাই না হয় দিয়ে এস না।"

রসিকলাল আবার রাগিয়া উঠিলেন, কণ্ঠটা যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিলেন—"আরে তারই কি যো আছে?—'গয়ে দেখি—একটা হারের ফরমাস দিয়ে বসে আছেন। নাও, গলাটা খালি ছিল, সেটুকুও‥ কি দিই, কি দিই করে শেষে একজোড়া বালার…."

স্বামীর বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া বরদাসুন্দরী এবারে একেবারে হাসিয়া উঠিলেন, পাছে জামাই বা কেহ আসিয়া পড়েন এই ভয়ে—'কী জ্বালাতেই পড়া গেল?" বলিয়া তাড়াতাড়ি ওদিককার ঘরে চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা ঘর গুছাইতেছিলেন; বাপের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, হাতের পাটটুকু ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিবেন, ছেলের উপর অতিরিক্ত খরচের অনুযোগে যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিবাহ হইয়া গেলেই মেয়ে একটু পর হইয়া যায়, তাহার উপর আবার তিনি চার বৎসর অনুপস্থিত; বাবা, মা, জেঠাই—সবাই বাহিরে বাহিরে ঠিক সেইরকমই আছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটুও বদলান কি সম্ভব নয়? লজ্জায় কুণ্ঠায় গিরিবালার যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। আরও কিছু কথা হইতেছে কিনা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। তাহা শোনা গেল না; কিন্তু শোনা গেল না এইজন্য যে কথাবার্তা যাহা হইতেছে তাহা চাপা গলায় হইতেছে। অবশ্য দুই তিনবার মায়ের হাসি শোনা গেল, কিন্তু তাহাতে গিরিবালার মনের কুণ্ঠা একেবারে গেল না। যেন নিজের কাছেই নিজের লজ্জাটা

লুকাইবার জন্য এটা সেটা নাড়াচাড়া করিতেছেন এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চোখেমুখে হাসির জেরটা তখনও লাগিয়া আছে। রসিকলালের প্রথম দিকের কথাগুলা গিরিবালার কিছু কিছু শুনিয়া থাকা সম্ভব বলিয়া বেশ সহজ ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"উনি এসেছেন গিরি, যা তুই, আমি এ ঘরটা ঠিক ক'রে নিচ্ছি।"

গিরিবালার জড়তাটা কাটে তো নাই-ই, মা সামনে আসিতে যেন বাড়িয়াই গেল; এর পরে আবার বাপের সামনে গিয়া দাঁড়ান—সে যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল। কথাটা এখন বলিবেন, কি অন্য সময়, কি একেবারে চাপিয়াই যাইবেন—যেন শোনেনই নাই? চাপিয়া যাওয়াই ভালো। চিন্তার মধ্যেই জড়ো-সড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মা একটু অলক্ষিতে চাহিয়া আবার তাগাদা দিলেন—"গেলি নি?"

গিরিবালা যেন গা ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যাই।··· একটা কথা বলছিলাম মা····"

সেটা যে কি হওয়া সম্ভব কতকটা আন্দাজ করিয়া লইয়া বরদাসুন্দরী স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কী?"

'নাঃ, থাক।"—বলিয়া পা বাড়াতেই বরদাসুন্দরী বলিলেন—"বল গিরি, মাথা খাস আমার।"

গিরিবালা না.ফিরিয়াই মুখটা নীচু করিয়া বলিলেন—"জেঠামশাইকে আমিও বলব মা—কতকগুলা মিছে খরচ···"

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে!—হ্যাঁরে, এতদিনেও চিনলি না মানুষটাকে? উনি কি তাই ভেবে বললেন? —রাগ, বড়ঠাকুর গায়ে এমন জায়গা রাখেননি যে নিজে একটা কিছু দেন কিনে। আর ঐ যে অষ্টপহর কোলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন —

"কাল থেকে তো ছুতে পারছেন না কিনা।...যা-না, একবার গিয়ে তুলগে যা না খরচের কথা।"

গিরিবালার মনটা অনেক হালকা হইয়া গেছে ; আবার পা বাড়াইয়া একটা কিছু যেন বলিবার জন্যই জিদের সহিত একটু হাসিয়া মাথা দুলাইয়া কহিলেন "জেঠামশাইকে আমি বলবোই দেখো ; বাজে খরচ নয় তো কি ?"

"না, খবরদার ; ভয়ঙ্কর মনে কষ্ট হবে তাঁর।"

গিরিবালা লঘুগতিতে ততক্ষণ ওঘরে। রসিকলাল তখনও মুখের উপর ধীরে ধীরে হস্ত চালনা করিতে করিতে কি ভাবিতেছেন , গিরিবালা বলিলেন—"জামা টামা ছাড়ো বাবা, মুখ হাত ধোও।"

কোট, কামিজ আলনায় রাখিয়া আসিয়া সামনে খড়ম পাতিয়া জুতা খুলিতেছেন. মুখোমুখি না হইবার সুবিধায় রসিকলাল বলিলেন—"তোর গর্ভধারিণীকে বললেই এক্ষুণি গরগর করবে, কিন্তু কাজটা আর এমন কি অন্যায় করলাম বল না ?"

এ ধরণের ভূমিকা হইলেই বুঝিতে হইবে বাবা কিছু একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন ; গিরিবালা ফিতার জোট খুলিতে খুলিতে একটু বিস্মিতভাবেই মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি বাবা ?"

"এমন কিছু নয়, তুই খোল ফিতেটা। পাণ্ডতমশাইকে আসার খবরটা দিতে গেলাম, একটু দেরি হলেই আবার অভিমান হয় কিনা ওঁর। যেতে যেতে মনে হল—খবর শুনলেই তো সেই নেমন্তন্ন করে বসবেন, সেটা কি হতে দেওয়া ভালো ? আর তো নোতুন উপার্জন নেই .."

"দাও নি বাবা খবর তাঁদের ?"

"না দিলে নাকি রক্ষে থাকবে ?....তাই ভাবলাম, খবরটা দেওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে আমিই অমনি নেমন্তন্নটাও করে দিই, খরচটা তো বাঁচবে বুড়ো মানুষের....”

জুতা দুইটা পা থেকে গলাইয়া লইয়া প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া গিরিবালা বলিলেন—“বেশ করেছ বাবা, আমি আজই যাব ভেবেছিলাম, রামীর মাকে পেলাম না। কখন বলেছ বাবা, কাল সকালে না রাত্তিরে?.... উঃ কতদিন যে....”

রসিকলালের মুখটা আবার একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল, একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—“ভাবলাম যখন বলতেই হবে তখন ও হাঙ্গাম মিটিয়ে দেওয়াই ভালো;—তাই আজ রাত্রের কথাই বলে এলাম। শাস্ত্রে বলেছে কিনা শুভস্য শীঘ্রম্। যত শীগ্‌গির হাঙ্গাম মিটে যায় ততোই ভালো।”

গিরিবালা বিস্মিতভাবে বলিলেন—‘আজ! হয়ে উঠবে বাবা? একটুও সময় যে হাতে নেই।”

রসিকলাল বলিলেন—“সমস্ত আয়োজনের ব্যবস্থা না করে আমি বাড়ি এসেছি না কি? তক্ষুণি সেখান থেকেই হারাণেকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলাম; কাঁচা কাজ করি আমি!”

“তা বেশ করেছ, আর মাত্র দু’জন তো লোক, কি বলো বাবা? রোস’, আমি মাকে বলে আসি।”

যাইতেছিলেন, রসিকলাল বলিলেন—“গিরি, শোন!”

ফিরিয়া দেখেন বাবার মুখটি আবার যেন কি রকম হইয়া গেছে। কি কহিবেন একটু চিন্তা করিয়াই কহিলেন—“বলছিলাম....একটু তামাক সেজে দিবি নি আগে?”

গিরিবালা কলিকাটা লইয়া টিনের কৌটা থেকে একটু তামাক বাহির করিয়া সাজিয়া টীকা ধরাইতেছেন, রসিকলাল দুইবার কাসিয়া

বলিলেন—"ফিরছি, পথে ঘোষাল কাকার সঙ্গে দেখা, বাড়ির সামনের গাছটা থেকে..."

গিরিবালা উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছেন বাবা ঘোষাল ঠাকুরদা? আজ সকালে যাব মনে করলাম, কিন্তু নষ্টাটা এত দেরি করিয়ে..."

"আছেন ভালো, সেই কথাই তো বলছি।...দেখি সামনের গাছ থেকে নারকোল পাড়াচ্ছেন। দাদা সকালে বুঝি খোকাটাকে নিয়ে গেছলেন, সে কী প্রশংসা ছেলের!—'খাসা নাতি হয়েছে তোমার রসিক, যেমন রং তেমনি চুল—তা হবে বৈকি, বেঁচে থাক্'...আমি মনে মনে বলছি—'ওরে বাসরে! স্যাঙাতের যে আসতে না আসতেই সুন্দর বলে নাম-ডাক বেরিয়ে গেল!"

গিরিবালা হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া লজ্জিতভাবে অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"ওঃ, ভারী সুন্দর! কী বাই বল দিকিন, জেঠামশাইয়ের,—সমস্ত দিন ঘাড়ে করে নিয়ে..."

রসিকলাল নিজের কথাটুকু কি ভাবে বলিয়া দিবেন তাহার আটঘাট বাঁধিতেছেন, গিরিবালার কথার উপর কোন মন্তব্য না করিয়া বলিলেন—"তখন আমার একটু বুদ্ধি ক'রে বলতেই হ'ল।—ঘুড়ি থেকে নেমে ফটকের মধ্যে গিয়ে বললাম—"কাকা, আজ রাত্রে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে, সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।"

গিরিবালা যেন বিব্রত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রসিকলাল পাছে অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন, সেইজন্য সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"তা বেশ করেছ বাবা; তিনটি লোকের ব্যবস্থা একরকম করে হয়েই যাবে'খন। মাকে বলে আসি কিন্তু।"

রসিকলাল তাড়াতাড়ি হুঁকায় গোটাদুই টান দিয়া বলিলেন—"একটু

থেমে যা গিরি।...ঠিক করেছিলাম তিনজনের ব্যবস্থাই করবো, সময় অল্প তো? এমন সময় দেখি নারকোল নেবার জন্যে ঘোষাল-গিন্নি উপস্থিত, কাজেই জুড়ে দিতে হ'ল—সবাইকে নিয়ে যেতে হবে ঘোষাল-কাকা, নৈলে গিরি বড্ড দুঃখু ক'রবে...”

গিরিবালা এত বিপদের মধ্যেও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—“করেছ কি বাবা! তোমাদের নাতিকে কে একটু প্রশংসা করেছে, কে তার কাছে আবার নারকোল নিতে এসেছে—সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসেছ? বৌয়ে, মেয়েয়, ছেলেয়, ওঁদের বাড়িতে ছ'সাতজনের কম নয় যে।”

“তা সেই রকম ব্যবস্থা করে যে হারাণকে বাজারে পাঠালাম। প্রশংসার কথা নয়—কত যে উপকার পেয়েছি ওঁদের কাছ থেকে তোর বিয়ের সময়, তা তো সব জানিস না....”

বরদাসুন্দরী ওঘরের পাট সারিয়া উপস্থিত হইলেন, বাপ-মেয়েকে অনেক দিন একসঙ্গে দেখেন নাই,—জামাই, ভাসুর, জা না থাকায় একটু সুযোগ হইয়াছে। বলিলেন—“মায়ে-পোয়ে কী এত কথা হচ্ছে তোমাদের গো? হাসছিস কেন রে গিরি?”

দুই জনেই চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর মেয়ের এত সামনা-সামনি স্ত্রীর কাছে দুর্বলতা বড় অশোভন হয় দেখিয়া রসিকলাল যেন মরিয়া হইয়াই এক দমে সমস্ত কথাগুলা বলিয়া গেলেন, ববং একটু বাড়াইয়াই বলিলেন—“অনেক কথা আর দরকারী কথা; বলব আর কাকে?—এতগুনো লোক খেতে, বৌদিদি রায়েদের বাড়ির দুর্গোৎসবের বড়ি দিতে গেছেন, তোমার এখন এদিককার পাট সারাই হয় নি!”

আগাগোড়া সমস্তটা এক দমে বলিয়া কর্তা-ব্যক্তির মতো খুব

জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন,—যত বড়ই ঝড় উঠুক, তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছেন।

সমস্ত ঘরটাতে একটা থমথমে ভাব ছাইয়া রহিল। গিরিবালা মাকে জানেন, প্রতি মুহূর্তেই উগ্ররকম একটা কিছুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, উপর দিকে তাকাইতে সাহস হইতেছে না।...ওদিকে রসিকলালের হুঁকার আওয়াজ ক্রমেই দ্রুত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বরদাসুন্দরীর বিবেচনার এতটা অভাব হয় না; বাড়িতে জামাই আসিয়াছেন, তাহা ভিন্ন গিরিবালার মনের দিকটাও দেখিতে হয়;—সমস্ত রাগ একটি কথায় নিঃশেষ করিয়া মৃদু কণ্ঠে শুধু বলিলেন —"মবি:।"

তাহার পর সমস্ত ব্যাপারটাই মন থেকে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"তা করেছ ভালোই করেছ, কাল সকালে বললে একটু জোগাড়ের সুবিধে হ'ত আর কি।"

রসিকলালই যেন বিজয়ী, মুখে একটু রাগের ভাবই আনিয়া বলিলেন —"কেন যে কাল বলিনি বুঝিয়ে বলবে গিরি, আমার অত ধৈর্য নেই। আর বলে যে আমি কোন ব্যবস্থাই বাকি রাখি নি, কত সব কাজের লোক দেখছি তো।"

বরদাসুন্দরী কিছু বলিলেন না, 'যাই দিদিকে ডেকে পাঠাই'—বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতেই গিরিবালাকেও ডাকিয়া বলিলেন—"গিরি, তুইও আয় মা।"

রসিকলাল বলিলেন—"একটু বসে যা গিরি, একটা কাজের কথা আছে। তোরা বড় হয়েছিস, বুঝতে শিখেছিস, তোদের না বলে বলবো কাকে?"

এর পরেও বাকি আছে কথা!—গিরিবালা ভিতরে ভিতরে দারুণ

উৎকণ্ঠিত হইয়া খাটে ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে একটা শঙ্কা জাগিতেছিল—চার বছর তিনি নাই, এর মধ্যে সংসারে কিছু হইল নাকি? বরদাসুন্দরীর যেখানে জ্বলিয়া উঠিবার কথা সেখানে যে অমন নিরীহভাব ধারণ করিয়া প্রায় বিনা বাক্যব্যয়েই বাহিরে চলিয়া গেলেন, এটা তাঁহার একটু নতুন ঠেকিয়াছিল, এখন রসিকলালের কথায় একটা উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।...রসিকলাল হুকা টানিতেছেন, গিরিবালা অস্বস্তির সহিত দাঁড়াইয়া আছেন।

রসিকলাল বলিলেন—"মাছটা আনতে দিলাম দুলাল বাগদীকে, চমৎকার মাছ জোগাড় করতে পারে, সেবারে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে সে-ই যোগাড় করেছিল কিনা... সেতো তুই জানিসই।"

গিরিবালা বলিলেন—"ঠিক কথা, দুলাল আছে কেমন বাবা? কতবার তার কথা জিগ্যেস করব করব কচ্ছি, একটা না একটা অন্য কথা এসে পড়ছেই।"

"আছে একরকম। গরীবের আর থাকা মা, নেহাৎ থাকতে হয় বেঁচে, থাকে।...কী যে বলতে যাচ্ছিলাম তোকে—হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে ওদেরও খেতে বলে দিলাম। বলতাম না, বুঝছি তো বড় তাড়াতাড়ি হ'ল, আতন্তরে পড়বে সব; তবে নেহাৎ তাকেই নাকি মাছটা আনতে বললাম..."

"ও বাবা- তুমি করেছ কি। একগুষ্টি যে তারা!"

—বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুকও মিশিয়া গিয়াছে, একটু হাসি-হাসি মুখেই বাপের পানে চাহিয়া রহিলেন। রসিকলাল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তা'হলে কাজ নেই, এলে মানা করে দোব। একেবারে যে পাকা করে বলেছিলাম তা নয়, সে লোকই নয় আমি—বুঝছি কিনা বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে—"

গিরিবালার বড় ভালো লাগিতেছিল। ধীরে ধীরে বহুদিনের সুপ্ত একটি আনন্দ-উৎসের মুখ যেন খুলিয়া গেছে; সেই পিতা, নিত্য ভুল আর বেহিসেবের জন্য মা হইয়া যাঁহাকে আগলাইয়া ফিরিতে হইত—চার বৎসরে এতটুকুও বদলান নাই। এদিকে 'কাজের কথাটা' যে ওলালদের নিমন্ত্রণ করার অতিরিক্ত কিছু নয়—তাহাতেও মস্ত বড় একটা আশ্বাস আনিয়া দিয়াছে। নিজের অভিমতটুকুতেও সত্যের রূপ ফুটাইবার জন্য কতকটা যেন রাগিয়াই বলিলেন—"হ্যাঃ, তোমার ঐ এক রোগ বাবা, একবার বলে আবার বারণ করে দেওয়া। আহা গরীব মানুষ সবার যোগাড় যদি হয় তো ওদের হ'তেই যত আটকাবে?... আমি কিন্তু বাবা দেখি ওদিকে, আর বসে থাকলে চলবে না।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়িটাতে আয়োজনের চঞ্চলতা পড়িয়া গেল। একটু বেশি করিয়াই পড়িল,—একেবারেই কেহ প্রস্তুত ছিল না, তাহার উপর আবার লোক অনেকগুলি। বসন্তকুমারী আসিয়া রাই-মণি আর নন্তীকে ডাকিয়া আনাইলেন, কিশোর গিয়া হারাণের বৌকে ডাকিয়া আনিল। বাড়িতে জিনিসপত্র যাহা ছিল সেইসব লইয়াই কাজ আরম্ভ হইয়া গেছে, এমন সময় নাতিকে বুকে লইয়া অন্নদাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পিছনে একটা বড় বেতের চাঙারিতে জিনিসপত্র লইয়া হারাণ।

স্বামীকে দেখিয়া বসন্তকুমারী খবরটা দিতে যাইতেছিলেন, অন্নদাচরণ বলিলেন—"আর বলতে হবে না, জানি।"

একটু চকিত হইয়া গলা নামাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"জামাই বাড়িতে নাকি?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"না, ফেরেন নি এখনও।"

অন্নদাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"কপালে যেটুকু লেখা আছে খণ্ডন হবে না তো? ভাবলাম জামাই এসেছেন, কালকে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি,—করতে হয় তো?—ওমা, ঘোষাল-কাকাকে বলতে গেলাম, মুখের পানে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"কেন, আজ কি হ'ল?"

আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছি—এ আবার কি জিগ্যেস করা ঘোষাল কাকার। একটু চেয়ে থেকে বললেন—"বলছিলাম, রসিক যে এইমাত্র আজকে রাত্রের কথা বলে গেল?"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, হাসির মধ্যেই অন্নদাচরণ বলিতে লাগিলেন—"বোঝ তখন আমার অবস্থাটা! নেমতন্ন করব কি, কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। বললাম—ভায়াকে বলে দিয়ে-ছিলাম যদি মাছটা পেয়ে যায় তো আজই ব্যবস্থা করতে, বলে আমি ময়রাপাড়ায় চলে গিয়েছিলাম; তা'হলে পেয়েছে নিশ্চয়।

আর দাঁড়ায় সেখানে? মিত্তিরদের বাড়িটা ঘুরেই পা চালিয়ে দিলাম, পথে দুলাল বাগ্‌দীর সঙ্গে দেখা। হ্যাঁরে, তোদের বামুন ডাক্তারদা কোথায় বলতে পারিস?'...'তিনি তো আমায় মাছের কথা বলে ময়রাপাড়ার দিকে গেলেন।'...'কত মাছ আনতে বলেছে তোকে?'...'দশ সের, বারো সের, যা পাই?'...তোদের নেমতন্ন করেছে তো?...'না করলেও বসে থাকতাম নাকি দ'ঠাকুর? কার খাচ্ছি?—কার কিরপেয় বেঁচে আছি?'

মনে মনে বুঝলাম আজ ভায়া দয়ে মজাবেন আমায়। দুলালকে তাগাদা দিয়ে ছোট্ট সোজা নিতাইয়ের দোকানে। দেখি হারাণবাবু আমাদের মাচানের ওপর গদিয়ান হয়ে কলকে হাতে করে লম্বা-চওড়া গল্প...."

হারাণ জিনিসপত্তরগুলা চ্যাঙারি হইতে নামাইয়া, বাণ্ডিলগুলা খুলিয়া দিতেছিল, বলিল—"হারাণের বলে মাথার ঠিক ছেল না এদিকে। যত বলি অত তাড়াহুড়ো করে না বাবাঠাকুর, দু'দিন পরেই হবে, কার শুনতে ব'য়ে গেছে? সামলাতে সামলাতে চোখের সামনে তিনটে বাড়ি নেমতন্ন হয়ে গেল—তার মধ্যে একটা আবার দুলো বাগ্দী—রাক্ষসের ঝাড়।…হারাণকে ঢালোয়া হুকুম হ'ল, তুই নিতাইয়ের দোকান থেকে মালপত্তর কিনে নিয়ে আয়।…বললাম 'কত কি একটা আন্দাজ করে দাও একটা ঠাকুর।' 'ঐ তো লোক দেখলি, আরও জনকতক ওর ওপর চাপিয়ে নিয়ে আয় না নিতাইয়ের দোকান থেকে, আমারাই চারিদিক দেখতে হবে তার মানে কি?' ..জিগ্যেস করলাম পথে যেতে আর কাউকে বলবে নাকি?' তার জবাব হ'ল—'এখানে দাঁড়িয়ে পথের কথা কি করে বলব?'.. মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—হয়ে নিতাইয়ের দোকানে গিয়ে বললাম 'আদ্দেক গাঁ নেমতন্ন, হিসেব করে মালপত্তর ওজন ক'রে দাও তো নিতাই মামা।'…মাথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে হুঁকো থেকে কলকেটা নিয়ে একটু গুছিয়ে বসেছি, এমন সময় ঘুরে দেখি বড়দাঠাকুর;—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সভায় যেন শ্রীকিষ্ণ এসে পৌঁছ-লেন—ধরে প্রাণ এল বড়-মাঠাকরুণ, মিথ্যে বলছি না.."

'শ্রীকৃষ্ণ' অন্নদাচরণ অবশ্য ছিলেন না। "ওর বক্তার শুনলে চলবে না; যেমনি মনিব—তেমনি চাকর—আমি একবার ময়রা পাড়াটা ঘুরে আসি" বলিয়া গোড়াতেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। বিবরণ সাঙ্গ করিয়া রসিকলালের আহ্বানে হারাণ তামাক সাজিতে চলিয়া গেল। বিচিত্র নিমন্ত্রণ কাহিনীর আলোচনায় হাস্য কৌতুকের মধ্য দিয়া কাজ আগাইয়া চলিল।

অনেক রাত হইল, একটি আনন্দ-মুখরিত রজনী। কেহ জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না কত রাত্রি হইয়াছে। চার বৎসর অতীত হইয়াছে পণ্ডিতমশাইয়ের ললাটে বলিরেখার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, কেশ-শ্মশ্রুর মধ্যেও বার্ধক্যের বিজয় অভিযান আরও সুস্পষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষটি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। বিপিনবিহারীর মনে পড়িল পাণ্ডুলের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝার কথা। এইসব এক ধরণের লোক—স্পষ্ট দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এরা অভ্রান্ত পদক্ষেপে স্বর্গের কাছে পৌঁছিয়া যাইতেছে—আরও কাছে—ক্রমেই আরও কাছে•• যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ কি এই ধরণেরই একটা কিছু ব্যাপাব ?

পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—"ভুলিনি ভায়া পাণ্ডুলের কথা। কোন্‌দিন দেখবে 'অয়মহম্ ভোঃ' বলে ঠেলে উঠেছি, ওদেশ মরবার আগে একবার আমার দেখতেই হবে, হিমালয়ের যা বর্ণনা দিয়েছ তুমি।"

"সে এক অপূর্ব দেশ ঘোষাল," বলিয়া বিপিনবিহারীর মুখে যেরকম শুনিয়াছেন নিজেই সেইভাবে খানিকটা বর্ণনা করিয়া যান; তাহার পর বলেন "তুমিও চলো।"

ঘোষালমশাই বলেন—"লোভ তো হচ্ছে, কিন্তু মরবার আগে কি হয়ে উঠবে ?"

আনন্দের মজলিসে অল্প হাসির কথাতেই হাসি ঘন হইয়া ওঠে। বিপিনবিহারীর ঠাট্টার সম্পর্ক, তাহা ভিন্ন নিতান্ত যে মিন-মিনে লাজুক প্রকৃতির জামাই তাহাও নয় তিনি,—ঘোষালমশাইয়ের পানে চাহিয়া একটু অনুযোগের কণ্ঠে বলেন—"এতো সুখ্যেতি শুনেও আপনি আমাদের দেশটাকে যমপুরী না বলে ছাড়লেন না ঠাকুরদা!"

আবার হাসির ওপর হাসি ভাঙিয়া পড়ে। উঠানে মাছ লইয়া

যে মজলিস বসিয়াছে; সেখানে প্রতিধ্বনি পৌঁছায়, হারাণের বৌ বলে—"জামাই কি বললেন, তাইতেই হাসি। তাড়াহুড়োর মধ্যে হল বিয়ে, কিন্তু গাঁয়ে আর এমন একটি জামাই এল না। সাঁত-রাতেও দেখতাম কিনা—যাতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, হাসিতে হল্লাবে বাড়িটা যেন গমগম করত। সার্থক জামাই হয়েছে ঠাকরুণদের।"

দুলালের বৌ মুড়া কাটিতে কাটিতে সমস্ত ঝোঁকটা বোঁটির উপর দিয়া বলে—"হবেনি?—ধর্ম্মঠাকুরের চৌকাঠে অতকরে কপাল কুটনু মাংনার নাকি?..কত বড় জাগ্‌গত দেবতা। ওনার হাত থেকে নাকি মিনমিনে জামাই বেরুতে আছে?"

৪

বিপিনবিহারী তিনদিন পরেই সাঁতরায় চলিয়া গেলেন, চার বৎসর পরে আসিয়াছেন, পূজাটা ঐখানেই কাটাইবেন। তিনি যে বিশেষ একটা বাধা হইয়াছিলেন এমন নয়, তবে যাইতে গিরিবালার বেড়ানটা আরও বাড়িয়া গেল। জেঠাইমা প্রায় সঙ্গে থাকেন, একটু দূরে যাইলে তো নিশ্চয়ই, না হয় হারাণের বৌ থাকে; নন্তী যতদিন রহিল, সে তো নিত্য সঙ্গিনী হইয়াই রহিল।

খোকা বাড়িতেই থাকে, তাহার "খদ্দের" অনেক—দুই দাদামশাই, দুই দিদিমা, মামারা। ছোট দিদিমা কাজের মধ্যে ফুরসৎ কম পান, অন্য সবাইয়ের মধ্যে কিন্তু কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। অন্নদাচরণের নাতিকে বাহিরে দেখাইয়া বেড়াইবার পালাটা শেষ হইয়াছে, এখন উল্টা অবস্থা, নিজেই আগেকার চেয়ে কম বাহির হন, নাতির সঙ্গে বাড়িতেই জমাট

মজলিস বসে। রসিকলালও নাতির টানে মাঝে মাঝে সকাল সকাল ফেরেন, দাদা না থাকিলে দখল করিয়া বসেন। পাড়া বেড়ানর সাথীও হয় খোকা মাঝে মাঝে; এমন আবদার ধরিয়া বসে মা ভিন্ন কাহারও কাছে থাকিতে চায়না। বসন্তকুমারী বলেন—"নে সঙ্গে করে, আর কি করবি? ঝিয়ের কোলে ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে বারমুখো করে দিয়েছিস, ওকি পারে থাকতে?"

গিরিবালা একবার জিদের উপর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—খোকার কান্না যখন শোনা গেল না তখনও যেন পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল। খোকার আবদার জিনিসটা অদ্ভুত—সামনে থাকিলে সত্যই বিরক্তি ধরে, রাগ হয়। এদিকে রাগ হয় বলিয়াই একটু আড়াল হইলে প্রাণটা যেন আরও বেশি আইঢাই করিতে থাকে। সেই একদিনের অভিজ্ঞতার পর খোকা বায়না ধরিলে আর ছাড়িয়া যান না। জেঠাইমার কথায় বলেন—"তা থাকুকগে না ঝিয়ের কাছে। কে ওকে আসতে বললে? চার বচ্ছর বয়েসের পর লোকে একটু বেড়াবে, না পায়ের বোড় পায়ে পায়ে…"

বসন্তকুমারী সত্যই রাগিয়া ওঠেন, বলেন—"চুপ কর্ গিরি, বড্ড মুখ হয়েছে তোর! ষাট্! ছেলে হোল পায়ের বেড়ি!—চল্ ফিরে; যেতে হবে না তোকে বেড়াতে…"

গিরিবালা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলেন—"চলো, চলো, হয়েছে সবাই নাতির দিকে, গিরির কথাটা কেউ বুঝবেন না; বায়না না ধরলে আর কবে কি বলেছি?"

বহুদিন আগের কথা, শৈলেনের তখন নূতন কলেজ জীবন চলিতেছে। মনে পড়ে একদিন শীতের দুপুরে সহর ছাড়িয়া একটু ভিতরের দিকে চলিয়া যায়—কাজটা যে কি ছিল এখন আর মনে নাই।

বিদ্যুৎ-বাতি ছাড়িয়া রাস্তায় কেরোসিন তেলের ল্যাম্পপোষ্ট, মিউনিসিপ্যালিটির খোয়া বিছান রাস্তা, অবহেলিত হইয়া ক্রমে প্রায় কাঁচামাটিতে দাঁড়াইয়াছে, পাকা বাড়ির পাশে পাশে গোল-পাতায় ছাওয়া মেটে বাড়ির সংখ্যা ক্রমেই চলিয়াছে বাড়িয়া, আর সেই সঙ্গে সবুজের বন্যা। কিছু নয় অথচ লাগে অপরূপ।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে একটি ছোটদল দেখিয়াছিল—একটি সাত আট বছরের ছোট ছেলে, একজন বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা আর একটি বড় মেয়ে বোধ হয় বছর উনিশ-কুড়ি বয়স হইবে। রাস্তার ধারে একটা একতলা বাড়ির সবুজ রং করা দুয়ার খুলিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিল। ঘাসে ভরা ছোট্ট একফালি জায়গা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, ঘরের জানালা হইতে একটি ছোট মেয়ে ডাক দিল—'দিদি তোর ছেলে উঠেছে।"

মেয়েটি একবার ঘুরিয়া দেখিয়া বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া বিপর্যস্তভাবে কতকটা নাকীসুরে বলিল—"ঐ দেখো, তোমরা তো বলো।—বাড়ি ছেড়ে বেরুবার জো আছে আমার?"

বর্ষীয়সী একটু হাসিয়া বলিলেন—"নিয়ে আয়না বাছা, কতদূরই বা যাচ্ছিস।"

এ ফিরিয়া যাইতে যাইতে যে মেয়েটি ডাকিয়াছিল সে একটি শিশুকে লইয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মা গিয়া কোমরের দুই দিকে হাত দিয়া ঝগড়া করিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইল, শিশুটির দিকে চাহিয়া হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকিয়া বলিল—"তোর কি টনক নড়ে নাকি? টনক নড়ে?"

শৈলেন বেশ খানিকটা দূরে ছিল, ছবিটি এত মিষ্ট লাগিল যে অলস গতিকে আরও শ্লথ করিয়া দিল—অবশ্য উদ্দেশ্যটা কেহ না টের পায়, এমন ভাবে। ছেলেটি মায়ের রকম দেখিয়া দুইটি দাঁতে খিলখিল করিয়া

হাসিয়া উঠিল, আবার সেই রকম দোলানি, আবার এক ঝলক হাসি।...
শৈলেন সময় লইবার জন্য রাস্তার ধারে একটা বাড়ির নম্বর মনোযোগ-সহকারে দেখিতে লাগিল।...বর্ষীয়সী স্মিতহাস্যে চাহিয়া আছেন, বোধ হয় পুরাণ মায়ে নূতন মায়ের খেলা দেখিতেছে। বলিলেন—"আয় সরী, আর দোর করিস নি।"

মেয়েটি দুই হাত শিশুর দুই গালের উপর বুলাইয়া লইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া লইল। দুই তিন বার আলগা দিয়া আবার চাপিয়া ধরিয়া একটু যেন কুঁজো হইয়া অল্প একটু ছুটিতে ছুটিতে বর্ষীয়সীর নিকট উপস্থিত হইল।....আসিয়া বুক থেকে শিশুটিকে বাঁ কাঁকালে লইল, তাহার পর সেই মাতৃত্বের ভারানির্জিত গতি,—মন্থর, অল্প অল্প দোললাগা; বর্ষীয়সীর সঙ্গে গল্প হইতেছে তাহার মধ্যে এক একবার প্রগলভ শিশুর গাল দুইটি টিপিয়া ধরা, বলা—"তুই চুপ কর দিকিন, না দেবে কোথাও যেতে, না দেবে দুটো কথা কইতে।..." ভর্ৎসনার পরেই বোধ হয় দুইটা চুম্বন—"চুপ কর, চুপ দুষ্টু ছেলে..."

বহুদিন পূর্বের কথা, তবু নব মাতৃত্বের ঐ ছবিখানি শৈলেনের জীবনে যেন শাশ্বত হইয়া গেছে, যখনই মায়ের বেড়াইবার কথা ভাবে, কলেজ জীবনের ঐ ছবিখানি কি করিয়া আসিয়া মায়ের সঙ্গে যেন মিশিয়া যায়।....বড় দিদিমা চলিয়াছেন, পাশে মা, কোলে শৈলেনের দাদা, শিশু অবস্থায়। পাশে বোধ হয় নন্তী আছে, অথবা রামীর মা, অথবা মামাদের মধ্যে কেহ, অথবা ছবির এই অবান্তর অংশের কেহই নয়। সন্তানের ভারে দুলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন—পথে কাহার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হইল, একটু আলাপ, আবার দোল গতি....ঘোষালের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন—"বৌদি কি করছো গো?....অথবা পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি; শানের বেঞ্চির উপর থেকে ঝরিয়া পড়া

মালতীফুল তুলিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে ডাকিতেছেন—"ঠাকু'মা কৈ গো? আমরা এলুম।" হাসিমুখে পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী আগাইয়া আসিলেন—"এস দিদি, ওমা এই যে বড় বৌমাও এসেছে।" গিরিবালা বলিতেছেন—"আপনিই নাকি এসেছেন? ধরে নিয়ে এলুম, তবে এলেন।" বসন্তকুমারী পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রীকে সাক্ষী মানিয়া বলিতেছেন—"হ্যাঁগা খুড়মা, আর কি তেমন হুট বলতে বেরুতে পারি—তুমিই বলোনা বাছা?—তখন তুই বাড়িতে ছিলি, খুঁটিনাটি কাজগুনো সামলাতিস, ছোটবৌ ওদিকটা সামলাত, জেঠাইমা টহল দিয়ে বেড়াত। আর কি ওর ঘাড়ে সমস্ত ঝক্কিটা ফেলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান চলে? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেড়েও তো উঠছে সংসারটা।"

বেড়ানর কথা থেকেই বেড়ান যেখানে অসম্ভব সেই পাণ্ডুলের কথা ওঠে। ওধরণের অভিজ্ঞতাটা পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রীরও আছে খানিকটা, গল্প অল্পেই জমিয়া ওঠে। নথ অল্প অল্প দুলাইয়া বলেন—"সে তুলনায় তুই তো ঘরের কাছে আছিস, উইজেন কি এখানে?—সাতটা মাস যে কি করেই কেটেছিল!" আবার কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলেন—"তা হোক দিদি, ঐ তোমার এখন সগ্‌গ, মা মঙ্গলচণ্ডী ঐ বাড়িই ভরে দিন তোমার, মেয়ে মানুষের আর কামনা কি বল?

ওদিককার ঘর থেকে অস্ফুটস্বরে কোন সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে পণ্ডিতমশাই গিয়া বাইরের বারান্দায় দাঁড়ান, বোধ হয় কোন কাব্য পড়িতেছিলেন তাহারই জের। এদিককার রক থেকে সামনা-সামনি দুইটা জানালার মধ্য দিয়া কিছু কিছু দেখা যায়—বিরাট সৌম্য-মূর্তি, একটা ভাবের ঘোরে মুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। একটু পরে প্রায় সেই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁগা, গিরি দিদিমণি এসেছে মনে হোল যেন?"

গৃহিণী বলিলেন—"এই তো এল।" পণ্ডিতমশাই আবার যেমন অন্য-মনস্ক হইয়া গেলেন। ইহারা যেন অন্য প্রশ্নের অপেক্ষা করিয়া আছেন ; গৃহিণী বসন্তকুমারীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন…"ঐ রোগ, কি পড়েছেন, কি, কিছু একটা লিকবেন—মাথার মধ্যে ঘুরছে।"…

একবার গিরিবালার পানে চাহিয়া বলেন—গিরি নাকি নন্তীকে বলেছে নাতজামাই বড় নির্ভর মানুষ, ঘোড়ায় চড়া সাঁতার কাটা এই সব নিয়ে থাকেন, ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সে ঢের ভালো বাবা, পড়তো এই রকম আজগুবি মানুষের পাল্লায় !…আজকাল যেন আবার বেড়েছে।"

বসন্তকুমারী বলেন—"ও না পড়ুক, ওর মা পড়েছে—এই মানুষেরই শিষ্যিতো ওর বাবা ?"

একটি মৃদু হাস্য ওঠে। পণ্ডিতমশাইয়ের চমক ভাঙে যে তিনি একটি নূতন প্রসংগ তুলিয়াছেন। বলেন—'আজ আর হবে না ; রসিক আর তর্কালঙ্কারকে আসতে বলেছি, কাল সকালে গিরিকে এখানে খেতে ব'লো।—বিপিনের কাছে তো শুনলাম, ওর মুখে একবার ওর শ্বশুরবাড়ির কথা শুনতে হবে।….হিমালয় দেখেছে ?"

গিরিবালা মুখ টিপিয়া অল্প হাসিয়া কতকটা স্বগতভাবেই বলেন—"দেয়ালের বাইরে কি কি গাছ আছে তাই দেখিনি তো হিমালয় !"

গৃহিণী হাসিয়া কথাটা স্বামীকে বলিতে যান, গিরিবালা তাড়াতাড়ি মুখটা চাপিয়া ধরেন, বলেন—"আঃ, তুমি আমার নেমন্তন্নটা নষ্ট করবে নাকি ?"

হাত ছাড়িয়া আবার সেই ভাবে মুখটা টিপিয়া হাসিয়া বলেন—"গাড়ির দুই ধারে বড় বড় উইঢিপির মতো পাহাড়গুলো দেখলাম কি করতে ? আমি ঠিক কাল চালিয়ে নিবো, দেখই'খন।"

কণ্ঠস্বর তুলিয়া বলেন—"হিমালয় তো নিতুই দেখছি ঠাকুরদাদা; একদিনের নেমন্তন্নে বলা শেষ হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ নামাইয়া বলেন—"না মিললে বলব, তোমার নাতজামাই-ই মিথ্যেবাদী।"

হাসি চাপিতে গিয়া ওঁরা দুজনে দুলিয়া দুলিয়া ওঠেন।

পূজা আসিয়া পড়িল। গ্রামে সাতখানা পূজা, তাহার উপর বারোয়ারি আছে। প্রায় সমস্তদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিমা দেখিয়া বেড়ান, রাত্রে যাত্রা, অপেরা; জেঠাইমা বলেন—"কচি ছেলে কোলে, অসুখে পড়ে যাবি যে মা, বেহিসেবী কাণ্ড হচ্ছে যে।"

গিরিবালা বলেন—"বেহিসেব হ'লে তবে তো মা-দুর্গা ফেলবেন অসুখে?—আমার সেদিকে ঠিক আছে, চার বচ্ছরের পূজো একসঙ্গে দেখছি যে আমি।" জেঠাইমার কথাই ফলে কিন্তু।

মা-দুর্গার দোষ দেওয়াও যায় না—চার বৎসরের যত বেড়ান, যাত্রা, অপেরা কথকতা—চার দিনে উসুল করিতে গেলে সে-হিসাবের গোঁজা-মিল দেওয়া তাঁহারও সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। বিজয়ার দুইদিন পরেই গিরিবালা জ্বরে পড়িয়া গেলেন। ছেলে মানুষের মতো লুকাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। রায়েদের বাড়ি কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত কথকথা, চাটুজ্জে গিন্নি, রাইমণি, রামীর মা প্রভৃতি কয়েকজন উঠানে অপেক্ষা করিতেছেন, জেঠাইমা বাড়ি নাই,—তাড়াতাড়ি সাজগোজ করিয়া লইয়া বাহির হইবেন, মায়ের সামনে পড়িয়া গেলেন। বরদাসুন্দরী খিড়কির পুকুর থেকে উঠিয়া আসিতেছিলেন, মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তোর মুখটা যেন থম্‌থমে ঠেকছে কেন রে গিরি? শরীরটা ভালো আছে তো?"

"ভালো থাকবে না তো কি থাকবে?—তুমি সর্বদাই থম্‌থমে দেখো।"

একটু ব্যাপারের ভঙ্গিতেই কথাটা বলিয়া. মুখটা একটু ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবেন, বরদাসুন্দরী বলিলেন—"দাঁড়া, বোধ হচ্ছে যেন কেমন কেমন।....অগ্রসর হইয়া রাইমণিকে বলিলেন—"আমার হাতটা ভিজে, একবার দেখোতো কপালটা দিদি।...হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ..."

রাইমণি কপালে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—"কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে লো !...কিছু টের পাসনি ?"

ধরা পড়িয়া গিরিবালার জ্বরের তাড়সে রাঙাপানা মুখটা যেন রক্তহীন হইয়া গেল, বলিলেন—"কি ক'রে বুঝব ?...একটু সর্দির মতো হয়েছিল শুধু।"

বরদাসুন্দরী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"টের ভালো রকমই পেয়েছ, লুকুচ্ছিলে।...হ্যাঁগা, ছেলের মা, এখনও কচি মেয়েটির মতন।"

চুপ করিয়া গিয়া সহজকণ্ঠে বলিলেন—"ফেরো. ঢের কথকথা হ'য়েছে।...আমি গোড়া থেকেই পই পই করে...."

আবার চুপ করিয়া গেলেন। রাগটা যেন চাপিয়াও চাপিতে পারিতেছেন না। সকলেই ফিরিলেন, চাটুজ্জে গিন্নি চো'খের ইসারা করিয়া বড় মেয়েকে আর বেশি কিছু বলিতে মানা করিয়া দিলেন। বিছানায় আসিয়া একটু ঢাকাঢুকি পড়িতেই জ্বরটা বেশ জানান্ দিয়া আসিয়া পড়িল। ছেলেরা কেহ বাড়িতে নাই, রামীর মা বসন্তকুমারীকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

প্রথম দিনটা একেবারে আচ্ছন্নভাবেই কাটিল—প্রায় অচৈতন্য অবস্থাতে। দ্বিতীয় দিন থেকে একটা অবসাদ আসিল। পাণ্ডুল হইতে বাহির হওয়ার পর থেকে মনে যে একটা উন্মাদনা আসিয়াছিল, বেলে-তেজপুরের অবাধ মুক্তির মধ্যে যেটা উগ্রতর হইতে হইতে যেন চরমে

পৌঁছিয়া গিয়াছিল—সেটা একেবারে স্তিমিত, নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এর সঙ্গে কোথা থেকে আসিয়া পড়িল একটা ক্ষুব্ধ অভিমান। কাল জ্বরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ার থেকে মা, বাবা, জেঠাইমা, জেঠামশায়ের মুখ থেকে যে কয়টি অনুযোগের কথা বাহির হইয়াছে—যতই মৃদু হ'ক না কেন—সবগুলি মনে যেন ঘনাইয়া ঘনাইয়া ফিরিতে লাগিল। ঠিক তিরস্কার কোনটাই নয়, তবু মন যেন কথাগুলোকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া, তিরস্কারেই দাঁড় করাইতে চায়—গিরিবালা যে চার বছর পরে বাড়িতে পা দিলেন, চার বছর যে তাঁহার কথা কেহ ভাবেন নাই—শুধু গঞ্জনা, কথায় কথায় গঞ্জনা....দিয়া সাধ মিটাইয়া নিন যে কটা দিন আছেন গিরিবালা এখানে....আর, এবার গিয়া আর ফিরিবেন নাকি?—সে-দেশ থেকে ফেরে মানুষ?...কেনই বা ভাবিতেছেন গিরিবালা?—না ফিরিলেই বা কাহার কি আসিয়া যায়? এই চার বৎসরের প্রবাসে তো সে-কথা স্পষ্টই হইয়া গেছে...

অভিমানের জের ধরিয়া মৃত্যুর কথা আসিয়া পড়ে, মনটা পরম বন্ধুর মতো মৃত্যুকে যেন জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে চায়—ওর কমে যেন আশা মেটে না। যাহাদের কাছে ভালোবাসা পাইয়াছেন হেতু অহেতু নির্বিশেষেই কেমন মনে হয়—তাহাদের সবার চক্ষে যদি বন্যা বহাইয়া চলিয়া যান তো ভালো হয়। মনটা গিরিবালা-হীন গিরিবালার জগতের পানে চাহিয়া পড়িয়া থাকে—বাবা, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, মনোমোহিনী, দুলারমন, ঠাকুরপো—এলোমেলোভাবে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য জগৎটির পানে চাহিয়া আছে—জ্বরের ঘোরে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায় একটা....বিনাইয়া বিনাইয়া কত কথা ভাবা, চোখের জল গড়াইয়া বালিসে পড়ে, বেশ লাগে।....বালিস ভিজ্‌ই থাক্—জেঠাইমা আসিয়া প্রশ্ন করিবেন—'তোর বালিস ভিজে কেন রে গিরি? কাঁদছিলি নাকি?'

গিরিবালা শুধু উত্তর দিবেন—'আমি বোধ হয় আর বাঁচব না জেঠাইমা।' ...এই আঘাতটুকুর কল্পনায় মনটা যেন একটা মিষ্টিরসে জরিয়া আসিতে থাকে।

জ্বরের ঝোঁকে একটা রাস্তা ধরিয়া মনটা খানিকক্ষণ চলে, তাহার পর হঠাৎ দিক পরিবর্তন হয়।...কিন্তু খোকা?

গিরিবালা না থাকিলে খোকার কি হইবে? ওর যে মাকে না হইলে এক দণ্ড চলে না। ওযে অসহায় শিশু—নিজের গতি নাই, দৃষ্টি নাই, ভাষা নাই—প্রতিমুহূর্তেই মায়ের কাছে এইসব ঋণ করিয়া ওর চলা, কখন ক্ষুধাটুকু পাইবে সেটুকুরও হিসাব রাখিতে হইবে মাকে,—খোকাকে ছাড়িয়া গিরিবালা যান কি করিয়া? কিন্তু যদি যাইতেই হয়?—গিরিবালার মনটা হঠাৎ হু হু করিয়া উঠে; এতক্ষণ মৃত্যু ছিল একটা সাধ, খোকার চিন্তাতে যেন হইয়া উঠে আতঙ্ক। একটা বিরাট অদৃশ্য-শক্তি; যাহার সামনে খোকার চেয়েও তিনি শতগুণে অসহায়। কোন প্রয়োজনের দিকে না তাকাইয়া সে যদি নিজের প্রয়োজনে, নিজের অমোঘ শক্তিতে তাঁহাকে খোকার কাছ থেকে ছিনাইয়া লইয়া যায়!... অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে অবোধ অন্বেষণে খোকা ডাকিয়া বেড়াইতেছে—চোখে জল, গায়ে ধূলো...খোকার চোখে জল! মোছায় এমন লোক নাই!

দৃশ্যটার উপর গিরিবালার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যায়। খোকাকে বুকে করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন, খোকার জন্য, সমস্ত শরীর নিংড়াইয়া যত স্তন্য আছে—তাহার মধ্যে যেন একটা আলোড়ন জাগে।...

খোকাকে আনাইয়া লন গিরিবালা, যেখানেই থাকে খোকা, আনিয়া দিতে হইবে। যেন ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর লজ্জা করিলে চলে না। ...পিঠে হাত বুলান, চুলে হাত বুলান, পেটটি অল্প অল্প টিপিয়া টিপিয়া

দেখেন, যে অবস্থাতেই থাক্, বলেন—"ওর ক্ষিদে পেয়েছে জেঠাইমা, পেটটা পড়ে আছে।"

জেঠাইমা বলেন—"তা দিই একটু খাইয়ে দুধ, মার দুধ তো এখন খেতে মানা কিনা।"

৫

যথেষ্ট দুর্বল করিয়া দিয়া এবং একটা যেন নূতন জগতে ঘুরাইয়া আনিয়া এগার দিনের মাথায় জ্বরটা ছাড়িল। জের সামলাইতে কিন্তু প্রায় দিন পনের লাগিয়া গেল। বহুদিন পরে জ্বরটা আসিয়াছিল, আর আসিয়াছিলও খুব তোড়ে আর অনেকরকম অত্যাচারের পথ ধরিয়া— দেহে মনে নিজের অধিকারের অনেকগুলি নিদর্শন রাখিয়া গেল।

বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে দুইবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। শেষের বার তিন দিন থাকিয়া গিরিবালা পথ্য গ্রহণ করার পর চলিয়া যান। অসুখের খবর পাইয়া নন্তী আসিয়াছিল, বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আশা করেছিলাম, আরও কিছুদিন প'ড়ে থাকবে …আফিস থেকে ছুটি নেবার খুব সুবিধে ক'রে দিয়েছিল কিনা।"

এবার দেরি করিয়া পূজা, অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। বৈকালে দাওয়ায় কম্বল পাট করিয়া একটু জায়গা করিয়া দেওয়া হয়, রোদটুকু গায়ে করিয়া গিরিবালা বসিয়া থাকেন। বসন্তকুমারী প্রায়ই কোন একটা কাজ লইয়া পাশে বসিয়া থাকেন,—কাঁথা-সেলাই, কি ডাল বাছা, কি গ্রামের কোন নিঃসহায় প্রসূতির জন্য "ঝাল"-এর মশলা তৈয়ার;

এ-বাড়ির সে-বাড়ির কেউ-না কেউ দু'একজনও কাছে থাকে। গল্প চলিতে থাকে। উঠানে কিশোর তাহার দল লইয়া খেলা করিতে থাকে, সমস্ত বাড়িখানিতে কর্মব্যস্ত মায়ের এদিক ওদিক আনাগোনা চলিতে থাকে—কখন কোন একটা গল্পের জের টানিয়া আসেন, কখনও স্বামীর কোন একটা বেহিসাবীপনা লইয়া অনুযোগ।...বেশ লাগে গিরিবালার। স্বাস্থ্যটি অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরাণ জগৎ যেন আবার নূতন হইয়া তাঁহার চোখের সামনে জাগিয়া উঠিতেছে। আসিয়া পর্যন্ত বরাবরই একটা মস্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটিতেছিল বলিয়া বাপের বাড়িকে এমন করিয়া পান নাই। বেশ লাগে, এই সচলতার মধ্যে শুধু নিজে প্রায় বঞ্চিত বলিয়া; স্থাণু বলিয়া—একটু কথা, একটু চলা, একটু হাসি, সব কিছুকেই মনের সমস্ত প্রীতি দিয়া জড়াইয়া ধরেন।

"তোমার মনে আছে জেঠাইমা? ওই কামিনীতলায় আমরাও খেলতুম—আমি, নন্তী, হরিচরণ, পুতি,...আশ্চর্যি নয়।"

"হ্যাঁ, আর এখন তোর ছেলে খেলা ক'রছে। নন্তীর ছেলেটি থাকলে আরও চমৎকার হ'ত।"

বরদাসুন্দরী একটা কাজ হাতে করিয়াই ঘর থেকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান,—বলেন—"ওমা মনে আবার থাকবে না! কি খেলার বাই-ই ছিল মেয়ের! একটা কাঠের পুতুল ছিল,—নাওয়া নেই খাওয়া নেই, অষ্টপহর ছেলের পেছনে হয়রান মেয়ে। 'ওরে গিরি খাবি আয়, রোদে তেতে মুখ যে তোর সিঁদুরবর্ণ হয়ে গেল'...কে কার কথা শোনে?... এখন ছেলে হ'ল তো তার হেনস্তা দেখ না!"

গিরিবালা অভিযোগের কণ্ঠে বলেন—"জ্বালাতন করে যে বড্ড! নাতির দোষটা তো দেখবে না!"

বসন্তকুমারী বলেন—"না, কাজ কি জ্বালাতন ক'রে? কাঠের পুতুলের

মতো একটা নুলো-জগন্নাথ ছেলে হ'ত, চলত না, ফিরত না, জ্বালাতন করত না,—খুব আদর খেত মায়ের।"

কথাগুলার সঙ্গে বসন্তকুমারীর বলিবার ভঙ্গি মিলিয়া সবাইকে হাসাইয়া তোলে।

এক একদিন এমনও হয় যে বসন্তকুমারী থাকেন না, ছেলেরাও থাকে বাহিরে। কর্মচঞ্চল মায়ের সঙ্গে ছাড়া ছাড়া দু'একটা কথা কহিতে কহিতে গিরিবালা পড়ন্ত বেলার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। এই রকম দিনগুলাতে মনে পড়ে পাণ্ডুল। অনেক দিন পরে অসুখের প্রথম অবস্থায় মোতিবালার এক পত্র পাওয়া গিয়াছিল। শ্বশুর মাঝে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে-সময় বৌমার খোঁজই বেশি করিতেন; আর খোকার। খোকা নাই বলিয়া খঞ্জনীর বাপ, মা ওকে জোর-জবরদস্তি করিয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল, আবার পলাইয়া আসিয়াছে. মোতিকে বলিয়াছে এবার এরা যদি বেশি গাজুরি করে তো ও পলাইয়া একেবারে খোকার মামার বাড়ি চলিয়া যাইবে। বলে, এখন তো রেল হইয়াছে, কে কার তোয়াক্কা রাখে? ত্রিনয়নী দাদার জন্য অত্যন্ত হেদায়, হেদাইয়া হেদাইয়া জ্বরে পড়িয়াছিল, এখন ভাল আছে…

গিরিবালার মনটি পাণ্ডুলে পাড়ি দেয়—এখন কেমন আছেন শ্বশুর কে জানে। মা-ই বা কেমন আছেন? আসিবার সময় বড় কাঁদিয়াছিলেন। মাকে বাহিরে বাহিরে মনে হয় শক্ত মানুষ, তিনি যে অত কাঁদিতে পারেন জানা ছিল না।…অল্প গণ্ডী লইয়া সমস্ত পাণ্ডুলটি আসিয়া হাজির হয়। মনটা দোটানার মধ্যে পড়িয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিতে থাকে। পাণ্ডুলের মায়ায় বেলে-তেজপুর যেন কতকটা ফিকা হইয়া যায়। জীবনের এ-সমস্যায় একটা অস্বস্তি ওঠে মনে, পাণ্ডুলে থাকিলে বেলে তেজপুরের দিকে মনটি পড়িয়া থাকিবে, বেলে-তেজপুরে আসিলে মনে হইবে পাণ্ডুল

ছাড়িয়া থাকা শক্ত। গিরিবালা ভাবিয়া সারা হন—এর সমাধান কোথায় ? ...

জ্বরের ঘোরটা যখন খুব প্রবল তখন মামা একবার আসিয়াছিলেন, গিরিবালার আবছায়া আবছায়া মনে আছে। তাহার পর লোক পাঠাইয়া আরও কয়েকবার খোঁজ লইয়াছেন, গিরিবালাকে লইয়া যাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত !

পথ্য পাইবার ঠিক ষোল দিন পরে গিরিবালা, রসিকলাল, সাতু আর হরিচরণের সঙ্গে সিমুরে গেলেন, হারাণ অবশ্য রহিলই।

ইহারা গাড়ির মধ্যে, হারাণ কতকটা পথ গাড়োয়ানের পাশে বসিয়া অতিবাহিত করিল, কিন্তু চুপ করিয়া বা কিছু না করিয়া কাটানো তাহার ধাতে সয় না ; এদিকে হাত নিসপিস করিতেছে, অথচ রসিকলালের ঠিক কানের কাছে তবলা-বাজান দায়, তবু ভুলক্রমে গাড়োয়ানের পিঠে একটা বোলের খানিকটা তুলিয়া ফেলিয়া হারাণ এক সময় টুপ করিয়া নামিয়া পড়িল।

গাড়ির পিছন দিকটায় গিরিবালা আর সাতু, মাঝখানে খোকা। গাড়িতে চড়িয়া মনটা তাহার খুব খুলিয়া গেছে, হাত ছুড়িয়া বেজায় ফুর্তি লাগাইয়া দিয়াছে। মা, বাবা, দাদু প্রভৃতি গোটা পাঁচসাত কথা যা আয়ত্ত হইয়াছে সেই ক'টি লইয়াই প্রবল উৎসাহে ভাজিয়া চলিয়াছে। হারাণ গল্প করিতে করিতে গিরিবালাকে প্রশ্ন করিল—"ছেলেকে তোমার কি করবে গিরিদিদিমণি ?"

গিরিবালা বলিলেন—"তুই চুপ কর দিকিন বাপু ; ছেলে কোথায় তার ঠিক নেই, এখন থেকে তাকে কি করবে ?"

হারাণ একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমায় দাও খোকাবাবুকে গিরিদিদিমণি।"

রসিকলাল হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন তুই নাপতে-গিরি শেখাবি নাকি ?"

গিরিবালা, সাতু, কেষ্ট তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। হারাণ আবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তাই বলমু নাকি ? নাতিকে ঠাট্টা করবে তা হারাণকে সুদ্ধ্য টেনে।"....

হাত দুইটা বাড়াইয়া বলিল—"সাতু দা'ঠাকুর, দাও তো খোকা-বাবুকে। গাড়ির ঝাঁকানিতে ওনার ক্লেশ হচ্ছে। বলতে তো শেখেনি, বোঝবারও মানুষ নেই।"

বাপের ঠাট্টাটার এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়ায় গিরিবালা হারাণের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, এখনও অব্যেস গেল না! তোর কি দশা হবে হারাণ ?"

হারাণ কিছু না বলিয়া খোকাকে কাঁধে চড়াইয়া লইল এবং ছোট একটি দল পাইয়া গতি মন্দ করিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া গেল। গাড়িটা একটু আগাইয়া পড়িল।

একেবারে কোন দূর গাঁয়ের দল একজন প্রশ্ন করিল—"কাদের বাড়ির ছেলে হ্যা কত্তা ?"

"বেলে তেজপুরের বাঁড়ুজ্জেদের,—দৌহিত্তির"

পরিচয় দেওয়ার ঘটায় কেহ আর 'কোন্ বাঁড়ুজ্জে'—এ প্রশ্ন করিয়া হেলো হইতে চাহিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোকার পানে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একজন মন্তব্য করিল—"খাসা ছেলে।"

অপর একজন বলিল—"তা হবে না ? অত বড় ঘরের দৌহিত্তির।"

সিগারেটের রেওয়াজটা নূতন চালয়াছে, পিরাণ গায়ে দিয়া বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে হারাণ সস্তা মার্কার একটা বাক্স পকেটে রাখিয়া দেয় ; কম্পুণ্ডার কি বড় ঘরের নফর বলিয়া পরিচয় দিতে জিনিসটা

খুব সাহায্য করে। রসিকলালের গাড়িটা মোড় ঘুরিয়া একটু আড়াল হইয়াছে, "বড় ঘরের দৌহিত্তির" কথায় হারাণ খোকাকে মাথাটা একটু ধরিয়া থাকিতে বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। একটু যে পিছাইয়া গেল, পা চালাইয়া আবার দলের পাশে আসিয়া পড়িল।....মুশকিল হইয়াছে এমন উৎকট সম্ভ্রম জাগাইয়াছে, কেহ আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেছে না যে সে ফলাও করিয়া পরিচয়টা দেয়। শেষে নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল—"দূরের লোক বলে মনে হচ্ছে কর্তাদের?"

"আমরা সব মৌরি-হাটার লোক। আসছি বাজিৎপুর থেকে।"

"মৌরি হাটা—বড নদীর ওপারে তো? সে তো—বহুৎ দূর।"

"হ্যাঁ, কত্তার গতায়াত আছে নাকি ওদিক পানে?"

"ডাক্তারের কম্পুণ্ডার,—হয় বৈকি মাঝে মাঝে যেতে সে রকম কেস্ থাকলে।"

একটু চুপচাপ গেল, একজন প্রশ্ন করিল—"ডাক্তারটি কে?"

"বেলে-তেজপুরের ডাক্তার রসিক বাঁড়ুজ্জে; বাঁড়ুজ্জে বাড়ির ছোট কর্তা, নাম শোনা নেই?"

ছিল না শোনা নামটা, কিন্তু হারাণ যে রকম বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহাতে 'না' বলিলে নিজেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করা হয়। লোকটা একটু থতমত খাইয়া বলিল—"নাম শোনা আছে বৈকি, তবে চোখে দেখার সৈভাগ্যি হয় নি কখনও। গাড়ির মধ্যে যাঁকে দেখলাম তিনি নাকি? তা...."

এই সময় আরও একটা মোড় ঘুরিয়া গাড়িটা সামনে হইল। রসিকলাল হেলান দিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন। হারাণ একবার দেখিয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উঠিল, বলিল—"তবেই হয়েছে!

রসিক বাঁড়ুজ্জে ঐরকম গরুর গাড়িতে ঠ্যাং কাৎ ক'রে শুয়ে টহল দিয়ে বেড়াবে? তানার বলে ঘোড়া থেকে নামবার ফুরসৎ নেই; সায়েব বাড়ির ঘোড়া;—বিজিট সেরে বাড়ি ফিরেই ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়ে—দুটো সইসে চাঙ্গা ক'রে তুলতে হিমসিম খেয়ে যায়।"

লোকটা একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"আমরা ভাবলাম স্বয়ং ডাক্তার বাবুই বুঝি চলেছেন, চেহারা দেখা নেই কিনা। উনি তাহলে?"

হারাণ একটুও ভাবিল না, উত্তর করিল—বাড়ির সরকার মশাই।"

সাতকড়ি ডাকিল—"হারাণ। কাকা ডাকছেন, শীগগির আয়।"

হারাণ একটুও সঙ্কুচিত না হইয়া বলিল—"চলো খোকাবাবু, সরকার কাকা ডাকছেন।" সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ বাড়াইয়া বিস্মিত দলটিকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ির কাছে গিয়া হাজির হইল এবং রসিকলাল কিছু বলিবার পূর্বেই গিরিবালাকে বলিল—"আর সব বাদ দিয়ে খোকাবাবুকে তুমি মোক্তার করো দিদিমণি;—কি কথার তোড় ছেলের! ঐ অতগুনো লোককে একেবারে তাক্ লাগ্যে..."

রসিকলাল ধমকের স্বরে বলিলেন—"কথার তোড়? ও ঢুলছে দেখে তোকে ডাক দিলাম, শেষে কাঁধ থেকে...."

হারাণ বলিল—"তুমি একটু ক্ষ্যামা দাও বাবা'ঠাকুর, মোক্তারে যেন চোলে না, একবার আমতার কাছারিতে মোক্তারখানাটা দেখে এস গিয়ে!...কি কথা ছেলের! তুমি ঐ করো গিরিদিদিমণি, জামাইবাবু এলেও আমি বলব'খন।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"জজ গেল, মুৎছুদ্দি গেল, ডাক্তার গেল,—মোক্তার! হারাণের কামনাটা একবার দেখছ বাবা?"

রসিকলালও হাসিয়া বলিলেন—"তা বুঝলিনি? ও বেটা পরামাণিকের আর কত বুদ্ধির দৌড় হবে?....এক চাষী গেছল বর্ধমান,

ফিরে আসতে সবাই জিগ্যেস করলে, 'কি গো মোড়লের পো, কেমন দেখলে বল ?' 'না, দেখলাম বই কি, স্বয়ং রাণীমা একটা প্রকাণ্ড সোনার হাঁড়িতে গোবর গুলে ঘর নিকুচ্ছেন, পাশে ইয়া বড়া এক ধামার মধ্যে মুড়ি ;—আমি যেতে....'

সকলে হাসিয়া উঠিল। রসিকলাল হাসির মধ্যেই প্রশ্ন করিলেন—"তোর খোকাবাবু মোক্তার হয়ে সামলা মাথায় দিয়ে কি করবে রে হারাণে ?"

হারাণ মুখটা একটু গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"একে মনিব তায় বামুন, বললে অপরাধ হয়, বলতে চাই না,—ডাক্তার দেখে তো হাড় কালি হ'ল। ডাক্তার হ'য়ে দাদা মহাশয়ের মতো শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবে বৈত নয়। তার চেয়ে মোক্তার হয়ে জোচ্চোর বেটাদের কাছ থেকে যদি বাকি বিজিটের অদ্ধেকগুলোও ট্যাকা আদায় ক'রতে পারে তো পূর্ব্বপুরুষের পাপের পাশ্চিত্তির হয়, হারাণেকেও বুড়ো বয়েসে হক্কের ট্যাকা উস্থল করতে পায়ের সুতো ছিড়তে হয় না।"

হারাণকে চটাইয়া আরোহীদের হাসির মধ্যে গরুর গাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল।

মামার-বাড়িতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথম দিদিমা মারা গেছেন। খবরটা পাণ্ডুলে থাকিতেই গিরিবালা জানিতে পারেন, মনটা অনেকটা প্রস্তুত ছিল, তবুও যতই কাছে আসিতে লাগিলেন মনটা হু হু করিয়া উঠিতে লাগিল, পৌঁছিয়া খুব একচোট কাঁদিলেন। দ্বিতীয় পরিবর্তন, বিকাশদাদার বিবাহ হইয়াছে। বধূটি বাপের বাড়িই ছিল, গিরিবালা আসিতেছেন বলিয়াই তাহাকে আনান হইয়াছে। এগার-বার বৎসরের ফুটফুটে মেয়েটি, সম্পর্কের হিসাবে পায়ের ধুলা লইয়া গিরিবালা

বয়সের হিসাবে স্নেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন; অল্প সময়ের মধ্যেই খুব ভাব হইয়া গেল। কিরকম সম্পূর্ণ নূতন একটা মিশ্র অনুভূতি—বিকাশদাদার কাছে গিরিবালা যে অপ্রমেয় স্নেহ পাইয়া আসিয়াছেন, সেইটিই যেন এই মেয়েটির উপর উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে, শুধু কোথা থেকে টানিয়া আনা খানিকটা ভক্তিরসের সঙ্গে মেশান,—খেলাঘরের পুতুলকে গুরুজন বলিয়া ধরিয়া লইলে যেমন একটা শখের ভক্তি আসে কতকটা সেইরূপ। বড় কৌতুকপ্রদ ব্যাপার।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, যাহা এতদিন পরের মিলনের সমস্ত মাধুর্যটিকে বিস্বাদ করিয়া দিল তাহা এই যে মাসিমা কাত্যায়নীদেবী এখানে নাই। তিনি যে এক আধ দিনের জন্য কোথাও গেছেন এমন নয়, একেবারেই সিমুর ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিতেছেন। এটা ত জানা খবর, মনটা প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু তবু যেন গিরিবালা হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলেন। একদিক দিয়া বাড়িটার আরও বরং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, মামার চাকরিরও উন্নতি হইয়াছে, বিকাশদাদাও তিনটা পাশ দিয়া নিকটের আমতার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন, বাড়িঘর সাজসজ্জা—সব দিক দিয়াই সংসারটা পূর্বের চেয়ে ঢের বেশি গোছানো, নূতন বৌটি যেন সবটুকুর উপর আরও আলো ছড়াইয়াছে; কিন্তু গিরিবালার চক্ষে তবুও যেন সব পূর্ণতাকে অর্থহীন করিয়া মস্ত বড় একটা শূন্যতা রহিয়াছে একা কাত্যায়নীদেবীর অভাবে। বর্তমান প্রত্যক্ষকে ঠেলিয়া, কাত্যায়নীদেবী দিয়া পূর্ণ পূর্বের দিনগুলি সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

মাসিমা বলিলেন—"ঠাকুরঝিকে দেওয়া হয়েছে খবর গিরি; আর বড় একটা আসেন না, তা তুই এসেছিস শুনেছেন, নিশ্চয় এসে পড়বেন এবার।"

একদিন গেল, দুইদিন গেল, গিরিবালার বিস্ময় এবং অভিমান যখন কানায় কানায় পূর্ণ, তখন, তৃতীয় দিনে, কাত্যায়নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু বোধ হয় না আসিলেই ছিল ভালো, গিরিবালার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বজায় থাকিয়া যাইত।—

কাত্যায়নীর অমন চাঁপা ফুলের মতো রঙের উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, সামনের একটা দিক ঘেঁসিয়া এক খামচা চুল পাকিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে গাঢ়তর কালির ছোপ। এগুলা তবুও এক রকম করিয়া সহ্য করা যায়, সব চেয়ে দুঃসহ হইয়াছে কত্যায়নীর চোখের দৃষ্টি। যে দুইটি চোখে হাসি সর্বদাই ছলছলিয়া থাকিত তাহাতে যেন বিশ্বের ক্ষুধা—সহজ ক্ষুধা নয়, তৃপ্তির কোন আশাই না থাকিলে যে একটা অপ্রসন্ন জ্বালাময় ক্ষুধা থাকে সেই ক্ষুধা। মনটা যেন সমস্ত জিনিসের উপরেই জিভ বুলাইয়া ফিরিতেছে, আর সবই বিস্বাদ বলিয়া নিদারুণ হতাশা আর বিরক্তিতে নিজের মধ্যে ক্রমাগতই গুটাইয়া যাইতেছে।

আসিয়াছেন শুনিয়া গিরিবালা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই আগেকার আব্দার-আনন্দের সুরে—"মনে পড়ল গিরিকে ?"—বলিয়া আগাইয়া গিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেলেন। নিস্প্রভ মুখে প্রশ্ন করিলেন—"একি চেহারা তোমার মাসিমা ?"

"আর চেহারা মা!" বলিয়া নামিয়াই গাড়িটার দিকে ঘুরিয়া তিক্তকণ্ঠে ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"এইদিক দিয়ে নেমে মরো না, মুয়ে আগুন!"

একটি বছর তিনেকের ছেলে, রংটা ফ্যাকাশে-কালো, রোগে ডিগডিগে, পেট-জোড়া পিলে, তাহারই উপর একটা সবুজ সার্টিনের

জামা আর তাঁতের কাপড়ে সাজান; কি ভাবিয়া গারোয়ানের কোলে সামনের দিক দিয়া নামিতে যাইতেছিল, কাত্যায়নীর ধমকে মুখ কাচুমাচু করিয়া এদিকে সরিয়া আসিয়া হাত বাড়াইল। "ন্যাংবোট নিয়ে আর পারি না।"—বলিয়া বেশ একটু রূঢ় হস্তেই ছেলেটীকে নামাইয়া দিয়া কাত্যায়নী যেন বেশ চেষ্টা করিয়াই নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন, গিরিবালার দিকে চাহিয়া ক্লান্ত এবং কতকটা আবেগহীন কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন—"কেমন আছিস গিরি? গেলি তো যেন সবাইকে ভুলে গেলি একেবারে।"

মামিমা, বিকাশের স্ত্রীও আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছেন; গিরি-বালা যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এতক্ষণে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম করিলেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"যা সাতসমুদ্র তের নদীর পারে পাঠিয়েছ গিরিকে!....বলছিলাম—তোমার শরীর একি হয়ে গেছে মামিমা?"

"আর শরীর মা! আয় ভেতরে চল্।....কাসিম এগুলো ভেতরে নিয়ে এসো।...বাগানের কিছু তরিতরকারী হ'য়েছে, ভাবলাম গিরি এসেছে, ভালবাসে।...ওরকম হারগিলের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয়?"

ছেলেটি বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গিরিবালা আগাইয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন প্রশ্ন করিলেন "কার ছেলে মামিমা?"

বিকাশের বৌ আসিয়া প্রণাম করিতেছে—"এস মা, চিরএয়োস্ত্রী হও"—বলিয়া কাত্যায়নী আশীর্বাদ করিতেছিলেন, মামিমাই উত্তর দিলেন—"মেজঠাকুরঝির দেওর-পোর ছেলে।"

"বাঃ!...." বলিয়া ছেলেরই হোক বা তাহার পরিচ্ছদেরই হোক একটা মনরাখা প্রশংসা করিতে যাইতেছিলেন গিরিবালা, এমন সময়

বিকাশ খোকাকে কোলে লইয়া উপস্থিত হইল, দীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কার ছেলে বলো দিকিন পিসিমা ?—গিরির !"

কাত্যায়নী কষ্টে সৃষ্টে যেটুকু হাসিখুসির ভাব আনিয়াছিলেন এক মুহূর্তেই যেন উবিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই ;—প্রাণপণে সেটাকে আবার ফিরাইয়া মৃতের হাসি মুখে টানিয়া বলিলেন—"গিরির ? বাঃ !..."

তাহার পর নিতান্ত ভুল শোধরান গোছের করিয়াই অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"দে, আমার কোলে দে।"

কোলে লইয়া একটা চুম্বন দিয়া বলিলেন—"বাঃ, কি চমৎকারটি হয়েছে ! তা হবে না ?"

বিকাশের স্ত্রী তাড়াতাড়ি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছাইয়া দিল, তাহার উপর বসিয়া গল্প আরম্ভ হইল। এতদিনের পর দেখা, তাও দেখা কাত্যায়নী দেবীর সঙ্গে—হাজার রকমের কথা চারিদিক দিয়া ভিড় করিয়া আসিবার কথা, কিন্তু এমন সুর কাটিয়া গেছে, কিছুই যেন যোগাইতেছেনা। বসিয়া মিনিট খানেক অতিবাহিত হইবার পর গিরিবালা বলিলেন—"আমি এসে পর্য্যন্ত তোমার খোঁজ করছি মাসিমা, আজ তুমি না এলে চলেই যেতাম ভেবেছিলাম।"

কাত্যায়নী দেবী ক্লান্তস্বরে বলিলেন—"যা পায়ের বেড়ি মা, আসবার কি যো আছে ? তোর মামিকেই জিগ্যেস কর না, কবার এসেছি এর মধ্যে। গোরু, বাছুর ক্ষেত-খামারগুলো রয়েছে, কিন্তু নিজে যেদিকটা না দেখছি সেদিকটাই পণ্ড ; দেওর সেই রকম, আর দেওর-পোর কথা..."

প্রসঙ্গটা তুলিয়াই ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"তাই কি ছাই নিজের শরীরই ভালো যে..."

মামিমা গিরিবালাকে বলিলেন—"আমরা সবাই বারণ করেছিলাম ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে যেয়ো না তুমি, শরীর টেকবে না, তা…"

কাত্যায়নী যেন একবার সাজান বাড়ি আর সুস্থ মুখগুলির উপর লুব্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া গিরিবালাকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"ভাবলাম শ্বশুরের ভিটে অপগণ্ডগুলোর হাতে পড়ে বরবাদ যাচ্ছে একটু গোছগাছ করে দিগে।….আর ভাইয়ের গলগ্রহ হয়েই বা কতদিন থাকি, তুই-ই বলনা গিরি?"

খোকা কোলের উপর বসিয়া আছে, একে অপরিচিত কোল, তায় না একটু আদর না একটা কথা, অস্বস্তিটা জমিয়া জমিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিয়াছে, গিরিবালা বলিলেন—'ওকি কান্না কেন, বোকা ছেলে? দিদিমা হন যে। ওমা দেখ, ঠোঁট কেঁপে উঠেছে ছেলের।…আয় তবে আমার কাছে।…"

কাত্যায়নীর অস্বস্তিটা বোধ হয় আরও প্রবল ছিল, একবার খোকার পানে ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিলেন—"থাকতে চাইছে না বুঝি। নতুন মানুষ দেখেছে কিনা।…শালা মেড়োর কাছে নতুন মানুষই হব বৈকি।'

রসিকতার সঙ্গে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া—খোকাকে গিরিবালার দিকে আগাইয়া দিলেন। বিকাশের বৌকে বলিলেন—"তুমি বনমালীকে নিয়ে গিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে কিছু একটু খাইয়ে দাও গে তো বৌমা; গল্প গুজবে আবার আমরা ভুলে যাব।"

কথাটার মধ্যে খোঁচা দেওয়ার ভাবটা এতই স্পষ্ট যে এদের মামি-ভাগ্নি দুইজনেরই গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কচি বৌ হইলেও বিকাশের স্ত্রীও যেন একটু কি রকম হইয়া গেল। মামিমা একটু তিক্তকণ্ঠেই বলিলেন—"যাও না বৌমা; দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

গিরিবালা যেন নিজের চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। হঠাৎ এ কি ব্যাপার! তাঁহার মনটা ক্রমাগতই অতীতে ছুটিয়া যাইতেছে—যখন মামার বাড়ি মানেই এক হিসাবে ছিল কাত্যায়নী দেবী;—কথায় কথায় আবেগ ভরে বুকে চাপিয়া ধরা—বিনা প্রয়োজনে উচ্ছ্বসিত আলাপ—গিরি আসিয়াছে, একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে,—দিদিমা বলিতেছেন—"হ্যাঁরে, কাতু, গিরিকে তুই একলাই দখল করে রাখবি"...আজ চার বৎসর পরে একি উচ্ছ্বাস-লেশহীন মিলন। শুধু তাহাই নয়;—গিরিবালার চারিদিকে, তাঁহার সম্বৃদ্ধিকে ঘিরিয়া এক একট বিষ-বায়ুর প্রবাহ!...বাড়িতে মা একবার বলিয়াছেন—"মেজদিদি শুনেছি একটু যেন কিরকম কিরমক হয়ে গেছেন।" আজই সকালে মামিমা একটা "কিন্তু" দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—"মেজঠাকুরঝি আসছেন বটে, কিন্তু..."

ব্যাপারখানা কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গিরিবালার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সমস্ত দিন এইরকম আবহাওয়ার মধ্যেই কাটিল। কাত্যায়নী যেন সমস্ত শক্তি দিয়া সহজভাব আনিবার চেষ্টা করিতেছে, মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য সেই পুরাণ দিনের এক একটা হাসির ঝলকে যেন আসিয়াও পড়িতেছে, তাহার পর আবার বনমালীকে উপলক্ষ্য করিয়া হোক বা যে কোন একটা সামান্য ছুতা অবলম্বন করিয়াই হোক, মনের গ্লানিটা যেন উপচিয়া পড়িতেছে। গিরিবালা আসিয়া দুই দিন বাহির হন নাই, সাধ ছিল মাসিমা আসিলে তাঁহার সহিত পূর্ব্বের মতো বেড়াইতে যাইবেন—এবার আবার গিরিবালার সঙ্গে খোকার পরিচয়—সবার আদরে প্রশংসায় খোকা যেন বোঝাই হইয়া যাইতেছে—কল্পনাতেই গিরিবালার বুকটা যেন ভরিয়া উঠিতেছিল।....আর বাস্তব

এই,—খোকা পর্য্যন্ত একটু আদর পাইল না মাসিমার কাছে।....
গিরিবালার কণ্ঠটা মাঝে মাঝে যেন অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—একটা
প্রশ্ন ঠেলিয়া উঠিতেছে—'এ কি!—এরকম কেন?'

উত্তরটা বিকাশ দিলেন।

পরের দিন সকালে উঠিয়া কাত্যায়নী অপ্রত্যাশিতভাবেই যাওয়ার
জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিলেন। ভাই, ভাজ, গিরিবালা তিনজনেই
বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"সে কি।"

কাত্যায়নী বনমালীকে দেখাইয়া বলিলেন—"থাকবার জো আছে?
ওই ল্যাংবোট, ওর হ্যাপা কম?...যখন আবার কখনও আসবি, আমি
যেন খবর পাই গিরি, নৈলে বড্ড রাগ করব।"

সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলিয়া গেলেন, সকলেই অনুভব
করিল তিনি যেন বাঁচিলেন।...এরা সকলেও যে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন
একথা নিজের মনে মনে কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

পরদিন ছিল রবিবার, বিকাশের ছুটী বটে, কিন্তু এই দিনটিতেই
বিকাশের অবসর সবচেয়ে কম, ওঁর কি সব নানারকম সমিতি আছে,
সংঘ আছে, মুষ্টি ভিক্ষাসংগ্রহের ব্যাপার আছে, ঔষধ বিতরণ আছে সেই
সব লইয়া সাতদিনের কাজ এই একটা দিনে ওঁকে যেন অভিভূত করিয়া
ফেলে। সকালবেলা বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, দুপুর গড়াইয়া গেলে
একবার আসিয়া খুব তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আবার বাহির
হইয়া গেলেন। আহারের সময় গিরিবালা খোকাকে লইয়া একটু

আটকাইয়া গিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি পাখা হাতে করিয়া আসিয়া দেখেন বিকাশ দুধের বাটীতে চুমুক দিতেছেন। বিস্মিতভাবে পাখাটা একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওমা, একি! আমি কোথায় আসছি হাওয়া করতে করতে বিকাশদার সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করব ..আর একি খাওয়ার ছিরি!"

বিকাশ উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"বড্ড ব্যস্ত আছি গিরি, রবিবার—মরবার ফুরসৎ থাকে না। তা, তুই আছিস আজ সকাল সকালই ফিরবখ'ন, তাড়াতাড়ি একটা পান দে দিকিন্।"

পান লইয়া আসিল বধূ, বলিল—"দিদি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।"

বিকাশ পানটা হাতে লইয়াই পা বাড়াইয়াছিলেন, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কাঁদছে!—কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে একটু অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন—"হুঁ, কাঁদবেই এবারে, সে-আদরটা পাচ্ছে না কিনা, পিসিমার কাছে খুব ধাক্কা খেলে, তারপর আমিও···পোড়া চাকরি যে হয়েছে কাল...চলো তো কোথায় দেখিয়ে দেবে····"

দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"না, থাক্ এখন। ওকে বুঝিয়ে বোল—এখনও জন তিরিশেক লোক ব'সে আছে ওষুধের জন্যে, পারবে?···বোল আমি আজ শীগ্‌গিরই আসব, অনেক গল্প বাকি রয়েছে কিনা গিরির সঙ্গে—এইভাবে বোল।" দুয়ারের নিকট আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আর মাকেও একটু আড়ালে বলে দিও যেন কাছে কাছে রাখেন···হবেই অভিমান একটু ওর····"

অবশ্য শীঘ্র ফেরা হইল না। তবে অন্য মানুষ হইয়া ফিরিলেন একথা ঠিক।—

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া একটু রাত্রিই হইয়াছে। হেমন্তের কুহেলী-লিপ্ত জ্যোৎস্নায় উঠানটা ভরিয়া গিয়াছে। কোণের শিউলি গাছটা থেকে আধ-ফোটা ফুলের গন্ধ উঠিয়াছে। দাওয়ায় একটা মাদুরে বসিয়া গিরিবালা, খোকা, বিকাশের বধূ। গল্প হইতেছে; এমন সময়—"গিরি কি করিস রে এ।" বলিয়া বিকাশ মন্থরগতিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া শিউলি গাছটার দিকে অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ফুল সঞ্চয় করিলেন, সেগুলোকে লুফিতে, লুফিতে শুঁকিতে শুঁকিতে দাওয়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—"গল্প করছিস? মস্তবড় সঙ্গী পেয়েছিস তো!" বধূ উঠিয়া গেল!

বিকাশকে অদ্ভুত দেখাইতেছে। সকালবেলার সে উৎকট ব্যস্ততার জায়গায় একটি সমাহিত শান্তি তাহার মুখে, চোখে, দীর্ঘচ্ছন্দ দেহটিতে ছাইয়া আছে। সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিবার কারণ গিরিবালা বধূর কাছে, মামিমার কাছে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া শুনিয়াছিলেন, বিকাশদাদার উপর এমনি তাঁহার যে সহজ প্রীতি আর ভক্তি সেটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন দেখিয়া মনে হইল সত্যই অনেক সেবা, অনেক কৃচ্ছ্রের পুণ্য লইয়া বিকাশদাদা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোন গ্রন্থ পড়িয়া উঠিলে যেমন পণ্ডিতমশাইকে দেখায়, পূজা করিয়া উঠিলে দেখায় যেমন জেঠ-শ্বশুরকে—বিকাশদাদাকে ঠিক সেই রকম দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু সে কথা অবশ্য বাহিরে বলিবার মেয়ে নন, সকালের অভিমান টানিয়া বলিলেন—"কি করবো, যাঁদের ভালো বলে গুমর তাঁরা নিজের পুণ্যির জোগাড়েই ব্যস্ত। আমার ওই ভালো, গরীবের রাঙই সোনা!"

"রাগ করেছিস। না, রাগ করিস নি গিরি; ছ'টা দিন চাকরির পরে, এই একটা দিন নিজের বলে পাই...."

পাশ থেকে একটা টুল টানিয়া লইয়া বসিয়া কতকটা নিজের মনেই বলিলেন—"বড্ড গরীবরে, বড্ড কষ্ট, হাজার বচ্ছর হয়ে গেল পায়ের থেৎলানি খাচ্ছে কিনা...."

বেশ অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন। গিরিবালা টুকিলেন না। অবশ্য হাজার বৎসরের থেৎলানি খাওয়া যে কি বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, তবে আনন্দ হইল সেই ছেলেবেলার বিকাশদাদা যেন ফিরিয়া আসিতেছেন; নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

একটু পরেই যেন এ ভাবটা চেষ্টা করিয়াই মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিকাশ বলিলেন—"আমি এবার তোর সঙ্গে ভালো করে কথা কইতে পারিনি, মানে এখন পর্যন্ত পারিনি, তবে কাল ছুটি নিয়েছি, তুই এসেছিস বলেই; তা ভিন্ন তোর ছেলেটার সঙ্গেও ভাব করতে হবে। পারি নি তেমন কথা কইতে, কিন্তু তোকে যে না দেখছি, তোর কথা যে না ভাবছি এ মনে করিস নি গিরি।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"কেতাত্ত হ'য়ে গেলাম।"

বিকাশও হাসিল, বলিল—"ঠাট্টা নয়, সত্যি।"

তাহার পরই ধীরে ধীরে মনের উৎসটা যেন খুলিয়া গেল। বিকাশ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ভগ্নীর পানে চাহিলেন, তাহার পর খোকার দিকে চাহিয়া উঠিয়া বলিলেন—"দে ওকে আমার কোলে, আসবে?"

"তা কোল-ক্যাংলা আছে।—"বলিয়া গিরিবালা খোকাকে বিকাশের হাতে তুলিয়া দিলেন। বিকাশ আবার টুলে বসিয়া খোকার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"বেশ হয়েছে এটা,....আর একটা কি কথা জানিস?—তুই লজ্জা পাবি, তবু বলি—এ হ'য়ে তোকে যেন আরও মানিয়েছে,—তোকে দেখে আগে শুধু স্নেহ হোত, এখন শ্রদ্ধা হচ্ছে গিরি। তোরা মা হয়ে কি আশ্চর্য রকম বদলে যাস আর বেড়ে যাস!

আমার কি মনে হয় জানিস ? পুরুষের বাপ হওয়া আর মেয়েছেলের মা হওয়া এক ধরণের ব্যাপার নয়। পুরুষ বাপ হয়েও যা ছিল তাই থাকে, মেয়েছেলে মা হয়ে একেবারে অন্য জিনিস হয়ে যায়। শুনলে তোর হাসি পাবে—বয়স যখন কম, আমি এক একবার ভাবতাম মেয়ে-ছেলের পৈতে হয় না কেন। রাগ হোত পুরুষদের একচোখোমিতে—নিজে একেবারে দ্বিজ হ'য়ে গেলেন, ঢাক ঢোল পিটিয়ে, ও বেচারিরা 'নমঃ' ছেড়ে—'ওঁ' বলবারও অধিকার পেলে না। তারপর একদিন মনে হোল, না, ওদের দ্বিজত্বের ব্যাপারটা যে ভগবান নিজের হাতে রেখেছেন, মা ক'রে যে ওদের আরও বদলে দেন, একেবারেই একটা নূতন আর ঢের বড় জীবন দেন, পুরুষ যে জীবনের নাগালই পায় না।... তুই লজ্জা পাচ্ছিস গিরি, থাক আর না হয় বলব না। কি জানিস ? কথাগুলো যখন মনে জাগে, তোর কথা মনে পড়ে, আশা আমার মস্তবড় কিনা যে তুই আদর্শ মা হবি। মস্তবড় আশা একটা...”

অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন, যাহোক উপলক্ষ্য করিয়া বলা, সে বুঝিল কি না বুঝিল যেন খেয়াল থাকে না ; কতকটা উত্তেজিত ভাবেই বলিয়া ওঠেন—“উ:, সেদিন প'ড়ছিলাম ভিক্টোর হিউগো·· ফ্যান্‌টাইন্!—মেয়ের খরচের জন্যে নিজের ডুসারি দাঁত বিক্রি ক'রে দিলে—কাঁচা ডুসারি দাঁত। একবার বড় ইচ্ছে হয় ভগবানের সভায় গিয়ে ফ্যান্‌-টাইন্‌কে দেখি—লক্ষ কোটি পুণ্যবলে মহাপুরুষ—পুণ্যের প্রভায় সূর্যের মত ভাস্বর, তাদেরই পাশে ফ্যানটাইন্—কাপড়-ছেঁড়া, চুল ছেঁড়া ; বিদন্ত কুৎসিৎ মুখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে, চোখে সন্তানের জন্য পাগলের দৃষ্টি...দেখি সেদিনকার জ্যোতির মুকুট কার মাথায় তুলে দেন ভগবান, সেই চরম মায়ের কাছে কোন্ যোগলব্ধ পুণ্য না নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়...

ভগবান তোদের চেনেন। মায়ের জাত এখানে চিরকাল—যুগযুগ ধরে কষ্ট পেলে, যত রকম কষ্ট আসতে পারে পুরুষের কল্পনায়; কিন্তু যে তোদের গ'ড়লে সে তোদের চেনে। আমার কথাগুলো একটু কেমন কেমন শুনতে হয়, কিন্তু দেখ্‌না পুরুষ যতদিন বাপ হয় মেয়েছেলেকে তাব চেয়ে ঢের বেশি দিন মা হয়ে থাকতে হয়—মায়ের দরকারই বেশি সে তাঁর দৃষ্টিতে।”

একটু চুপ করিলেন, সেও যেন উচ্ছ্বাসের একটা রূপ—কথা নিজেদের ভিড়েই যেন আবদ্ধ হইয়া গেছে।....খোকা মুখটা হেলাইয়া দুলাইয়া নতদৃষ্টি জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধীরে ধীরে তাহার রেশমের মতো কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—“রাগ ধরে না?—সব-কবিই আজ পর্যন্ত মেয়েদের প্রেয়সী রূপটাকেই বড় ক'রে গেল...”

তাহার পর আরও আত্মগতভাবে বলিলেন—“ওর চেয়ে উঁচুসুরে বীণা বাঁধবে—সে শক্তিই বা কোথায়?”

এরপর চুপ করিলেন একটু বেশিক্ষণ পর্যন্ত; গিরিবালা মাদুরের একটা কাঠি খুঁটিতেছেন—এমন গুরুভার একটা প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে কি করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন চিন্তা করিতেছেন। বিকাশ ব'লয়া উঠিলেন—“গিরি এবারে তোব বড্ড কষ্ট হ'ল এখানে এসে, না?”

গিরিবালা মুখ তুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—“সে কি কথা!—কেন?”

“হয়েছে কষ্ট।”

গিরিবালা প্রায় ভীত হইয়াই বলিলেন—“কেন? তুমি থাকতে পারছ না ব'লে বিকাশদা?...তুমি অতগুলো ভালো কাজ নিয়ে...”

“আমার না থাকবার জন্যে নয়, আমি তো ছুটিও নিলাম, কাল

খালি তোর সঙ্গে গল্প করব, তোর শ্বশুরবাড়ীর কথা বাকি আছে, তুই বলে উঠতে পারবি না।...তুই কষ্ট পেয়েছিস মেজপিসিমার জন্যে।"

গিরিবালা যেন কূল পাইলেন, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বলিলেন—"সত্যি বিকাশদাদা, মাসিমা কী হয়ে গেছেন।—কেন বলতো?"

বিকাশ একটু ভাবিয়া বলিলেন—"খুব সোজা কথা গিরি;—পিসিমা মেয়ে হ'য়েও মেয়ে হওয়ার সার্থকতা পেলেন না। তারপর অর্ধেক জীবন ধরে অক্লান্তভাবে নানান দিক দিয়ে পিসিমা সেই সার্থকতাকে খুঁজেছেন। যাকেই পেয়েছেন খালি বুক দিয়ে তাকেই জড়িয়ে ধরতে গেছেন। আমি অত আদর কারুর কাছে পাইনি, তুইও নিশ্চয় সেই কথাই বলবি;—শুধু তাই নয়। আমাদের সমস্ত সংসারটা ছিল মাত্র একজনের সংসার—মেজপিসিমার। তোর বিয়ের আগে পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল, পিসিমা নিজের মনের গুণে পরকে আপন করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সংসার ক'রে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি বুঝতে পারেন যে সেটা ওপরে ওপরে। ওঁর মনের মধ্যে ঘুণ ধরে গিয়েছিল। একটু অদ্ভুত শোনাবে; কিন্তু আমাদের সংসারই ওঁর মনে সেই ঘুণ ধরালে, যে আনন্দটুকু উনি এখানে পাচ্ছিলেন, সে আনন্দটুকুই যেন ওঁকে পথ দেখিয়ে বলে দিলে তাকে এক জায়গায় আরও নিবিড়ভাবে পাওয়া যেতে পারে। বাপের বাড়ির চেয়ে শ্বশুরবাড়িই মেয়ের ঢের বেশি আপন, কেননা সেইখানে তার সৃষ্টির সার্থকতা। সেই আপন জায়গায় সংসার পাতবার নেশা চাপল মেজপিসিমার, এই নেশার ঝোঁকেই তোর সর্বনাশ করতে বসেছিলেন অবশ্য নিজের মনকে না জেনে।"

সেই পুরাণ স্মৃতিটাই যেন বিকাশের মুখটা বন্ধ করিয়া দিল; আবার বলিতে লাগিলেন—

"উনি তখনও বুঝতে পারেন নি যে উনি আসলে কি চান। পিসিমা

আসলে খুঁজেছিলেন ওঁর পেটের সন্তানকে—যে সন্তানের জন্যে ওঁর বুকের দুধের সঙ্গে ওঁর বুকে স্নেহ জমান ছিল। আমি পিসিমাকে কম ভালবাসিনি, কম ভক্তি করি নি, এখনও—ওরকম হয়ে গেলেও—একরত্তি কম করি না, কেন না আমি পিসিমার জীবনের যা বিড়ম্বনা তা ভালো রকমই বুঝি। তা সত্ত্বেও উনি একদিন মেয়েমানুষের সহজ চৈতন্য দিয়ে বুঝতে পারলেন—ওঁর অন্তরাত্মা যা খুঁজছে আমি তা নয়, হতে পারি না—আমার দেওয়া তৃপ্তিটা খাঁটি নয়,—সেই অমৃত নয় যার শক্তিতে মেয়েমানুষ নিজের উদ্দেশ্যে বাঁচে সংসারে। নিরাশ হয়ে ওঁর মন ছুটল মেয়েমানুষের আপন জায়গায়—শ্বশুরবাড়িতে। দেওর-পোকে নিয়ে সংসার গড়বার নেশা চাপল; দেওর-পো হোল স্বামীর ভাইয়ের ছেলে, নিজের ভাইয়ের ছেলের চেয়ে নিশ্চয় কাছে। এই নেশার ঘোরেই পিসিমা তোকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন; উনি পারলেন না, তার কারণ ক্ষিদেয় ওঁর মধ্যকার আসল মানুষটি তখনও মরে যায় নি, সে মরবার আগে তার শেষ জয় নিষ্পন্ন করে গেল।

তারপরেই কিন্তু পিসিমা বদলে গেলেন। অত্যন্ত ক্ষিদেতে যেমন ক'রে মানুষে খুব বেশী খেয়ে মরে না?—পিসিমার তাই হোল। অপদার্থ দেওর-পোর ওপর নিজের সব স্নেহ উজোড় ক'রে, নিজের সব সম্পত্তি উজোড় করে, তার বিয়ে দিয়ে, নাতি-নাতনির মুখ দেখে একেবারে হৈ-হৈ করে ঘর সংসার আরম্ভ করে দিলেন—তার সমস্ত অত্যাচার ছেলের অত্যাচারের মতোই অঙ্গের ভূষণ করে নিয়ে। দু'-আড়াইটা বছর কাটিয়ে দিলেন যেন একটা ঘোরের মধ্যে, ক্রমাগতই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে—পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি, এতদিনের খোঁজা সার্থক হয়েছে।

তারপর ক্লান্তি এল, বুঝতে পারলেন এখানেও আলেয়ার পেছনে

এতদিন ছুটোছুটি করেছেন মাত্র।....ধোকা খেয়ে খেয়ে ওঁর এখন সমস্ত পৃথিবীটার ওপর এসে গেছে আক্রোশ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস। নাতিটার প্রতি ব্যবহার দেখলি না? অবস্থা গতিকে ছাড়তে পারেন না, কিন্তু দু'চক্ষের বিষ, পাশে থেকে ও শুধু যেন মনে করিয়ে দেয় সমস্ত সংসারটা এই রকম—অথচ ছাড়বার জো নেই—আলেয়া শুধু নিরাশ করে নি—উলটে তাড়া করে বেড়াচ্ছে···তুই এই অসহায় অবস্থায় পিসিমাকে দেখলি।

পিসিমাকে দুষিস্ নি গিরি। নিঃসন্তান বালবিধবার এই জীবন,—কেউ উপায় নেই জেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে—সেইভাবে চুইয়ে চুইয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কেউ হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়,—'পেয়েছি' বলে অনেকে ধরতে ধরতে ক্লান্ত হয়ে বিরূপ হয়ে ওঠে। পিসিমা তাই।

পিসিমাকে দুষিস্ নি। শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস উনি যেন আর না বাঁচেন ; এখন তবুও কিছু আছেন, আর বাঁচলে পিসিমা হ'য়ে উঠবেন ভয়ঙ্কর—যদি একান্তই উন্মাদ হ'য়ে না যান।

অথচ সমস্তর গোড়ায় মাত্র একটি কথা ;—পিসিমা সন্তানের মা হতে পারেন নি।"

৮

সমস্ত শীতটা বেলে-তেজপুরে কাটাইয়া—ফাল্গুনের মাঝামাঝি গিরিবালা পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিলেন।

বিপিনবিহারী গিরিবালার অসুখ ছাড়িবার দুই তিন দিন পরেই

পাণ্ডুলে চলিয়া যান। ফাল্গুনের গোড়াতেই মধুসূদন সাঁতরায় আসিলেন; বাড়িতে খানকতক ঘর বাড়ান হইতেছে, একবার দেখিয়া যাওয়াটা উদ্দেশ্য; সেই সঙ্গে গিরিবালাকে লইয়া যাওয়া। দিন সাতেক সাঁতরায় কাটিল। এবারে সাঁতরা ভালো লাগিলনা,—মনোমোহিনী দেবী, তাঁহার পুত্রবধূ, খেতন—ইঁহারা কেহই নাই, মনোমোহিনী দেবীর কোনও দেওর-পোর বিবাহ, সেই উপলক্ষে শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। একে বাড়ি ছাড়িয়া আসিতে এবারে প্রথম বারের চেয়ে কষ্ট হইয়াছে, (হয়ই, কেননা প্রথম-বার উৎসবের পরিমণ্ডল আর অভিনবত্বের ঔৎসুক্য বিচ্ছেদের বেদনাটাকে অনেক চাপা দিয়া রাখে,) তায় না বৌ, না মনোমোহিনী-দেবী—বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। জেঠ-শ্বশুরের আদরটা পাইলেন,—ঐ একমাত্র অবলম্বন রহিল। মনোমোহিনীদেবী থাকিলে সেই আদর ভাঙাইয়া যাত্রা, কথকতা নানান রকম উৎসব দেখিয়া বেড়াইবার যে সুবিধাটা ছিল সেটার অভাব বড় অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহা ভিন্ন ঠাকুরঝি ঠাকুরঝিই,—এক কাত্যায়নী দেবী ভিন্ন অত দরদঢালা আদর জীবনে কাহারও নিকট পান নাই। এবার আবার সেখানে অমন ধাক্কাটা খাইয়া মনোমোহিনী দেবীর জন্য মনটা যেন আরও উন্মুখ হইয়াছিল।

জেঠশ্বশুরের মধ্যে এবার একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রথম আসিয়া জেঠশ্বশুরকে দেখিয়া পণ্ডিত মশাইয়ের কথা বড় মনে পড়িত,—দুইজনেই পণ্ডিত মানুষ আর দুইজনের মধ্যেই একটা তেজ দেখা যাইত। একটু বেশি জানার পর জেঠশ্বশুরের যখন উগ্র শুচিবাইয়ের কথা ধরা পড়িল, তখন ঐ দিক দিয়া তিনি আবার যেন আলাদা হইয়া পড়িলেন; এক দিক দিয়া যেমন মিলটা রহিল, অন্য দিক দিয়া তেমনি গরমিলটা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য সেই দূর্বাবিল্বপত্র

বাছার ব্যাপারটার পর হইতে জেঠশ্বশুর আবার বদলাইয়া যাইতেছেন এটা গিরিবালা দেখিয়া গিয়াছিলেন।

এবার দেখিলেন যেন সে-মানুষই নয়।—পাণ্ডিত্য তো কমিবে না, পূজার্চনাও সেই রকমই হইতেছে, কিন্তু অতি-শুচিতার সেই উগ্র রুক্ষতা সরিয়া গিয়া এমন একটি স্নিগ্ধ ক্ষমার ভাব আসিয়া গেছে যে প্রতি পদেই যেন পণ্ডিত মশাইয়ের কথা মনে করাইয়া দেন। স্নেহের পরিমাণ সেই রকমই আছে; কেন না; গিরিবালার মনে হয়, তাহার চেয়ে বেশি হওয়াই সম্ভব নয়; কিন্তু সব কিছুর উপরই এই ক্ষমা স্নিগ্ধ ভাবটুকুর জন্য সেই স্নেহটুকুকে আরও নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। পূজার সময় খোকা গিয়া পিঠের উপর পড়িয়া দোল খাইবার চেষ্টা করে। গিরিবালা অনাচারের ভয়ে তাহারই তল্লাসে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান.—"ও জেঠামশাই, আমি ছুই কি ক'রে ও ভূতকে? কি হবে?..."

ভগবতীচরণ সস্মিত দৃষ্টিতে একবার নাতির দিকে চান, তাহার পর পূজার যে পর্যায়ে আছেন সেটুকু শেষ করিয়া হাসিয়া বলেন—"থাক্ মা, যখন ভর করেছে ভূতে, ঘাটিয়ে কাজ নেই; আরও উপদ্রব বাড়াবে।"

"ওর গায়ে যে রাজ্যের ধুলো, আপনি ঠেলে দিন বাঁহাত দিয়ে, আমি ধ'রে নিচ্ছি।"

"কাচ ছেলের গায়ের ধূলো, ধূলো নয়; ও থাক্, একটা ঝোঁক ধ'রেছে, কেটে গেলেই আপনি চলে যাবে; তুমি কি কাজ ক'রছিলে করগে।"

গিরিবালা আরও ব্যাকুল হইয়া পড়েন, বলেন—"ব্যাঘাত হবে যে পূজোর আপনার!"

ভগবতীচরণ একটু বেশি হাসিয়াই বলেন—"ব্যাঘাত হচ্ছেই, কিন্তু সে ওর জন্যে নয়; তুমি যাও দিকিন, লক্ষ্মী মা আমার।"

আচমন করিয়া আবার পূজায় লাগিয়া যান।

গিরিবালা জেঠশাশুড়ির কাছে গিয়া পড়েন, বলেন—"ও জেঠাইমা, এ কি হলো জেঠামশাইয়ের! সে-ই মানুষ?"

জেঠশাশুড়ি হাসিয়া বলেন—"পাড়ার সবাইকে গাল দেওয়ার প্রাশ্চিত্তির করাচ্ছে নাত্তি।....ওরা জন্মালে কি আর সে ভাব থাকতে দেয় মা? ভোলানাথের সঙ্গী সব, সব-কিছুই দেয় ভুলিয়ে।"

একা পড়িয়া গেলেও, উহারই মধ্যে কাছের প্রতিবেশী-কুটুম্বদের কয়েকজন মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে ভাব হইল। দুইদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। নিত্য উৎসব অনুষ্ঠানের জায়গা সাঁতরা—একদিন যাত্রা দেখা হইল। একদিন জেঠশাশুড়ির সঙ্গে ছেলেকে লইয়া পূজা দিতে শীতল'-তলায় গেলেন। শীতলা-তলায় কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। ক্রমাগতই একটা ভয় ভয় ভাব—একটা ত্রুটি, একটুখানি ভুল যদি কোন রকমে হইয়া যায়, খোকার উপর গিয়া পড়িবে যে। মনে হইতে লাগিল সে-বারের সেই ধনাঘরের বৌয়ের সন্তানের প্রতি অবহেলার ভাবটা এখনও যেন মন্দিরের হাওয়ায় মিশিয়া আছে। সেই সঙ্গে মনে পড়িল সেই অতি গরীব নীচ জাতের স্ত্রীলোকটিকে—দণ্ডী কাটার জন্য ভিজা শাড়িতে পথের রাঙা ধূলি কাদা হইয়া লিপ্ত, কপালে কাদার ছোপ; বাইরের বারান্দায় থামের পাশে রোগ-জীর্ণ ছেলেটিকে লইয়া দীন নয়নে দেবীমূর্তির পানে চাহিয়া আছে; হাতে একটা ছোট সরায় চিনি, সন্দেশ আর গোটাকতক ফুল—ভিড়ের মধ্যে কেহ যদি দয়া করিয়া পুরোহিতের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।... গিরিবালার মনে হইল তিনজন মায়েই তাঁহারা যেন একসঙ্গে মন্দিরের মধ্যে রহিয়াছেন—একজনের চক্ষে ধৃষ্টতা, একজনের চক্ষে মিনতি, তাঁহার নিজের দৃষ্টিতে শঙ্কা।....প্রণাম করিবার সময় খোকার মাথাও ধীরে ধীরে

শানের উপর চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—"মা দোষ নিও না, তোমার পায়ে রইল খোকা ; যদি কোন দোষ হ'য়ে থাকে তো আমায় দণ্ড দিও..."

কিসের এমন দোষ ভাবিয়া দেখিবার অবসর থাকে না। মন্দিরের অতীন্দ্রিয় পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা অহেতুক আশঙ্কা খোকাকে ঘিরিয়া যত রকমের কাল্পনিক অনিষ্টের সৃষ্টি করে, আর কেবলই মনে হয় খোকার সব বালাই নিজের সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লই।

* * *

ঠিক পাঁচ মাস পরে গিরিবালা পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়িটা এত দিন বেশ একটু নিঝুম মারিয়াছিল, বিশেষ ক'রয়া খোকার অভাবে ; শুধু তাহাকে লইয়াই বাড়িটা খানিকটা মাতিয়া উঠিল। এদিক থেকে একটু ফুরসং হইলে খঞ্জনী তাহাকে দাদামশাই-দের দেওয়া পোষাকে-গহনায় বোঝাই করিয়া পাড়ায় পাড়ায় লইয়া গিয়া বাহিরেও একটা রীতিমত সাড়া জাগাইয়া দিল।

পাণ্ডুলের জীবনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন নাই ; পাঁচ বছরেও বিশেষ কিছু পরিবতন হইবার জায়গা নয়, এ তো মাত্র পাঁচমাসের কথা। চোখে পড়িল অভয়া, ত্রিনয়নী, মোতিবালা আরও একটু করিয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। ত্রিনয়নীর, ভিতর-বাহির এক করিয়া ছুটিতে ছুটিতে রুচিকর খবরের টুকরা টাকরা চারাইয়া বেড়াইবার অভ্যাসটা কমিয়াই আসিতেছিল, এখন আর একেবারেই নাই। কোথাও বলা হইয়াছে এখানে মেয়েদের বাল্য অবস্থাটা টানিয়া-টুনিয়া বছর এগার পর্যন্ত থাকে, তাহার পর পর্দার চাপে তাহারা একেবারে ভারিক্কে হইয়া পড়ে। তবুও, তেমন তেমম অবস্থায়, ত্রিনয়নী সব ভুলিয়া এক একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে—ভিতর-বাহিরের পার্থক্য

রাখিতে পারে না,—যেমন বৌদিদি আসিবার দিন পারে নাই, খোকা হঠাৎ একটা নূতন কিছু বলিলে বা করিলে পারে না। নিস্তারিণী দেবীর কাছে বকুনি খায়—"ফের তিনি!—লজ্জা বলে কোন পদার্থ নেই তোর?"

মাঝে বিরাজমোহিনী আসিয়াছিলেন। গিরিবালা খবরটা চিঠিতে পাইয়াছিলেন, শুনিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই আকুলিবিকুলি করিয়াছিলেন; আরও বিশেষ করিয়া এই জন্য যে খোকাকে দেখেন নাই! তাঁহার নিজের একটি কন্যা সন্তান হইল, গিরিবালা আসিবার দিন পনের আগে বিরাজমোহিনীকে চলিয়া যাইতে হইল। শ্বাশুড়ি দেশে যাইতেছেন নূতন নাতনিকে একবার দেখিয়া যাইতে চান; ভাগলপুর থেকে হঠাৎ চিঠি আসিল, তাহার দুইদিন পরেই জামাই আসিয়া লইয়া গেলেন।

বিকালে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলিয়া গল্প হইতেছিল। খোকা একবার এ-কোল একবার ও-কোল করিয়া আদর কুড়াইয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে গল্পের মধ্যে তাহার অসংলগ্ন ভাষা দিয়া ছোট বড় বাধা সৃষ্টি করিতেছে। নিস্তারিণী দেবী বিরাজমোহিনীর যাওয়ার প্রসঙ্গটা ধরিয়া বলিলেন—"পনেরটা দিন মেয়েটাকে রাখলে না মা? বলিহারি শাসন!"

খোকা তাহার পিঠের উপর পড়িয়া একবাব এ-পায়ে একবার ও-পায়ে ভর করিয়া দোল খাইতেছিল, গলা জড়াইয়া মুখের সামনে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"ঠাম্মা!"

কথাটা নূতন শিখিয়াছে। নূতন মুখে নূতন ডাক, মিষ্টতাটকু মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে; চুলবাঁধা ছাড়িয়া নাতিকে কোলে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—না বৌমা, এবার তুমি যখন যাবে এটাকে যেতে দোব না, কি কষ্টেই যে কেটেছে এক'টা মাস!"

কোলে তাঁহার নিত্যসঙ্গী বিড়াল, আরামে চক্ষু মুদিয়া ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিতেছে, পায়ের দোল দিয়া মোতিবালা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"নিজের বৌয়ের ছেলে আটকে রেখে বিদেয় করলে তো শাসন করা হ'ল না!"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন! ত্রিনয়নী—"নিজের বেলা..." বলিয়া মন্তব্য করিতে যাইতেছিল, নিস্তারিণী দেবী হাসিতে হাসিতেই হাত উঁচাইয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন—"বেরো, নইলে দিলুম বসিয়ে; দুই বোনে মিলে ঝগড়া করতে এলেন দেখো না!"

বিরাজমোহিনীর পরে আরও অন্যসব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল,—পাণ্ডুলের অচপল জীবনে যাহা কিছুই একটু স্পন্দন আনিয়াছে তাহারই একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে—খজনী এই পাঁচ মাসের মধ্যে যে তিন-বার শ্বশুরবাড়ি হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, বিপিনবিহারীর হোমিওপ্যাথি ঔষধ না থাকিলে একটা বিশেষ দিনের ভোজ-খাওয়া যে লোটনঝার শেষ ভোজ-খাওয়ায় দাঁড়াইত, একদিন হস্তী ক্ষেপিয়া বদ্ধ অবস্থাতেই কাহাকে শুঁড়ে করিয়া একটা ডাল ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল, এই সব কথার আলোচনা লইয়াই চুলবাঁধার কাজ বিলম্বিত হইয়া যাইতে লাগিল।

উহারই মধ্যে মোতিবালা একবার সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর মা, বৌদিকে তো আসল কথাই বলা হ'ল না—দুলারমনের কথা!....আহা!...."

একটা হাসির প্রসঙ্গ কি করিয়া মনে পড়িয়া গেছে মোতিবালার; নিস্তারিনী দেবীর মুখখানি একমুহূর্তেই যেন মলিন হইয়া গেল, নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলিলেন—"বড় বলবার কথা কিনা....আহা যেমন হাসি-খুশি ছিল তেমনি...."

গিরিবালা দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত দুইজনের পানেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন —"কি মা? কি হ'য়েছে গা ঠাকুরঝি?"

দুই জনের একটু দৃষ্টিবিনিময় হইল, ত্রিনয়নীও মায়ের মুখের পানে চাহিল; প্রতি মুহূর্তেই একটা চরম সংবাদ শুনিবার ভয়ে গিরিবালার চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে সূচি-তীক্ষ্ণ। নিস্তারিনী বলিলেন—"না, বালাই, ষাট, তত খারাপ নয়...তবে কমই বা কি বল? —সিঁথের সিঁদুরটুকু না হয় বজায় আছে, বয়েসের সাধ-আহ্লাদ সবই তো ঘুচল।...জামাইটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না,—দুলারমনের গয়না-গাঁটি সব নিয়ে সে যে কোথায় উধাও হয়েছে কেউ বলতে পারছে না। ছেলেটি একটু অন্যধরণের ছিলই তো? একটু বাঙালীঘেষা, কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করবার ঝোঁক,—কথাটা এখন তাই থেকে গেছে আরও বেড়ে—শত্রুর তো অভাব নেই, কে রটিয়ে দিয়েছে গয়নাগাঁটি বেচে কিছু টাকা হাতে করে জাহাজের খালাসী হ'য়ে নাকি বিলেতে চলে গেছে, কি তালিম নিয়ে ফিরবে।....কে জানে মা; তবে যা রটে তার কিছুটা বটে—মা দুর্গা না করুন, কিন্তু যদি তাই হয় তো মেয়েটার কপাল তো চিরকালের তরে ভাঙল, আহা।"

নিস্তারিনী থামিতে মোতিবালা বলিলেন—"আর ওকেই যে দুষছে সবাই।"

নিস্তারিনী বলিলেন—"হ্যাঁ, সে আবার এক বিপদের ওপর বিপদ হয়েছে। ছেলেটা বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করা, কি অন্য কারুর গয়নায় হাত দেওয়া—সে-সব কিছুই করে নি, শুধু দুলারমনের গয়নাগুলো নিয়ে গেছে। সর্ব্বদা তো আর গায়ে দিয়ে থাকত না, একটা কাঠের প্যাটারিতে বন্ধ থাকত, একটা ছুতো করে চাবিটা নিয়ে গয়নাগুলো একটা পুঁটুলিতে বেঁধে রাতারাতি সরে পড়েছে। এখন দোষটা গিয়ে পড়েছে দুলারমনের ওপর—শুধু তোরই গয়না যখন নিয়ে গেছে তখন তোর এর মধ্যে যোগ-সাজোস আছে, তুই সব জানিস, বল্ কোথায় গেল..."

গল্পটা খুব জমিয়াছে, সবারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুখস্থ, একটা বড় কথা

ছাড়িয়া যায় দেখিয়া ত্রিনয়নী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একটু চাপা গলায় বলিল—"আগে তো ওরা চাপতে চেয়েছিল!—সে কথা বললে না বৌদিকে ?"

নিস্তারিনী দেবী বলিলেন—"তাই চাইবেই কিনা, বাড়ির একটা কলঙ্ক,—যদি বিলেতই গিয়ে থাকে তো জাতকুল নিয়েই টানাটানি, এখানে যে আমাদের দেশের চেয়েও কড়াক্কড়ি। মামার বাড়ি গেছে, মেসোর বাড়ী গেছে, পশুপতিনাথ গেছে,—এই করে কটা মাস চেপে রাখলে কথাটা, দুলারমনের বাপের বাড়িতেও কাউকে জান্‌তে দিলে না, অথচ তুমি দেশে যাওয়ার প্রায় পাঁচ ছ' মাস আগে হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু কথা কখনও চাপা থাকে ? আস্তে আস্তে বেরিয়েই পড়ল। তখন নিরুপায় হ'য়ে বললে কলকাতাতেই প'ড়তে গেছে। শত্রুরা পেয়ে বসল—কতরকম ফিকড়ি বেরুতে লাগল, বললাম না?—এখন নাকি আবার কে কলকাতা থেকে ফিরে এসে রটিয়ে দিয়েছে ছেলে জাহাজের খালাসি হয়ে বিলেত চ'লে গেছে—নাকি গির্জ্জায় গিয়ে খেরেস্তানও হ'য়ে গেছে।.... সত্যি মিথ্যে ভগবানই জানেন. মেয়েটার দিকে কিন্তু আর চাওয়া যায় না, আহা।.. শুনছি এই একটা বছর ধরে নাকি নিগ্রহের আর কিছু বাকি রাখে নি, এই তো সেদিন খবর পেয়ে বাপ গেছল, পাঠিয়ে দিয়েছে, আর নাকি নেবে না।"

গিরিবালার মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দুলারমন আসে না, গিরিবালা নিস্তারিনী দেবীকে অনুরোধ করিতে তিনি বলিলেন—উঁহারা স্পষ্ট করিয়া অবশ্য বলে না, তবে ভিতরে ভিতরে চায় না যে দুলারমন বাঙালীর সঙ্গে মেলামেশা করে। গিরিবালা খজনীকে দিয়া ওকে, ওর মাকে খুব কাকুতি মিনতি করিয়া বলিয়া পাঠাইতে আসিবার দিন ছয়েক পরে একদিন দুপুরে ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া দুলারমন আসিল।

সত্যই আর চাওয়া যায় না তাহার পানে,—অমন যে সাজিয়া গুজিয়া থাকিতে ভালোবাসিত, কপালে সিঁদুর আর হাতে চার গাছি করিয়া এদেশের প্রচলিত গালার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই; চুল কোনো-রকমে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া কতদিন আগে যে মাথায় একবার টাঙাইয়া রাখিয়াছে আর যেন ফিরিয়া দেখে নাই, সে রঙের কিছুই নাই, অমন ভরাট মুখ শীর্ণ হইয়া লম্বাটে হইয়া গেছে, চোখের চারিদিকে কালি, দৃষ্টিতে রাজ্যের শ্রান্তি। দুলারমন যেন বয়েস ডিঙাইয়া বুড়ি হইয়া গেছে একেবারে।

গিরিবালা খানিকটা প্রস্তুতই ছিলেন, তাই দুলারমন এসবে ততটা বিস্মিত করিতে পারিল না, যতটা করিল তাহার প্রথম সম্ভাষণে, উঠানে আসিয়াই মুখে একটা হাসি টানিয়া প্রশ্ন করিল—"মনে পড়লেই গো নয়কী ভুলহীন?"

—যেন একটা হাসির আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্যই তাহার নিজস্ব বাংলাতেই আরম্ভ করিল। গিরিবালার প্রথমটা মুখে কোন কথাই জোগাইল না, তাহার পর বলিলেন—"আমার মনে অনেক দিনই পড়েছে, তোমাকেই ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না।"

"বাঃ, আমি কি যে-সে আছি? কোতো তপস্যা করতে হোয় আমার জন্যে।"

—বলিয়া এবার একটু বেশি করিয়া হাসিয়া উঠিল, বুকের দুর্বলতা থাকিলে হাসির শেষের দিকে যেমন একটা টান্ ওঠে, সেইরকম একটা টানের সঙ্গে হাসিটা থামিয়া যাইতেই ঘাড়টা একটু এলাইয়া পড়িল।

দুলারমন এইটুকু দমের ব্যয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ সে ছিল হাসির অফুরন্ত উৎস। কয়েক সেকেণ্ড বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গিরিবালা আবার নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, একটু হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"তাই দেখছি, তপস্যাই বটে, বোস'।"

একটা মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দুইজনে বসিলেন। কি করিয়া যে কথাটা পাড়িবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। দুলারমন কিন্তু কোনরূপ সুযোগই দিল না, বসিয়া নিজের ভাইটিকে তুলিয়া কোলের কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিল—"খোকা কোথায়?"

গিরিবালা অন্যমনস্ক ভাবটা কাটাইয়া বলিলেন—"এঁ্যা, খোকা?.... ঘুমুচ্ছে!....তারপর?...."

দুলারমন দুষ্টামি করিয়াই প্রশ্নটার অভীপ্সিত অর্থটা গ্রহণ করিল না; চিন্তা করিবার ভঙ্গীতে একটু হাসিয়া বলিল—"তারপোর? তারপোর? ...মোতি কোথায়?"

"ঠাকুরঝিও ঘুমুচ্ছেন।"

"তারপোর—ত্রিনয়নী কোথায়, তারপোর অভয়া কোথায়?"

ডুবন্ত লোকের কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রক্রিয়া জাগাইতে জাগাইতে সেটা শেষ পর্যন্ত যেমন সত্যই আসিয়া পড়ে, দুলারমনের যেন সেই রকম ব্যাপার হইয়াছে, গিরিবালার প্রশ্নটা ঘুরাইয়া রঙ্গ করিতে করিতে শেষের দিকে সত্যই হাসিয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া তাঁহার বিপর্যস্ত ভাবটা লক্ষ্য করিয়া। বুকে টানটা আরও বেশিক্ষণ পর্যন্ত আটকাইয়া রহিল, আয়াসে পাণ্ডুর মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিল।

গিরিবালাও হাসিয়া বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন—"মরণ! রঙ্গ আর যায় না, আমি জিগ্যেস করছি—তারপর আছ কেমন, না, কথাটা বেঁকিয়ে..."

বোধ হয় ওর হাসির চোটেই ঘুম ভাঙিয়া গিয়া থাকিবে,—'দুলারমনের হাসি না?"—বলিতে বলিতে মোতিবালা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুলারমন দু'চারবার হাঁপাইয়া লইয়া—হাসির জেরটা বন্ধ করিয়া

লইল, উলটিয়া নিজেই রাগের ভান করিয়া বলিল,—"তোঁহি কহু ত হে মোতি, নৈহর সে ঢাকিয়া ঢাকিয়া গপ্ আনলথিন্ ভৌজী, সে এক্কোটা হামরা কিয়্যাক্ ন কহতিন?" (তুমিই বলতো মোতি—বৌদি বাপের বাড়ি থেকে ঝুড়িঝুড়ি গল্প এনেছেন তা আমাদের একটাও শোনাবেন না কেন?)

মোতিবালা এর মধ্যে দু'একবার দেখিয়াছেন, সুতরাং দুলারমনের চেহারা দেখিয়া আর বিস্মিত হইলেন না; তবে হাসি দেখিয়া হইলেন একটু বৈকি, বলিলেন—"তুই আর আসিস না কেন রে দুলারমন? সেই একদিন এসে·· আমি যদি ছাড়া পেতাম সর্বদাই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম।"

"ইঃ, 'ঘুরে বেড়াতাম!'"

মোতির কথাটা লইয়া ভেংচাইয়া দুলারমন গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"বোলো গো বৌদি, দেশকে গোপ্পো বোলো।"

বিষয়টাও নিজেই জোগাইয়া দিল, ভাইটিকে টানিয়া লইয়া গুটাইয়া সুটাইয়া গল্প শুনিবার ভঙ্গীতে বসিয়া বলিল—"নন্তীকে গপ কহু, কৈঃ বিয়া ভেলেই, বেটাবেটি কি ছেই···"

বিড়ালটা আসিয়া মোতিবালার পায়ে খুব আড়ম্বরের সহিত গা ঘষিতেছে, দুলারমন একটু হাসিয়া বলিল—"তুমিও অপ্পন্ বেটিকে কোলে নিয়ে বোসো গো মোতি।"

সখী হিসাবে সখীদের কাছে নন্তীর গল্পই বেশি করিতেন গিরিবালা গল্পটা অল্পের মধ্যেই বেশ জমিয়া উঠিল, তাহার পর ওরই প্রসঙ্গ ধরিয়া অন্য সব কথা আসিয়া পড়িতে লাগিল। যতক্ষণ কৌতুক হাসির চটপট জবাবের মধ্যে কাটিতেছিল, ততক্ষণ বেশ কাটিতেছিল; একতরফা, একটানা গল্পের মধ্যে দুলারমন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে

লাগিল,—"কি ভেলেই? --কে কি বোল্লে?" বলিয়া মাঝে মাঝে গল্পের হারান খেই-টা ধরিয়া লইতে লাগিল। এক এক সময় আবার খুব মনোযোগী, যেন চেষ্টা করিয়া সমস্ত মনটাকে একত্র করিয়া গল্পশোনায় লাগাইয়া রাখিয়াছে,—এক একটা মন্তব্য করিতেছে, এক এক ঝলক হাসি তুলিতেছে, আবার অন্যমনস্ক,—সামনে, পাশে যেন একটা কিছুর উপর গিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, পাণ্ডুর মুখটা আরও হইয়া উঠিতেছে যেন পাণ্ডুর।

একবার মোতিবালা বলিয়া উঠিলেন—"তুই শুনছিস কৈ দুলারমন? মিছিমিছি বকাচ্ছিস বৌদি'কে।"

দুলারমন ঝাঁজিয়া উঠিল—"না, শুনিতে হইলে যে গল্প বলিতেছে তাহার মুখে কান লাগাইয়া বসিতে হইবে! তাহা হইলে মোতিবালাও তা শুনিতেছেন না!"

গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি বোলো গো বৌদি।"

গিরিবালা বলিলেন—"না, তুমি এবার তোমার শ্বশুরবাড়ির গল্প বল দুলারমন, একলা কত বকব? আবার অন্য দিন শুনো।"

খুব সেয়ানা মেয়ে, একলা হইলেও খুব সতর্ক থাকিয়া দুলারমন নিজের গল্প বলার সম্ভাবনাটাকে এড়াইয়া আসিতেছে,—মোতির মুখে থাবা দিয়া, গিরিবালার গল্পের মোড় ফিরাইয়া। এবার যেন কোণঠাসা হইয়া তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল—বাঃ, হামি বাপেরবাড়িকে গোপ্পো শুনলাম, শ্বশুরবাড়িকে গোপ্পো কেনো বলব?"

দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন; এবং এই হালকা হাসির জন্যই দুলারমনের অন্তরের বেদনার দিকে কাহারও দৃষ্টিটা যেন যাইতে পারিল না; লঘু তর্কের ঝোঁকেই দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন, মোতিবালা বলিলেন—

"শ্বশুরবাড়ির গল্প ভালো ব'লে বলবি ;—কার মাথাব্যথা প'ড়ে গেছে যে তোর ঠাকুরমা বুড়ির ঘ্যান্‌ঘ্যানানির কথা বসে বসে শুনবে ? বৌদি যদি তোকে এখানকার কথা—ধর খজনীর কথা শোনাতেন ব'সে ব'সে...."

মজ্জমান যেমন খড়ের কুটোটা আঁকড়াইয়া ধরিতে যায় খজনীর নাম হইতেই একটা কিছু যেন পাইয়াছে এইভাবে সচকিত হইয়া উঠিল দুলারমন, মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"হামি শ্বশুরবাড়িকে কথা একটুও জানি না।"

মোতিবালা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন বল্‌তো ?"

দুলারমন হাসিবার যেন একটা অন্তিম চেষ্টা করিল, লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমান সমস্ত আসিয়া মুখে জড়ো হইয়াছে, তাহারই মাঝে, ঠোঁটের নিতান্ত এককোণে একটু কুঞ্চনের আভাস—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফুটাইয়া রাখিয়াছে ; মোতিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"বারে, হামিও তো খজনী আছি, পালিয়ে এলুম কেমোন চালাকি..."

আর অগ্রসর হইতে পারিল না, এবাড়ির দরজা মাড়ান ইস্তক যে-অশ্রুকে অত সতর্ক হইয়া হাসির মধ্যে, গল্পের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যখন সে নামিল একেবারে যেন বাঁধ ভাঙিয়াই নামিল। সমস্ত মুখটা অঞ্চলে ঢাকিয়া দুলারমন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, দুই সখীর চোখেও জল নামিয়াছে, মুখে সান্ত্বনার কোন কথাই নাই, শুধু মাঝে মাঝে— চুপ রহু দুলারমন"..."দুলারমন চুপ কর্‌।"

নিস্তারিণী উঠিয়া দেখিলেন শোক আর সহানুভূতির ছবির মতো তিন জনে দাওয়ায় বসিয়া আছেন, কাহারও মুখে কথা নাই। বুঝিয়া আর বিশেষ কিছু প্রশ্ন করিলেন না, শুধু একটা কিছু বলিবার জন্যই বলিলেন—"দুলারমন যে, কখন এলি ?" থাকাও দুষ্কর বলিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

পুরুষদের আফিস হইতে ফিরিবার সময় হইয়া আসিতে দুলারমন উঠিল। গিরিবালা বলিলেন—"মাঝে মাঝে এস দুলারমন।"

মোতিবালা বলিলেন—"হ্যাঁ, বাড়িতে বসে শুধু গুমরে মরবি, তার চেয়ে আসিস মাঝে মাঝে।"

৯

পাণ্ডুলের জীবনের অধিকাংশটাই নীলকুঠিকে কেন্দ্র করিয়া, অন্ততঃ এই পরিবারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা তো খুবই ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য ওর মোটা-মুটি একটা ইতিহাস এইখানে দিয়া গেলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নীলকুঠি ইংবাজ রাজ্যের মধ্যে ছিল খণ্ডরাজ্য, প্রভেদ এই যে সমগ্রটার মধ্যে একটা বাঁধুনি আছে, খণ্ড গুলার মধ্যে তাহার ছিল সম্পূর্ণ অভাব। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করে, সে উৎখাত হইল, কিন্তু নির্বংশ হইল না, তাহার আদি লীলাভূমি বাংলা-বিহারে নিজের বংশধরদের বসাইয়া গেল। মহারাণী এবং তাঁহার বংশধরদেব শাসন নীলকুঠি পর্যন্ত পৌঁছায় নাই কেন বলা শক্ত, তবে পৌঁছায় নাই যে এটা অবিসংবাদিত সত্য। পৃথিবী হইতে দাস-প্রথা উচ্ছেদে ইংরাজের কতকটা হাত ছিল; কিন্তু সে-গৌরবের পাশে তাহার ললাটে খানিকটা কলঙ্ক-কালিমাও থাকিয়া গেছে—সে নীলকুঠি ঘুচায় নাই, অন্ততঃ সে অগ্রণী ছিল না। নীলকুঠি বাংলা হইতে ঘুচাইবার যশ কয়েকজন সাংবাদিক আর একজন নাট্যকারের, বিহারের যশটা বহুলাংশে একজন "নগ্ন ফকিরের" প্রাপ্য। দৈবক্রমে বিজ্ঞান

এঁদের সহায় হইয়াছিল, নতুবা ফলাফলটা যে কী হইত সেটা এখনও গবেষণার বিষয় হইয়া আছে।

এ-যুগে নীলকুঠির অত্যাচারের পুরাণ কাসুন্দি ঘাটিয়া লাভ নাই, এক কথায় এইটুকু বলিলেই চলিবে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বংশধরেরা যে কীর্তি করিয়া গিয়াছে তাহাতে পিতৃপুরুষের স্বর্গবাসে এক মুহূর্তের তরেও কোন অতৃপ্তির কারণ ঘটিতে দেয় নাই।

এর মধ্যেই কিন্তু পাণ্ডুলের ইতিহাসটি একটু অন্যরূপ ছিল। মধুসূদন পাণ্ডুল উদ্দেশ করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হন নাই। তাঁহার কাম্য ছিল মীরাটে কমিসেরিয়েটের চাকরি। একরকম আকস্মিকভাবেই তিনি গঙ্গা পার হইয়া পাণ্ডুলে আসিয়া পড়েন। অবস্থাবৈগুণ্যে চাকরির প্রতি লোভ ছিলই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল যে তিনি বোধ হয় অত্যাচারীর সহায়ক হইয়া জীবনকে কলুষিত করিতে চলিয়াছেন। বাংলায় তখন কুঠিয়ালদের লইয়া খুব ঘাটাঘাটি চলিয়াছে।

চাকরি লইলেন। প্রথম বছরখানেক যে স্তরে রহিলেন সেখান হইতে অত্যাচারের রূপটা ঠিকমতো চোখে পড়িবার কথা নয়। জমিদারের, রেয়তের, শ্রমিকের সাধারণ স্বত্বটা কি এবং কতটা হইলে সে স্বত্ব অতিক্রান্ত হইয়াছে বলা যায়, তাহার সঠিক ধারণা হইতে একটু সদ্য স্কুলছাড়া সতের বৎসরের ছেলের সময় লাগে; অনেক সময় অত্যাচারটাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া ভ্রম হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। প্রথমটা এই ভাবেই কাটিল, তাহার পর চাকরির একটু উন্নতির সঙ্গে রহস্যটার ভিতরে প্রবেশাধিকার ঘটিল, এদিকে গল্প পরম্পরায় অন্যান্য অনেক কুঠির অত্যাচারের কথা কানে আসিতে লাগিল। মধুসূদন আশ্বস্ত হইলেন। পাণ্ডুল অনেক কুঠির তুলনায় ভালো এই জ্ঞানটা যতদিনে নিঃসন্দেহভাবে আসিল ততদিনে চাকরিও বেশ কিছুদিন হইয়া

গেছে ; মায়া বসিয়াছে, রস পাইয়াছেন, উন্নতিও হইয়াছে। অর্থাৎ যদি দেখিতেনও যে তিনি একটা প্রবল অত্যাচারেরই অঙ্গস্বরূপ, আর পরিত্রাণ ছিল না ; ক্রমে অত্যাচারের উগ্র উন্মাদনার মধ্যে মধুসূদনও অনিবার্যভাবেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন।

কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। মীরাট না যাওয়ার মধ্যে যে একটা আকস্মিকতা ছিল, অন্য কুঠি ছাড়িয়া পাণ্ডুলে আসিয়া পড়ার মধ্যে সেই আকস্মিকতা কার্যকরী হইল। আকস্মিকতা দৈবেরই নামান্তর ;—যে অজ্ঞেয় শক্তি পাণ্ডুলের মধ্য দিয়া মধুসূদনের জীবনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহাকে তিনি চিরদিনই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া আসিয়াছেন।

অবশ্য নীলকুঠি নীলকুঠিই, তবু উহারই মধ্যে পাণ্ডুলের একট সুনাম ছিল।

এই সুনামের একেবারেই গোড়ার কথা এই যে ইহার তৎকালীন স্বত্তাধিকারী নিজে লোক ছিল ভালো এবং সেই সঙ্গে আরও একটা কথা এই ছিল যে সে নিজেই কুঠিতে থাকিত। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ হইত যে, যে স্বত্তাধিকারী সে থাকিত বিলাতে ; কর্মচারীরা তাহার কুঠি চালাইত। এরূপ ক্ষেত্রে অত্যাচারটা প্রায়ই বড় বেশি হইত। অনেকগুলা কারণ ছিল, তাহার একটা এই যে, অর্থবান স্বত্তাধিকারীরা যে-শ্রেণীর লোক হইত, বেতনভোগী কর্মচারীরা সে-শ্রেণীর কাছ দিয়াও প্রায় ঘেঁষিত না। প্রায় দেখা যাইত তাহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি বলিয়া কোন বালাই থাকিত না। নিজের নামের বানান ভালো করিয়া জানিত না এমন লোকেও আসিয়া পদস্থ কর্মচারী হইয়া বসিয়াছে নীলকুঠিতে এমন দুর্ঘটনা খুব দুর্লভ ছিল না। এরা ছিল চলিত ভাষায় যাহাদের বলা হয়—'বাপে খেদান মায়ে তাড়ান ছেলে।' ভারতে

আসিয়া কেষ্ট-বিষ্টু হইয়া ইহাদের মাথা বিগড়াইয়া যাইত, এমন কাজ ছিল না যাহা ইহাদের অকরণীয় ছিল। এক কথায় ইহারা ছিল এই সব খণ্ডরাজ্যের ক্লাইভ।

স্বত্বাধিকারী নিজে উপস্থিত থাকিলে ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই একটু অন্যরকম হইত; কেন না কুঠিয়াল হইলেও তাহাদের একটা আভিজাত্য ছিল, খানিকটা কৃষ্টি ছিল এবং অনেক সময় একটা দরদও থাকিত বলিলে অমার্জনীয় মিথ্যা বলা হয় না। এর উপর পাণ্ডুলের সেই প্রায় আইন-বর্জিত যুগে একটা গোটা জেলাব্যাপী চোদ্দখানা কুঠির মালিক যে অর্থে ভালো হওয়া সম্ভব, অবশ্য সেই অর্থেই ভালো; তবু অনেকটা প্রভেদ হইত। পাণ্ডুলের দুর্নামটা তত বেশি ছিল না।

এ সাহেব যখন বিলাত চলিয়া গেল, ছেলেকে নিজের তখ্‌তে বসাইয়া গেল। তখন গুণগ্রাহী মনিবের নেক নজরে পড়িয়া মধুসূদন কুঠির বড়বাবু। উপযুক্ত লোক দেখিয়া ঢিলা দিতে দিতে প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেজন্য একদিনের তরে সাহেবকে অনুতাপও করিতে হয় নাই। যাইবার সময় অন্যান্য উপদেশের মধ্যে একটা বিশেষ উপদেশ পুত্রকে এই দিয়া গেল যে—কুঠি পরিচালনায় সে যেন সব দরকারী বিষয়েই মধুসূদনের পরামর্শ গ্রহণ করে। চঞ্চলমতি যুবকের এমন একজন বিচক্ষণ কর্মচারী পাশে থাকায় সুবিধা ছিল! প্রথম কয়েক বৎসর সে বাপের উপদেশটা একটু বেশি করিয়াই পালন করিয়া মধুসূদনের হাতে প্রায় সমস্তটাই ছাড়িয়া দিল,—জেলাসহরে তাহার ক্লাব আছে, এখানে-ওখানে পার্টি আছে, কুঠিতে যখন থাকিত তখন কুঠির কাজ দেখার চেয়ে জজিয়তী করার প্রতি তাহার বেশি আকর্ষণ ছিল। সে-যুগে ছোট-মাঝারি দেওয়ানী আর ফৌজদারী কেস্‌গুলা এই কুঠিয়ালরাই নিষ্পত্তি করিত;—

সাজার মধ্যে মাস দুই তিন জেল পর্যন্ত ইহারাই দিত—কুঠিতেই তাহার ব্যবস্থা ছিল। জরিমানা করিত, কুঠিতে তাহার আলাদা হিসাব থাকিত জজের মন ভালো থাকিলে বাদী কিছু অংশ পাইত। এই সব স্বয়ম্ভু জজের উপর মহারাণীর জজেদের কোন কথা চলিত না;—কেহ কুঠির বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া উহাদের দ্বারস্থ হইতে সাহসই করিত না। সাহস করিলেও কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। জেলায় তখন দেওয়ানী আদালতেরও পত্তন হয় নাই; ব্যবস্থাটা ছিল পঞ্চাশ মাইল দূরে ডিভিসন সহরে। জজেদের হাত অত লম্বা ছিল না যে এতদূরের গণ্ডী পারাইয়া নিজের শক্তির পরিচয় দেয়। দিতে গেলে রায়তের পক্ষে ফলটা উলটা হইত।

একটু অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে। মোটের উপরে সাহেব এই সব বিচার-সালিসি লইয়া থাকিতেই ভালবাসিত। অনধিকারের প্রতিপত্তিই তো আসল প্রতিপত্তি। যৌবনের তাগিত মিটাইতে আর এই অনধিকারের প্রতিপত্তি জমাইতেই সাহেবের সময় ব্যয়িত হইয়া যাইত; কুঠির দিকে শুধু ব্যালেন্স্‌শীটের উপর নজর বুলাইয়া গেলেই চলিত, সে দিকে না ছিল নৈরাশ্যের কারণ, না ছিল সন্দেহের।

তাহার পর আসিল কুঠির নীলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সিনথেটিক অর্থাৎ কৃত্রিম নীল। যে নীল মনকরা তিনশত টাকা দরে বিক্রয় হইতেছিল তাহার দর হু-হু করিয়া নামিতে লাগিল। কুঠিয়াল মহলে একটা সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল। পার্টি এবং জাজিয়তির ব্যসন ছাড়িয়া সাহেবকে একটু অন্তর্মুখী হইতে হইল, মধুসূদনই অনেকটা বুঝাইয়া সুঝাইয়া মোড়টা ফিরাইলেন। এর পর হইতে খুব গুরুতর বিষয় লইয়া উষ্ণরক্ত মনিবের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির কখনও কখনও মতান্তর হইত। যখন সাহেব কোনমতেই একমত হইতে পারিত না তখন ব্যাপারটায়

পরিণামে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে মধুসূদন বিলাতে তাহার পিতার অভিমত লইবার পরামর্শ দিতেন। সাহেব বাপের সমসাময়িক বিশ্বাসী প্রবীণ কর্মচারীর এই শেষ পরামর্শটা ঠেলিত না। ফলে মধুসূদনের প্রতিপত্তির সঙ্গে চারিদিক দিয়া কুঠির জীবনের সামঞ্জস্যটা রক্ষা হইয়া যাইতেছিল। পাণ্ডুলের সুনামের এই ইতিহাস।

অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি 'সুনাম' কথাটা নীলকুঠির মাপ কাঠিতেই ধরিতে হইবে। চারিদিকে অমানুষিক অত্যাচার, তাহার মধ্যে পাণ্ডুল আর হয় তো এক আধটা কুঠি শাসনের সুরটা একটু নরম পর্দায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পাণ্ডুলের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক দু'একটা কারণের সঙ্গে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের কুলগত সংস্কারের যোগ ছিল। অত্যাচারের দ্বারা নিজের বিত্ত আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিয়া তিনি নিজের সমস্ত শক্তি অত্যাচারীকে সংযত করিতেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন।....অত্যাচার বিষয়ে কুঠিয়ালদের মস্তিষ্ক অদ্ভুত রকম উর্বর ছিল। মাঠে কাজ করিতে কেহ অস্বীকার করিলে, অথবা নীলের জন্য জমি দিতে না চাহিলে তাহারা অনেক সময় যে শাসন উদ্ভবন করিত—তাহাতে কাজের সঙ্গে তাহাদের উগ্র রহস্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। একটা দণ্ড নাকি এই ছিল যে লোকটাকে ঠাণ্ডা গারদে রাখিয়া মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইত এবং সেই ক্ষেত্রতুল্য মুণ্ডিত মস্তকে এঁটেল মাটি চাপড়াইয়া দিয়া তাহাতে নীলের বীজ পুতিয়া দেওয়া হইত। গারদেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে যখন মাথার উপর নীলের অঙ্কুর হইত তখন নীলচাষের সবল প্রতিবন্ধকটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রামে গ্রামে টহল করাইয়া ফিরান হইত। এই ধরণের আরও মৌলিক সাজা অনেক ছিল।

পাণ্ডুলে এ ধরণের সাজা প্রবর্তিত হইতে পায় নাই কখনও।

তবে সাহেবের বিচারের দিকটা মধুসূদনের এলাকার বাহিরে ছিল। সেখানে যে ব্যাপার হইত তাহার 'সু' বা 'কু' অনেকাংশে নির্ভর করিত সাহেবের তৎকালীন মেজাজের উপর। কিন্তু সেখানে একটা কথা ছিল,—তোমার আমার ঝগড়া, ইংরাজের কোন স্বার্থ নাই, সেখানে তাহার বিচারে সুনাম আছে। হয় তো বা একদিন একটু কড়া হইল, একদিন অপেক্ষাকৃত নরম—তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। জরিমানার টাকাগুলার মোটা অংশ যে কুঠির সিন্দুকে আশ্রয় লাভ করিত সেটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমি রাম রাজত্বের ইতিহাস রচনা করিতেছি না।

মধুসূদন সতের আঠার বৎসর বয়সে পাণ্ডুলে আসেন। ন্যূনাধিক ছিয়াল্লিশ সাতচল্লিশ বৎসর এক কলমে কাজ করিয়া চাকরি অবস্থাতেই মারা যান। সৌভাগ্যক্রমে পূব হইতেই পাণ্ডুলের একটা ভালো ট্র্যাডিশন ছিল; তাঁহার কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি একদিনের তরেও সেটা ম্লান হইতে তো দেনই নাই পরন্তু নিজের সমস্ত মানসিক ও চরিত্রগত শক্তি নিয়োজিত করিয়া সেটাকে দিন দিন উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আপাতত নীলকুঠির বিশেষ করিয়া পাণ্ডুলের নীলকুঠির এইটুকু ইতিহাস এই কাহিনীর পক্ষে প্রয়োজন ছিল; আরও একটু বলা প্রয়োজন হইবে; সে যথাস্থানে।

১০

আরও তিনটা বৎসর গড়াইয়া গেল। ইহার মধ্যে গিরিবালা দুইবার দেশ ঘুরিয়া আসিলেন। প্রথমবার কিশোরের পৈতা উপ-

লক্ষ্য করিয়া। থাকিতে পারিলেন খুব অল্পদিনই, তাহার পর ফিরিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোতিবালার বিবাহ স্থির হইল, সকলে মিলিয়া আবার সাঁতরায় গেলেন।

এবারেও থাকা খুব অল্পই হইল। বিবাহটা হইল নীল-মাড়াই-য়ের সময়, মধুসূদন, বিপিনবিহারী কেহই থাকিতে পারিলেন না। উৎসবের উন্মাদনার মধ্যে কটা দিন যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, যেন বুঝিতেও পারিলেন না। সাঁতরাকে এবারে যেন পাওয়াই গেল না একেবারে। ক'নেবৌয়ের যুগে উহারই মধ্যে অবসর মিলিত। এখন তাঁহাকে বাড়ির বড়বধূ হিসাবে নানা কাজেই লিপ্ত থাকিতে হইল। তাহার উপর তিনি এখন দুইটি সন্তানের জননী, ছোটটি নিতান্তই কোলের; এক রকম বলিতে গেলে প্রায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার সময় রহিল না।

উহারই মধ্যে কষ্টে-সৃষ্টে শ্বশুর শাশুড়িদের নিকট দুইটা দিন ভিক্ষা করিয়া লইয়া একবার বাপের বাড়ির ভাত খাইয়া আসিলেন।

দিন সাতেক থাকিয়া সকলে ফিরিলেন, আবার পাণ্ডুল-জীবনের মন্থর প্রবাহ আরম্ভ হইল।

কিছুদিন গেল, তাহার পর এই প্রায় একটানা সুখের সংসার-টিতে একটা গাঢ় সঙ্কটের ছায়া পড়িল।—

মধুসূদনের বাগানের সখ ছিল। কার্তিক মাস, শাকসবজি মরশুমী ফুল প্রভৃতির বীজ ফেলিবার সময়। সাহেবের বাগানের জন্য প্রতিবৎসর বিলাত হইতে নানাবিধ বীজ আসে, সাহেব মধুসূদনকেও কিছু কিছু দেয়। এবার অন্যান্য বীজের সঙ্গে এক বোতল মটরের বীজ দিয়াছে।

বাড়ির পাশেই বাগান। আফিস হইতে আসিয়া জলযোগ প্রভৃতি

সারিয়া মধুসূদন দৈনন্দিন প্রথামত একটা চেয়ার লইয়া বাগানের সামনে বসিলেন। মালী কাজ করিতেছে, বিপিনবিহারী একটা কাঁচি হাতে কাটাছাঁটা করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার শখটা বাপের চেয়েও বেশি।

মোহনা তামাক সাজিয়া আনিয়া হুকাটা দিল। মধুসূদন বলিলেন —"মটরের যে বোতলটা এনেছি, নিয়ে আয়।"

বোতলটা বিলাতি কায়দায় শিল-মোহর করা, মুখের কাছে সামান্য একটু চিড়্ খাইয়া গেছে। বাবুর খাস চাকর মোহনা, কাজ করিতে হয় কম, সেইজন্য ছোট বড় যেটুকু কাজই পায় সাধ্যমত একটু পৌরুষের সঙ্গে করে। উপরকার রাংতাটা খুলিতে বাঁহাতের একটা আঙুল একটু কাটিয়া ফেলিল, হাতটা পিছনে লুকাইয়া বোতলের মুখের সঙ্গে মেলান বড় ছিপিটা কি করিয়া খুলিবে চিন্তা করিতে লাগিল। মধুসূদন বিপিনবিহারীর সহিত কথা কহিতেছিলেন, ফিরিয়া তাহার বিমূঢ় ভাব দেখিয়া একটু ধমক দিয়া বলিলেন—"কর্ক স্ক্রুটা নিয়ে আয় না....মস্ত একটা দুর্ভাবনায় পড়ে গেল একেবারে।"

আঙুলে একটু চিনি দিয়া ভিজা পটি বাঁধিয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল, মধুসূদন একবার ডাক দিলেন, তাহার পর তাঁহার একটি হাতিয়ারের উপর নজর পড়িল। হুকার নলটা পরিষ্কার করিয়া মোহনা লোহার শিকটা পাশেই ফেলিয়া রাখিয়াছিল, মধুসূদন সেইটা উঠাইয়া লইলেন।

নল-পরিষ্কার-করা শিকের মুখটা সূচাল এবং ইস্ক্রুপের মতো পাক দেওয়া থাকে। কর্ক স্ক্রুর জন্য বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া মধুসূদন এই নূতন অস্ত্র দিয়াই ছিপিটা খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূচাল হইলেও মুখটা কর্ক স্ক্রুর মতো অত সূচাল নয়, জোর দিতে হইল। মনটা আছে মটরে, দৃষ্টিটা আছে ছিপিটার উপর, বোতলের মুখটা যে একটু

ফাটা আছে সেদিকে আর খেয়াল হইল না। দু'একবার একটু ঝোঁক দিয়া জোর দিতেই মুখটা ফাটার কাছে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়া মোটা কাচের একটা ফলক ডান হাতের কব্জিতে বিঁধিয়া গেল।

বিপিনবিহারী একটা গাছের আড়ালে ছিলেন, 'উঃ' করিয়া শব্দ হইতেই ফিরিয়া দেখেন মধুসূদনের কব্জির নিকট হইতে দুইটি ধারায় রক্ত একেবারে ফিনিক দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া দেখেন হাতটা এলাইয়া গেছে এবং কব্জির শিরার একটা একেবারেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। হৈ হৈ পড়িয়া গেল, কৈলাশচন্দ্র সদর বাড়িতে ছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন, চারিদিককার লোক জড়ো হইয়া গেল, ছিন্নমস্তার মতো রক্তের ধারা দেখিয়া সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, বাড়ির মেয়েরা সদরে আসিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। তাঁহারা রক্তস্রাব যাহাতে দেখিতে না পান, কৈলাসচন্দ্র এইভাবে কৌশলে ভিড়টা সরাইয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। বিপিনবিহারী নিজের কাপড় ছিড়িয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থান বাঁধিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কাপড় ভিজিয়া জবজবে হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন ক্রমেই এলাইয়া পড়িতেছেন, রক্ত যদি বন্ধ না হয়, তাঁহাকে বেশিক্ষণ রাখা যাইবে না। দুই ভাইয়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেছেন, হাত তুলিয়া ধরিতেছেন, উপরের শির টিপিয়া ধরিতেছেন—কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না। কৈলাসচন্দ্রের হঠাৎ সম্বিত হইল, মুখটা তুলিয়া একবার ভিড়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"সাহেবকো খবর দেও, দৌড়ো।"

এক সঙ্গেই কয়েকজন ছুটিবার উপক্রম করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া জানাইল—সাহেব এই দিকেই টমটম হাঁকাইয়া আসিতেছে।

এক একটা কাজ এক এক সময় মানুষ যেন দৈবনির্দিষ্ট হইয়া

করিয়া ফেলে। মোহনার অত উপস্থিত বুদ্ধি হইবার কথা নয়, কিন্তু বাহিরে আসিয়া রক্তের ঘটা দেখিয়া তাহার মনটায় কি হইল সে একেবারেই সাহেবের কুঠিতে ছুটিল। সাহেব ভ্রমণে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিল, বাহিরে টম্‌টম্‌ সজ্জিত রহিয়াছে, মোহনা একেবারে পায়ের কাছে হাতজোড় করিয়া পড়িয়া বলিল—"সরকার খুন হোগিয়া হুজুর"।

হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে বলিলে সাহেব বোধ হয় প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং উপদেশাদি দিয়া তাহাকে আগাইয়া যাইতে বলিত, খুনের কথায় অন্য প্রশ্ন না করিয়া র‍্যাকে টাঙান রিভলভারটা লইয়া সে কামিজপরা অবস্থাতেই ছুটিয়া টমটমে চড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তীর-বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অকুস্থানে আসিয়া তাহাকে রিভলভার ব্যবহার করিতে হইল না বটে; কিন্তু জমিতে এবং তিনজনের গায়ে-কাপড়ে রক্তের অবস্থা দেখিয়া ও সামনে ভাঙা বোতল দেখিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই মধুসূদনকে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া টমটমে বসাইয়া দিল এবং কৈলাশ-চন্দ্রকেও সঙ্গে যাইতে বলিয়া ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া তীরবেগে মধু-বাণীর রাস্তায় টমটম ছুটাইয়া দিল। মধুসূদন তখন প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন।

আজকালকার বিজ্ঞানে বলিবে—চেতনার স্তরে ছোট কাজটুকু সর্বদাই সাড়ম্বরে সম্পন্ন করিবার মোহনার যে অভ্যাস, একটু উগ্র অনুভূতির মূহূর্তে সেইটাই অবচেতনার স্তরে কার্যকরী হইয়া মধু-সূদনের জীবন বাঁচাইল—নয়তো খুনও হয় নাই, এবং ব্যাপারটা যে সত্যই অত উৎকট এটা দেখিবারও ফুসরৎ হয় নাই মোহনার।....

যাই হোক, এই চিরসেবাপরায়ণ ভৃত্যের জন্য মধুসূদন বাঁচিয়া

গেলেন সে-যাত্রা, বলিতেন—"ভগবান আমার. জীবন ওর জিম্মায় রেখেছিলেন।"

বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু মধুসূদনের দক্ষিণ হস্তটি চিরতরেই নষ্ট হইয়া গেল। একটি শিরা একেবারেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অপরটি আংশিকভাবে ছিন্ন হইয়াছিল। মধুবাণীর হাসপাতালে প্রায় মাসখানেক রহিলেন, বিশেষ কিছুই উন্নতি হইল না। জেলা সহরের হাসপাতালে যখন আসিলেন, ডাক্তার বলিল—বিলম্ব হইয়া গেছে; তবে চেষ্টা চলিল, মাসখানেক পর, হাতটা যে একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ভাবটা গিয়া খুব অল্প একটু একটু নাড়াচড়া করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু সে কাজের কিছুই নয়, জিনিসটা যে অঙ্গবদ্ধ আছে তাহার অতি ক্ষীণ একটি পরিচয় জাগিয়া রহিল মাত্র, তাহাতে বোধ হয় সামান্য একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছুই হয় না। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া কুঠির কল্যাণে যে লেখনী একনিষ্ঠভাবে চালাইয়া আসিয়াছেন তাহাকে আর তুলিয়া লইতে পারিলেন না।

সাহেব অবশ্য ছাড়িল না, পূর্বের বেতনেই তাঁহাকে কুঠির সর্ব-বিষয়ে পরামর্শদাতার সম্মানিত পদ দিয়া পাণ্ডুলেই বসাইয়া রাখিল। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তবু উপরপড়া হইয়াই বাহিরের কুঠিগুলা তদারক করিবার কাজটাও ধরিয়া রাখিলেন।

১১

একটানা সাফল্যের যা দোষ মধুসূদনের জীবনে সেটুকু ঘটিলই। কম-বেশ করিয়া ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বৎসরের অবিরাম অর্থাগম

অপ্রতিহত প্রতিপত্তি আর অটুট সম্মানের মধ্যে মধুসূদন একটু চিন্তার অবসর পান নাই। একদিক দিয়া অর্থ আসিয়াছে, আর একদিক দিয়া দানে, ধ্যানে, ভোজে, আতিথ্যে বাহির হইয়া গেছে। অতি-চঞ্চল একটা কর্মস্রোতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন; বিনিময়ে সেও তাঁহাকে প্রচুর সুখ-সম্পদ দিয়া পুষ্ট করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কর্মছাড়া একদণ্ডের জন্য নিজের পানে দৃষ্টিপাত করিতে দেয় নাই।

শেষে চিন্তা যখন আসিল একেবারে অভিভূত করিয়াই আসিল। সাঁতরার বাড়িতে গোটাকতক ঘর বাড়ান ছাড়া কিছুই করেন নাই; তাহাতেও যে বাড়িটা বর্ধনশীল দুইটি পরিবারের মাথা গুঁজিবার মতো হইয়াছে তাহাও নয়, 'হ'চ্ছে-হবে' করিয়া অতবড় দরকারী কাজটুকুও সমাপ্ত করা হয় নাই। একটি পয়সা সঞ্চয় নাই, বিবাহ যোগ্যা দুইটি কন্যা ঘাড়ে; বিপিনবিহারীর কাজ হইয়াছে কয়েক বৎসর, কিন্তু কুঠির আর সেদিন নাই এবং মধুসূদন দিব্যচক্ষেই দেখিতে পান এখন যেটুকুও আছে, দু'দশবৎসর পরে সেটুকুও থাকিবে না—কুঠিয়ালকে আচরেই কৃষিজীবি হইতে হইবে।...এটা মনে মনে জানিতেন বলিয়াই বিপিনবিহারী যখন একবার পলাইবার অভিনয় করেন, মধুসূদন নিস্তারিণী দেবীকে বলিয়াছিলেন—"আজ হোক, পরেই হোক, ও যদি কখনও মনে করে পাগুলের মতন একটা ছোট জায়গায় পড়ে থেকে নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পারছে না তো পড়বে বেড়িয়ে। তাতে বারণ করবারই বা কি আছে?"....এখন মধুসূদন সশঙ্ক দৃষ্টিতে দেখেন এই ক্রমম্রিয়মান নীলকুঠিই বিপিনের একমাত্র আশ্রয়।—আশ্রয় হইয়াও বিপদ, না হইলে আরও বিপদ।...এখন বিপিনবিহারী নূতন জীবন আরম্ভ করিতে তাঁহারই মতো বাহিরের জগতে পা বাড়াইয়াছেন—এ-কথা

ভাবিতেও মধুসূদনের বুকটা যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়া ওঠে। একটি আঘাতে নিজে দুর্বল আর অসহায় হইয়া পড়িয়া নিজের সবাইকেই দুর্বল আর অসহায় বলিয়া মনে হইতেছে। এই হয়, মানুষ যে নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক। তাহার জগতের আলো তাহা হইতেই বিকীর্ণ হয়; তাই নিজের আলো কোন কারণে স্তিমিত লইয়া আসিলে মনে হয় জগৎটাই মলিন হইয়া আসিল।

অথচ মানুষের মজ্জাগত স্বভাব আছে, সঙ্কোচ আছে;—অতিথি অভ্যাগত সেই মতোই রহিল, প্রার্থীও কমিল না; অবসরের অভাবে যতগুলি পারিষদ্ জুটিত—কর্মের অভাবে তাহার চেয়ে বেশি করিয়াই জুটিল। পাণ্ডুলে বসিয়াই পাণ্ডুলের 'মধব বাবু' আর অন্য কেহ হইতে পারিলেন না। সেই 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'-ই পূর্ণোদ্যমে চলিল। তফাৎ শুধু এই মাত্র যে একসময় যেখানে ছিল পূর্ণ শক্তির সঙ্গে অপরিণামচিন্তার আনন্দ, এখন সেখানে আসিয়া পড়িল অক্ষম নিরুপায়ের নিষ্ফল দুশ্চিন্তা।

মধুসূদন সুবিধা পাইলেই কৈলাসচন্দ্র ও বিপিনবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। সে পরামর্শের একটা বিশেষত্ব এই যে তাহাতে অমন দরাজ কণ্ঠস্বরটা আপনা হইতেই মন্দ হইয়া আসে, আশেপাশে —বিশেষ করিয়া মেয়েদের মধ্যে কেহ শুনিয়া ফেলিল কিনা নজর রাখিতে হয়। বিপিনবিহারীকে বলেন—"অত ভাবতে গেলে চলে না,—'হচ্ছে-হবে' করে সুযোগ নষ্ট হচ্ছে, সময় তো আর অপেক্ষা করে থাকবে না?—আমি সাহেবকে বলে মাস দুয়েকের ছুটি করিয়ে দিচ্ছি; তুমি দুটোরই বিয়ের ঠিক করে এস। দাদাকেও লিখেছি; তাগাদাও দিচ্ছি, তবে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাফেরাও দরকার, আর মেয়ে দুটিকেও নিয়ে যেতে হবে সেখানে। শুধু কুষ্ঠি দেখেই তো হবার নয়। আর কুষ্ঠি নিয়েও দাদার

বড় খুঁৎখুতুনি, তুমি সামনে থাকলে সেদিকটা অনেকটা সামলাতে পারবে…দেরি হয়ে পড়ছে বড্ড, বিপিন…তোমার গর্ভধারিণীর পুরণ গহনাও খানকতক নিয়ে যাও, তাই ভেঙ্গে কিছু কিছু আরও দিয়ে… বুঝলে কিনা….কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে….একেবারে ঠিকঠাক করে আমায় টেলিগ্রাম দিয়ে দেবে….আর বাড়িটাও আরম্ভ করে দাওগে— আরও খান তিনেক ঘর—মাথা গোঁজবার একটা জায়গা চাই যে…টাকা আমি জোগাড় করে দিচ্ছি—এখনও কিছুদিন বাঁচব, শোধ করে যেতে পারব। তবে বিয়ের হ্যাঙ্গামটা আগে চুকিয়ে ফেল।"

অন্তরের উৎকণ্ঠায় বাক্যগুলা যেন অসংলগ্নভাবে বাহির হইতে থাকে, বেশি কথা কহিলে আরও বেশি করিয়া অসংলগ্ন হইয়া পড়ে, দুর্বল শরীরটা কাঁপিতে থাকে। বিপিনবিহারী অন্যদিক দিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। পিতা যতটা ভারই দিয়া যান তাঁহার বহিবার ক্ষমতা আছে। য উৎসাহ আর কর্মোদ্যম এতদিন বহির্মুখী ছিল, সংসারের প্রয়োজনে সেটা অন্তর্মুখী হইয়া আসিতেছে; তিনি অনুভব করেন; আর সে অনুভূতি তাঁহার আত্মপ্রত্যয়কে দিন দিন পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে।…চিন্তা সে দিক দিয়া নয়, চিন্তা পিতার জন্য। এত সবল যুবক, কিন্তু পিতার আয়ুর কথা ভাবিয়া তাঁহার যা উৎকণ্ঠা তা সংসারের কথা ভাবিয়া মধুসূদনের উৎকণ্ঠার চেয়ে শতগুণে অধিক। ঐদিক দিয়া তাঁহার মন পিতার মনের মতোই দিন দিন দুর্বল আর অসহায় হইয়া পড়িতেছে। …পাগুল ছাড়িয়া এখন নড়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য পিতাকে সে কথা বলেন না, 'হচ্ছে-হবে' করিয়াই কাটাইয়া দেন। যদি কখনও মুখে ব্যয়-সঙ্কোচের কথা বলেন মধুসূদন, তো তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। জানেন, ওদিকে কাঁট-ছাঁট করিতে গেলে পিতার যে আঘাতটা লাগিবে, দুইটা শিরা কাটিয়া যাওয়া তাহার সামনে

বিশেষ কিছু নয়। হাসিয়া বলেন—"কী এমন হ'য়েছে বাবা, যে তোমার এগুলোর দিকেই এত লক্ষ্য? ঐখানে তোমার কথায় আমি বাধ্য হ'তে পারলাম না, মাফ কোর' আমায়।"

মনের এক এক সময় একটা এমন অদ্ভুত শৈথিল্যের অবস্থা আসে যখন কাজের জন্য খুব বেশি আঁকপাঁকু করা যায়, কিন্তু ঠিক কাজটার সম্মুখীন হইতে পারা যায় না। মধুসূদন যেমন পুত্রকে তাড়াতাড়ি সব দরকারী কাজগুলা সারিয়া লইতে বলেন তেমনি চেষ্টা করিলে স্বচ্ছন্দে সাহেবের নিকট হইতে ছুটির ব্যবস্থা করিয়া এবং এদিকেও উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন দেশে। কিন্তু সেটা তো করেন না বরং বিপিনবিহারীর দীর্ঘসূত্রতায় যেন একধরণের নিশ্চিন্ত তৃপ্তিই অনুভব করেন। কাজ মোটেই এগোয় না, যেখানকার সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকে। মনের এ বৈচিত্রের রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করি'বে?

মেয়েদের মধ্যে মধুসূদন অন্যরকম—নিস্তারিণী দেবীর কাছে পর্যন্ত মনের উদ্বেগটা প্রকাশ করেন না। বিপিনবিহারীকেও বারণ করেন, বলেন—"ওদের প্রকৃতিটা দুধের মতো বিপিন, একটু ভাবনার তাপ লাগলেই ওরা উথ্‌লে ওঠে, মনে হয় ঐ করলেই ভাবনার গোড়া মেরে দেওয়া হবে। ফলে খানিকটা ভাপ আর ছাইয়ে একটা বিটকেল ব্যাপারের সৃষ্টি হয় মাত্র।...আমি এখনও রয়েছি, তোমার চাকরি হ'য়েছে, চণ্ডীও বছর দেড় দু'য়েকের মধ্যে পাশ দেবে—এত ঘাবড়াবার কি দরকার?"

ভুল বোঝেন মধুসূদন—যেখানে কঠিন পদা সেখানে মেয়েদের মাত্র আধা-আধি পাইয়া সব লোকেই চিরকাল যেমন ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে। মেয়েদের বিপদ উপলব্ধি করিবার সহজ বৃত্তি দিয়াই নিস্তারিণী দেবী থেকে বোধ হয় অভয়াটি পর্যন্ত সবাই বুঝিতে পারে সংসারের উপর একটা

গাঢ় ছায়া দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে—তবে, নিশ্চয় কম বেশি করিয়া। ওদিক থেকেও ঐ ধরনের একটা লুকোচুরি চলিতে থাকে। পিতার প্রায় পুনর্জন্ম হইয়াছে, হাসপাতাল থেকে ফিরিবার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে বিরাজ, মোতিবালা আসিয়াছেন, চণ্ডীচরণও স্কুলের ছুটি লইয়া আসিয়াছেন। মধুসূদন বাইরে থাকিলে সদর দরজার দিকে কান রাখিয়া নিস্তারিণী দেবী সুযোগ পাইলেই বলেন—"তোরা যেমন চিরকাল হেসে খেলে এসেছিস সেইরকমই থাক্ বাপু; বুঝছি তো সবই, তবে তোরা সুদ্ধ মুখ চূণ করে ঘুরে বেড়ালে কি আর রাখতে পারা যাবে মানুষটাকে ?...কি আর আছে শরীরে ?..."

গিরিবালাকে বলেন—"তোমায় রোজই বলছি বৌমা বিপিনের কাছে সংসারের কথা কখনও তুলতে যেওনা, এমনই ভেবে ভেবে অমন শরীর কালি হয়ে গেছে। পুরুষ মানুষ সংসারের কি বোঝে গা ? আর তাও এই কি বয়েস ওর ? ..."

এ ধরণের প্রসঙ্গে কণ্ঠ শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়াই আসে।

সবাই আসিয়া পড়িয়াছে, হাতে সময়ও প্রচুর, তাহা ভিন্ন এমনি সবাইকে আজকাল একটু বেশি করিয়া কাছে পাইতে ইচ্ছা করে। বৈকালে উঠানের রৌদ্র সরিয়া গিয়া যখন ছায়া পড়ে, চৌকির উপর একটা কম্বল আর চাদর বিছাইয়া দেওয়া হয়, সবাই একত্রিত হন। মধুসূদন একটা বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসেন, মোহনা গড়গড়ায় করিয়া তামাক দিয়া যায়। এই সময় মধুসূদন হাতে একটা কবিরাজী তেল মালিশ করেন। মালিশটা করেন গিরিবালা, গোড়া থেকে তিনিই করিতেছেন, একটা অধিকার জন্মাইয়া গেছে; অন্যান্য সবাইয়ের কেহ পায়ে হাত বুলায়, কেহ মাথার পাকা চুল বাছে; গল্প চলিতে থাকে।

খঞ্জনী নাতি দুইটিকে ছাড়িয়া দিয়া নিদ্রার জন্য কোথায় গিয়া একটা

নিরাপদ স্থান বাছিয়া লয়। শশাঙ্ক সমস্ত উঠানে নিজের খেলায় মাতিয়া ওঠে, ছোটটি চৌকির উপর একের পর এক করিয়া সবার আদর কুড়াইয়া ফেরে, সেদিকে একটু ফুরসৎ হইলেই গড়গড়ার নল লইয়া ঠাকুরদার সঙ্গে বিরোধ ঘটায়।

গ্রীষ্মের এই ছায়াস্নিগ্ধ অপরাহ্নগুলি মধুসূদনের নিজের জীবনের অপরাহ্নের সঙ্গে কী এক অপরূপ মাধুর্যে মিলিয়া যায়। দুঃখের মধ্য দিয়াই আসুক, কিন্তু এ ধরণের অনুভূতির তিনি পূর্বে সন্ধান পান নাই—সমস্ত জীবনের মধ্যে এই সুরটি গভীরভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। মধুসূদন আরও সতর্ক হইয়া ওঠেন, নিজের জীবনের যা ট্র্যাজেডি সেখান থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া যেন এদের মুখের হাসি এক লহমার জন্যও না মলিন করিয়া দেয়।

যে কোন একটা সূত্র ধরিয়াই গল্প আরম্ভ হইয়া যায়। তবে যে ভাবেই আরম্ভ হোক না কেন উদ্দেশ্যটা থাকে ঐ লুকোচুরি। এ সময়টা ডাক আসিবার সময়। হয়তো সাঁতরা হইতে চিঠি আসিয়াছে—পড়িয়া মধুসূদন বলিলেন—"এই পড়্ বিরাজ, বৌমাও পড়ো, দাদার ভাবনা আর যেতে চাইছে না। বুড়ো মানুষ, ঠেলে আস্‌তে চাইছিলেন, সেটা যদি কোন রকমে বন্ধ করা গেল তো....অথচ আমি তো দিব্যি আছি, সবার সেবা খাচ্ছি, গল্প করছি, সখ হোল একবার আফিসে গিয়ে চেহারাটা দেখিয়ে এলাম।"

মোতিবালার কোলের বিড়ালটার দিকে চাহিয়া বলেন—"যেন মোতির কোলের পুষিটি।"

মোতিবালা লজ্জিত হইয়া বলেন—"যাও, তুলনা দেওয়ার আর কিছু পেলেন না!"

মধুসূদন হাসিয়াই বলিলেন—"বরং আরও বেশি আরাম, পুষি তো

মোটে দু'টো হাতের সেবা খেতে পায়....অথচ দাদার ভাবনা ঘুচছে না।"

গিরিবালার মনটা অবশ্য জেঠামশাইয়ের দুশ্চিন্তাতেই সায় দেয়, তাঁহাদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের কথা স্মরণ করিয়া ভিতরে ভিতরে আরও বিমর্ষ হইয়া যান, বাহিরে কিন্তু সেটা গোপন করিয়া বলেন—"দূরে রয়েছেন, তাই আরও..."

মধুসূদন বলেন—"তা নয়, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। এবার তোমরাও লেখো। আমি তো জানি আমি দিব্যি রয়েছি। সতের বছর বয়স থেকে পা দু'টো ঘর ছেড়ে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর হাতটা কলম পিসেছে, তাদের যে এমন সুদিন আসবে..."

বিরাজমোহিনীর এতটা সহ্য হয় না, বলিয়া ওঠেন—"তা বলে তুমি আর কখনও শিশি খুলতে যেও না বাপু।"

হঠাৎ রাগের ভান দেখাইয়া এমনভাবে বলেন যে অমন মোক্ষম কথাটাতেও সকলে হাসিয়া ওঠেন। মধুসূদন হাসিয়া বলেন—"শাসনটা একবার দেখো বৌমা, মা হয় কিনা।"

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া ওঠেন, বলেন—"সেকথা বলছি না; ভগবান দুঃখের মধ্যে দিয়েও এক এক সময় সুখ এনে দেন। একটু ভেবে দেখ্ না বিরাজ, গবর্ণমেণ্টের চাকরি করলে এতদিন কবে থেকে পেনশ্যন্ ভোগ করছি।....একটা কষ্ট ভোগ ছিল—অদৃষ্টকে তো আর এড়ান যায় না, কিন্তু ওটুকু না হ'লে এই যে বসে পুরো মাইনেটা পাচ্ছি—অথচ সবই আগেকার মতো বজায় রয়েছে, কোন ভাবনা নেই....কি বলো বৌমা তুমি?"

গিরিবালা একটু সমস্যায় পড়িয়া বলেন—"হাতটা না কাটলেই হতো বাবা..."

মধুসূদন আবার হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"দেখো অন্যায় আব্দার! হাতটা না কাটলে ভগবান....”

বিরাজমোহিনী বলিয়া ওঠেন—“তা হাত না কেটে ভালো করবেন না, ভগবানেরই বা এ কোন ন্যায় বিচার বাবা?”

সকালবেলা মালিশের সময় গিরিবালা প্রায় একলাই থাকেন। কথাবার্তায় একটু গুরুত্ব থাকে, প্রায়ই সংসারের কোন একটা সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়, বেশি ভাগ মেয়েদের বিবাহ লইয়া। মধুসূদন বলেন—"বিপিনকে রোজই বলছি এবার ছুটি নিয়ে যাক, গড়িমসি করছে। তুমি দেখেছ বলে বৌমা?"

বারণ সত্ত্বেও বিপিনবিহারী স্ত্রীর সহিত এসব আলোচনা করেন কিনা যাচাই করিবার জন্যই তোলা কথাটা, মধুসূদন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের পানে চাহিয়া থাকেন।

গিরিবালা বোধ হয় একটু নীরব থাকিয়া যান, তাহার পর বলেন—“এত তাড়াতাড়ি কি বাবা? তা ভিন্ন জেঠামশাই তো করছেনই চেষ্টা, ঠিক হলেই জানাবেন।”

বোধ হয় সন্দেহ থাকে একটু, তবুও মধুসূদন একটু প্রবঞ্চিত হনই, বলেন—“না, তাড়াতাড়ি অন্য কোন কারণে নয়, তবে বয়েস হয়েছে তো ওদের;—বিশেষ করে ত্রিনয়নীর—বছর বারো হলো তো....”

গিরিবালা বলেন—“বারো বছর তিনমাস যাচ্ছে।”

সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিয়া একটু আব্দারের ভঙ্গীতে বলিয়া ওঠেন—“তা হোগ গে বাবা; এখন থাকুন, বড্ড একলা প'ড়ে যাব।"

মধুসূদনও হাসিয়া ওঠেন,—বলেন—“চমৎকার কথা বৌমার!....

আচ্ছা, চণ্ডীর বিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গী করে দোব, একটু লাগো দিকিন সবাই এ-দিকে উঠে পড়ে।”

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—“সঙ্গী যত বাড়ে ততই তো ভালো বাবা; কমাবার চেষ্টা করতে যাব কেন?”

এবারে দু'জনেই বেশ হাসিয়া ওঠেন। মধুসূদন বলেন—“কবি মানুষের মেয়ে, ওঁর সঙ্গে এঁটে ওঠবার জো আছে?”

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলেন—“তা নয় আমারও তো বয়েস হয়ে আসছে মা, প্রায় চৌষট্টি হতে চলল...”

বয়েসের কথায় গিরিবালার সত্যই রাগ হয়, এরপরেই হইবে—“কতদিন আর বাঁচব?”—তাহার পরেই “সবাইকে ভালোয় ভালোয় রে খ যেতে পারলে বাঁচি।” তাহার পর আরও অনেক সব কথা। .রবালার সত্যই খারাপ লাগে।

বলেন—“থামুন বাবা আপনি, চৌষট্টি বছর আবার একটা বয়েস! আমার আই-মা একশ উনিশ বছর বেঁচেছিলেন। বাঙলাদেশ, তায় তিনি মেয়েমানুষ, আর এতো পশ্চিম, তা ভিন্ন....”

মধুসূদন এবার খুবই উচ্চৈঃস্বরেই হাসিয়া ওঠেন—নিস্তারিণী দেবীকে ডাক দিয়া বলেন—“ওগো শোনো এসে বৌমার কথাটা একবার!”

হাসিতে হাসিতেই গিরিবালার পানে চাহিয়া বলেন—“তোমার হিসেব মতো আমার তো তাহলে তোমার কোলের ছেলে হয়ে ছোট দাদুটির সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়াবার কথা মা!....”

হাসির প্রাচুর্যই আছে, তবু কিন্তু সেটা উপরে উপরেই থাকিয়া যায়। বরং হাসি দিয়া চাপা দিতে যাওয়ায় দুশ্চিন্তার বেদনাটা আরও বেশি করিয়া অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে। হাসপাতাল থেকে মধুসূদন বাড়ি ফিরিলেন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদরোগ দেখা দিল। একটু ভুলও হইল, কয়েকমাস ধরিয়া চাপা দেওয়ার একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, প্রথমটা লুকাইয়া রাখিলেন কথাটা। ভুলের উপর ভুল এই করিলেন যে বিপিনবিহারীর নিকটও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে একদিন আফিস থেকে আসিয়াই শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। তখনও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন মধুসূদন, বলিলেন—"হ্যাঁ, এই দিন দু'য়েক থেকে মনে হচ্ছে যেন বুকে এই সময়টা একটা ধড়ফড়ানি ওঠে, তবে ও কিছু নয়, ভাববার কিছু নেই।"

এবার কিন্তু যাহাতে হাতকাটার সময়ের মতো ভুল না হইয়া যায় সেজন্য একেবারেই তাঁহাকে জেলা-সহরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানকার ডাক্তার এবারও বলিলেন—"অন্ততঃ পনেরটা দিন বিলম্ব হইয়া গেছে। বাঙালী ডাক্তার, দেশে লইয়া গিয়া একবার কবিরাজিটা চেষ্টা করিতে' পরামর্শ দিলেন—যদি কোন ফল পাওয়া যায়। আর কালবিলম্ব না করিয়া সকলে দেশে চলিয়া গেলেন।

পূর্ববঙ্গীয় এক প্রাচীন কবিরাজের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল। অতিশয় বিচক্ষণ কবিরাজ, কিন্তু অন্য চিকিৎসাব্যবসায়ীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্মুখ। উহার মধ্যে আবার একটা তুক ছিল; রামচন্দ্র কবিরাজ রোগীর নাড়ি দেখিয়া এ্যালোপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথদের

যদি গাল পাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন তো সে রোগীর সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকিত না।

প্রথম দিন সাতেক কিছুই ঠাহর করিতে পারা গেল না। কবিরাজ দুই বেলা আসিয়া চুপ করিয়া নাড়ি ধরিয়া বসেন, মাঝে মাঝে ঔষধ বদলান, পথ্যাদির উপদেশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যান। সঙ্কটের ছায়াটা গাঢ়তম হইয়া উঠিতেছে। যে কোন মুহূর্তেই সব শেষ হইয়া যাইতে পারে এমন অবস্থা।....সাতদিনের দিন রামচন্দ্র কবিরাজ নাড়ি ধরিয়াই এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেন মন্ত্র উচ্চারণের কাজ হইল, এক মুহূর্তেই সমস্ত বাড়িটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর দিন দিন উন্নতির লক্ষণ সব প্রকাশ পাইতে লাগিল। একমাস হইয়া গেলে মধুসূদন বিপিনবিহারীকে পাণ্ডুলে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

রাজি করিতে বেগ পাইতে হইল, কেননা পিতার সমস্ত সেবাটা বলিতে গেলে তিনি নিজের হাতে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। তবুও যাইতে হইল। বাঁচিয়া যাওয়ায় মধুসূদনের চারি দিককার ভাবনাগুলা আবার নূতন করিয়া দেখা দিতেছে, বিশেষ করিয়া ভাবনা হইয়াছে চাকরিটার জন্য,—নিজের কর্মশক্তির উপর চাকরি নয় তো, মনিবের নিতান্তই একটা অনুগ্রহ।

বিষয়ী লোক, মধুসূদন পুত্রকে বিস্তর করিয়া বুঝাইলেন, বলিলেন—"অনুগ্রহ জিনিসটা বড় পলকা জিনিস বিপিন, ওর ওপর প্রার্থীকে সর্বদাই দীর্ঘশ্বাসের তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। অবশ্য কৈলেস আছে সেখানে, খুব সতর্কই আছে, তবু ছেলে হিসেবে তোমার সেখানে থাকাটা নিতান্ত দরকার, সায়েবের একটা আটা থাকে আর কি। তারপর আমি তো এসেই পড়ছি শীগগির।"

রোগটা খুবই কঠিন হইয়াছিল, এই সবে আশা হইয়াছে একটু। পিতার সান্নিধ্য ছাড়িয়া নড়িতে বিপিনবিহারীর একেবারেই মন সায় দিতেছিল না। যাচ্ছি-যাবো করিয়া দিন বাড়াইতেছিলেন, একদিন ভগবতীচরণ বলিলেন—"বিপিন, আমি তোমায় বলিনি এতদিন যেতে, মধু এখন আমায় ধরেছে, বলে—বিপিন টালমাটাল করছে, তুমি বুঝিয়ে বল দাদা। আমি কবিরাজ মশাইকে জিগ্যেস করেছিলাম—ভয়ের আর কিছুই নাই—তবে সময় একটু নেবে—পুনর্জন্মই তো ?....আমি লক্ষ্য করে দেখছি ওর চাকরির ভাবনাটা বড্ড বেশি, এই সারবার মুখে সর্বদাই একটা দুর্ভাবনা লেগে থাকাটা বেশ ভালো বলে মনে হয় না।... আসল কথা আমি পরামর্শ দোব কি আমার নিজের মাথারই ঠিক নেই ....তবে আমরা সবাই তো রয়েছি, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ ঘুরেই এসো একবার।"

কথাগুলা ফেলিয়া দিবার নয়, তাহা ভিন্ন বিপিনবিহারী নিজেও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন চাকরিকে কেন্দ্র করিয়া আর সব দুর্ভাবনাগুলাও ক্রমে বেশি করিয়া মনে জাঁকিয়া বসিতেছে যেন পিতার। বিপিন একলা থাকিলেই সেই সব কথা—মেয়েদের বিবাহ বাকি রইল—বাড়ি করা হইল না—সঞ্চয় নাই কিছু···ঠিক হাসপাতাল থেকে ফিরার পর যেমন বাই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—যাহার ফলে এই নিদারুণ ব্যাধি। বিপিনবিহারী বিশেষ চিন্তিতই হইয়া পড়িলেন; তাহার পর সাতপাঁচ ভাবিয়া সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একবার ঘুরিয়া আসাই স্থির করিলেন।

তবুও ভালোভাবে স্থির করিতে আরও পনেরটা দিন লাগিয়া গেল।

যাইবার দিনের কথা। নিস্তারিণী দেবী খলে করিয়া ঔষধ লইয়া আসিয়াছেন, মধুসূদন শুইয়াছিলেন, সেবন করিবার জন্য উঠিয়া

বলিয়াছেন, বিপিনবিহারী প্রস্তুত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন বলিলেন—"এই যে ভাবতেই এসে পড়েছে বিপিন।"

নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন—"আজকের ওষুধটাও বিপিনই খাইয়ে দিয়ে যাক, ওরই হাতে দাও।"

গিরিবালা বিছানায় বসিয়া সেবা করিতেছিলেন, উঠিয়া যান দেখিয়া বলিলেন—"না, তুমিও বোসে থাকো মা।"

কি যেন ভাবিয়া একটু থামিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দেখো তো কেউ ছোটদাদু কি কাঁদছে? না, ভুল শুনলাম? কানটাও গেছে তো? ..."

মনোমোহিনী ছিলেন, উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন।

শশাঙ্ক ছিল না। ছোটটিকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিলেন—"কাঁদে নি, কিন্তু বাপ গেলেই ধরবে কান্না।...বৌ, বসিয়ে রাখ্ তোর কাছে।"

মধুসূদন চুপ করিয়া লজ্জানত দৃষ্টিতে পুত্র আর সন্তান-পাশে পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কয়েকবার দেখিলেন। পরিপূর্ণ চিত্রটি মনটা যেন ভরাট করিয়া দিয়াছে। ঔষধ সেবন করাইয়া বিপিনবিহারী যখন প্রণাম করিয়া উঠিলেন, মাথায় আঙ্গুল কয়টী চাপিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"যেতে বিপিনের মন সরছে না, তাই নয়?"

বিপিনবিহারীর গলাটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, পরিষ্কার করিবার চেষ্টায় দুইটি হ্রস্ব শব্দ হইল মাত্র।

মধুসূদন পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"দুঃখু কিসের?—আমিও শীগগির আসছি।"

* * * *

মধুসূদন ছেলের কাছে কথা রাখিয়াছিলেন।—

খালি বাড়িতে মধুসূদনের চিন্তাটাই যেন অষ্টপ্রহর ঘিরিয়া ঘিরিয়া থাকে বিপিনবিহারীকে, সেদিন মনটা অহেতুকভাবেই যেন বেশি ভারাক্রান্ত ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়া জাগিয়া তন্দ্রা আসিয়াছে, হঠাৎ মনে হইল মধুসূদন সামনে দাঁড়াইয়া ; বলিলেন—"বিপিন, আমি এসেছি।"

বাড়ির ব্যাপার নয়, কুঠির আফিসে ঢুকিতে যে ফটকটা আছে যেন সেইখানটা। হালকা ঘুমটা ছাঁৎ করিয়া ভাঙিয়া গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, কিন্তু স্বপ্নটা এত স্পষ্ট যে বিপিনবিহারী যেন সম্মোহিতের মতোই ঘরের দুয়ার খুলিয়া, উঠানের দুয়ার খুলিয়া, রাস্তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও একটু শব্দ নাই। শীত-শেষের অল্প কুয়াসাচ্ছন্ন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরিয়া আছে। জিরাৎ-ক্ষেত্রটার ওধারে গুলমোহর গাছটার নীচে শাদা ফটকটার পানে বিপিন-বিহারী ঠায় চাহিয়া রহিলেন ; ওটা যে নেহাৎই স্বপ্ন ছিল, বিশ্বাস করিতে একটু বিলম্ব হইল।

পরদিন টেলিগ্রাম আসিল মধুসূদন আর ইহজগতে নাই।